নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী
মহাভারতের
ভারতযুদ্ধ
এবং কৃষ্ণ

কৃষ্ণ কি স্বয়ং ভগবান ? না কি বিরাট মাপের এক ব্যক্তিত্ব, সামান্য এক গোপপল্লী থেকে বিস্ময়কর একক কৃতিত্বে যিনি সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে এসে দাঁড়িয়েছিলেন ? মহাভারতের যুদ্ধ কি শুধুই কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ, নাকি ভারতের পূর্ব-দক্ষিণ শক্তির উপর উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় শক্তির আধিপত্য বিস্তারের জন্য সারা ভারতবর্ষ জুড়ে সেকালে যে রাজনৈতিক তথা কূটনৈতিক যুদ্ধ হয়েছিল, তারই ইতিবৃত্ত ?

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর লেখার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় রয়েছে তাঁরা সকলেই জানেন যে, সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর অধিকার কত গভীর ও সুবিস্তৃত । এবং এও তাঁরা লক্ষ করেছেন যে, নৃসিংহপ্রসাদের কোনও কথাই কল্পনাপ্রসূত নয় । তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে তিনি সবসময়ই তুলে আনেন মূল সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি, যথাসম্ভব অবিকৃত অবস্থায় জুড়ে দেন তার বাংলা অনুবাদ কি ব্যাখ্যা । তা সত্ত্বেও প্রতিটি রচনাতেই তিনি যে হয়ে ওঠেন চমকপ্রদ— কি তথ্যে, কি ভাষ্যে—তার কারণ, সম্ভবত, নৃসিংহপ্রসাদের অপূর্ব দৃষ্টিকোণ ।

এমনই একটি সম্পূর্ণ অভিনব দৃষ্টিকোণ থেকে নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী এই অসামান্য গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন কৃষ্ণ-চরিত্রের রাজনৈতিক উপাদানগুলি এবং একইসঙ্গে এঁকেছেন সেকালের একটি পূর্ণাঙ্গ ভারতচিত্র । দেখিয়েছেন, আজকের দিনে পূর্ব এবং দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্যগুলির উপর কেন্দ্রের যে-বঞ্চনার কথা আমরা বিভিন্ন কথাপ্রসঙ্গে বারবার বলি, তার বীজ উপ্ত হয়েছিল মহাভারতের ভারতযুদ্ধের সময় থেকেই ।

নৃসিংহপ্রসাদের শক্তিশালী কলমে এ-গ্রন্থে বিধৃত কৃষ্ণের ক্রমিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার অনন্য চলচ্চিত্র, ভারতযুদ্ধের কূটনীতিসমূহের পরিচয় উদ্‌ঘাটন, এবং, সর্বোপরি, সেকালের সঙ্গে একালের মেলবন্ধন-সূত্র আবিষ্কারের তাৎপর্যমূলক প্রয়াস— এর কিছুই লেখকের স্বকপোলকল্পনার ফসল নয় । হরিবংশ, মহাভারত এবং বিবিধ পুরাণ থেকেই সংগৃহীত হয়েছে প্রতিটি উপাদান । অননুকরণীয় পদ্ধতিতে ব্যাখ্যার কাজটি শুধু নৃসিংহপ্রসাদের নিজস্ব । তাঁর তথ্যের বিপুল সংগ্রহ সম্ভ্রম জাগায়, বিশ্লেষণ করে মুগ্ধ । 'বাল্মীকির রাম ও রামায়ণ'-এর মতো এ-গ্রন্থটিও প্রতিটি বাঙালীর অবশ্যপাঠ্য ।

ISBN 81-7215-028-8

মহাভারতের ভারতযুদ্ধ এবং কৃষ্ণ

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

আ ন ন্দ

স্বর্গত পিতৃদেবের উদ্দেশ্যে

রাধাবল্লভরাগভক্তিরসনে ভৃঙ্গায়িতং যন্মনো
নিত্যং শ্রীধরনাম্নি বিগ্রহবরে সেবার্পিতা যত্তনুঃ ।
শাস্ত্রক্ষীরপয়োধিমন্থনবিধৌ দেবায়িতং যেন সঃ
শ্রীরামেশ্বরনাম-মৎকুলপতি র্বিঘ্নং বিহন্যাৎ পিতা ॥ ১ ॥
দৃষ্ট্বা কোপপরীতনেত্রযুগলং তস্যাভবিষ্যদ্ ভৃশং
গ্রন্থং যন্নরসিংহকেন রচিতং কৃষ্ণাভিধং ভাষয়া ।
সোঽবক্ষ্যন্নরতেশ্বরস্য ঘটিতং ধার্ষ্ট্যেণ সর্বং ত্বয়া
তত্তস্মৈ জনকায় দত্তমমৃতং কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥ ২ ॥

রাধাবল্লভকৃষ্ণের রাগানুগ ভক্তিরসের আস্বাদনে যাঁর মন ছিল মধুকরের মত, যাঁর দেহটি সমর্পিত হয়েছিল কুলবিগ্রহ শ্রীধর মহারাজের নিত্যসেবায়, শাস্ত্ররূপ ক্ষীরসমুদ্র মন্থনের ব্যাপারে যিনি ছিলেন দেবতার মত, সেই রামেশ্বর নামে আমার আচার্য এবং পিতা আমার সমস্ত বিঘ্ন নিরসন করুন । ১ ।
‘কৃষ্ণ’—এই নামে বাংলা ভাষায় লেখা নৃসিংহের গ্রন্থখানি দেখে তাঁর নয়ন দুটি অবশ্যই ক্রোধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠত ; তিনি রেগে বলতেন—তুমি ধৃষ্টতাবশত পরম ঈশ্বর কৃষ্ণকে একেবারে সাধারণ মানুষটি করে তুলেছ—অতএব গ্রন্থ নয়, এই গ্রন্থে ব্যবহৃত ‘কৃষ্ণ’ নাম-রূপ অমৃত বর্ণ দুটি শুধু আমার পিতাকে নিবেদন করলাম ।। ২ ।

এই লেখকের অন্যান্য বই

কৃষ্ণা কুন্তী ও কৌন্তেয়
দেবতার মানবায়ন শাস্ত্রে সাহিত্যে কৌতুকে
বাল্মীকির রাম ও রামায়ণ
মহাভারতের অষ্টাদশী
মহাভারতের ছয় প্রবীণ
মহাভারতের প্রতিনায়ক
শুকসপ্ততি

গ্রন্থকারের নিবেদন

১৩৯৫ সালের আনন্দবাজার বার্ষিক সংখ্যায় 'কৃষ্ণ' প্রবন্ধটি কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত আকারে বেরোয় । প্রধানত কৃষ্ণ-জীবনের মূল তথ্যগুলিই এই প্রবন্ধের উপজীব্য ছিল । এই প্রবন্ধ বেরোনোর পর আমার মনে হতে থাকে যে, একটা ফাঁক রয়ে গেছে । কারণ কৃষ্ণের আত্যন্তিক প্রতিষ্ঠার পর যে মহাভারতের যুদ্ধ সম্পন্ন হয়েছে সেখানে কৃষ্ণের ভূমিকায় একটা সর্বাঙ্গীন প্রেক্ষাপট আছে । তিনি প্রত্যক্ষভাবে মহাভারতের যুদ্ধে অংশ না নিলেও, সেখানে তিনি রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত বড় শক্তি । কৃষ্ণ এবং মহাভারতের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে এ কথাটা আমার বার বার মনে হয়েছে যে, মহাভারতের যুদ্ধটা মোটেই কুরু-পাণ্ডবের জ্ঞাতিযুদ্ধ নয় । এর মধ্যে জড়িয়ে আছে অনেক রাজনৈতিক হিসেব-নিকেশ, যা বংশানুক্রমে চলে আসছে এবং এই বংশানুক্রমিক ব্যাপারগুলিই ভারতবর্ষের সমস্ত বিশিষ্ট রাজন্যবর্গকে ভারতযুদ্ধে অংশ নিতে প্ররোচনা যুগিয়েছে । যাই হোক, এই বংশগত সমস্যাগুলি নিয়ে আমি আগে লেখার সুযোগ পাইনি, যদিও সে সুযোগ এল ১৩৯৭ সালে আনন্দবাজার পুজো-সংখ্যায় লিখবার সময় । তবে এখানেও একটি সমস্যা ঘটেছে । ভারতযুদ্ধের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ বোঝাবার জন্য আমাকে কিছু পুরানো কথা বলতে হয়েছে, যা আমার পূর্ববর্তী 'কৃষ্ণ' প্রবন্ধটিতে ছিল । আমি দুটি প্রবন্ধ এক জায়গায় মিলিয়ে-মিশিয়ে একত্রে গ্রন্থনা করে দিতে পারলাম না বলে সহৃদয় পাঠক আমাকে ক্ষমা করবেন ।

নিবেদন শেষ করার আগে আরও কটি কথা বলা প্রয়োজন । আনন্দবাজার বার্ষিক সংখ্যায় (১৩৯৫) 'কৃষ্ণ' প্রবন্ধটি বেরোনোর পর প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীরমাপদ চৌধুরীমশাই, যিনি উক্ত বার্ষিক সংখ্যার সম্পাদকও বটে, আমাকে জানান যে, প্রবন্ধটি গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করা যেতে পারে । আমি যথারীতি প্রকাশকের প্রশ্ন তুলি । রমাপদবাবু বললেন—প্রকাশনার ভার নেবে স্বয়ং আনন্দ প্রকাশন সংস্থা । আমি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠি, কারণ এর থেকে আনন্দজনক প্রস্তাব একজন লেখকের পক্ষে আর কিই বা হতে পারে ? রমাপদবাবুর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার কোন মানে হয় না । এই জন্যে যে, যা কিছু আমি আজ পর্যন্ত বাংলায় লিখেছি, তার মূলেই তিনি । প্রথম যখন আমি লিখতে আরম্ভ করি, তখন কোনদিন এই বিশিষ্ট মানুষটির কাছে আমার কোন লেখার প্রশংসা শুনিনি, কিন্তু আমার ব্যাপারে যে তাঁর প্রশ্রয় ছিল, সে আমি বেশ বুঝতে পারতাম । এতে লাভ হয়েছে এই যে, আরও ভাল করে লিখতে হবে—এই তাগিদটা আমার দিক থেকে বেড়েছে, যদিও তা পারছি কিনা তা পাঠকের বিচার্য বিষয় । 'কৃষ্ণ' এবং 'মহাভারতের ভারতযুদ্ধ'—এই দুটি প্রবন্ধ বেরোনোর পর অন্যেরা যে প্রশংসা করেছেন, সেগুলি রমাপদবাবুর মুখ দিয়ে একযোগে শোনার সৌভাগ্য হয় । ধরে নিই, এই প্রশংসার সঙ্গে রমাপদবাবুরও অন্তরের সায় আছে । আমার লেখার জগতে অভিভাবকের মত এই মানুষটিকে শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ছোট করি কি করে ?

আমার লেখার আরেক প্রণয়ী— কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধান শ্রীপ্রবালকুমার সেন । পড়শুনোর ক্ষেত্রে তিনি আমার

অধ্যাপক হলেও ব্যবহারে আমার বন্ধুতুল্য। তাঁর বহুজ্ঞতা বারে বারেই আমার লেখার মধ্যে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত ঢুকে পড়েছে এবং এমনভাবেই তা ঢুকেছে যে, আমার ব্যবহৃত শব্দের বালি না সরালে সে ধারাস্রোত খুঁজে বার করা কঠিন। তাঁর কাছে আমি চিরঋণী।

শ্রদ্ধেয়া সুকুমারী ভট্টাচার্য আমার দিদির মত। তাঁর অধীনেই আমি 'কৃষ্ণ' বিষয়ে গবেষণা করি। গবেষণা কর্মে দৃষ্টি প্রশস্ত করার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা যে আমার জীবনে কত বড়, তা আমি বলে বোঝাতে পারব না। তাঁর সঙ্গে সর্ব বিষয়ে আমার মত মেলে না, বিশেষত এই প্রবন্ধের ক্ষেত্রে তো মেলেই না ; তবু আমি জানি—নিশ্চয় জানি যে, তিনি তাবৎ অধ্যাপক-অধ্যাপিকা-কুলের সেই বিভাগে পড়েন না, যাঁরা মতে মত না মিলালেই ক্ষিপ্ত হন। এই প্রবন্ধ দুটির পরম্পরায় কোথাও যদি তাঁর প্রতি অবাধ্যতা থাকে, তবে সেটা তাঁর প্রশ্রয় এবং দৃষ্টিভঙ্গীর ঔদার্যের জন্যই হয়েছে, কারণ তিনি কোনদিন আমাকে ধুয়া ধরতে শেখাননি কিংবা পায়ের নূপুরের মত বাজতে বলেননি।

আজ এই গ্রন্থ-প্রকাশনার সময়ে স্বর্গত জনক-জননী এবং অগ্রজের কথা মনে পড়ছে। বেঁচে থাকলে আজকে তাঁরা বড় খুশি হতেন। গ্রন্থরচনার ক্ষেত্রে আমার প্রথম এবং প্রধান প্রেরণা হলেন আমার স্ত্রী সুষমা। অবশ্য গ্রন্থরচনার কথাটা ভুল বলা হল। সংস্কৃতের লোকমাত্রেই বাংলাভাষার প্রতি কিঞ্চিৎ উন্নাসিকতা থাকে, যদিও ইংরেজী ভাষার ক্ষেত্রে তা থাকে না। স্বনামধন্য আচার্যদের আশীর্বাদে আমারও প্রায় সেই অবস্থাই হয়েছিল। ঠিক এই রকম একটা অবস্থায় আমাকে যিনি হাতে ধরে বাংলা সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করান, তিনি আমার স্ত্রী। এদিক দিয়ে আমি তাঁকে আমার গুরু বলেই স্বীকার করি। আধুনিক কালের তাবৎ সাহিত্যিকদের গ্রন্থগুলির সঙ্গে আমার পরিচয় আমার স্ত্রীর সূত্রেই এবং আমি যে প্রথম প্রবন্ধটি আনন্দবাজারের রবিবাসরীয়তে দিয়ে এসেছিলাম, তাও তাঁরই সঙ্গে বাদানুবাদের ফলে। এই আরেক মানুষ, যিনি এখনও পর্যন্ত আমার কোন লেখা ভাল বলেন না এবং খালি ভাল ভাল লেখাগুলি পড়ে শিক্ষা নিতে বলেন। এই বিধানে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শুধু পড়ে যাওয়ারই আশঙ্কা থাকায় দাম্পত্য কলহের সুযোগ নিই এবং লিখতে আরম্ভ করি। আশা করি এই প্রকাশনা তাঁর বিষাদে কিঞ্চিৎ হরিষ তৈরি করতে পারে। একেবারে সাংসারিক পাঁচালি হলেও আরও দুজনের কাছে আমার ঋণ স্বীকার করতেই হবে। একজন আমার অগ্রজ, অজিতকুমার ভাদুড়ী, যিনি সাংসারিক কাজে আমাকে নানাভাবে অব্যাহতি দিয়ে গ্রন্থরচনার পথ সুগম করেছেন। দ্বিতীয়জন সেই একাদশবর্ষীয় অকালপক্ক ধৈর্যশীল বালক, যে ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমার পুত্ররূপে পরিচিত। সে এই বয়সেই মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে এই তর্ক প্রতিষ্ঠা করেছে যে, ছাপার অক্ষরে বাবার নাম বেরোন মানেই 'বাবা' মানুষ হয়েছে।

আনন্দ প্রকাশন সংস্থার তরফে শ্রীবাদল বসু মহাশয় এই গ্রন্থ প্রকাশনার সমস্ত দায়িত্ব বহন করছেন, তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কথামুখ

যে কালে মানুষ হিসেবে কৃষ্ণকে সবাই এক ডাকে চিনত, সেই প্রাচীন কালেই তাঁকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে বহুবার। তাঁর দিকে তর্জনী তুলে পূর্বপক্ষ বলেছে—তুমি তোমার মামাকে মেরেছ, তুমি সরলা গোপরমণীদের মনে প্রেমের লালসা জাগিয়ে শেষে নিজেই পালিয়েছ, পরস্ত্রী-রমণের মত গর্হিত কাজও তুমি অনায়াসে এবং নির্দ্বিধায় সম্পন্ন করেছ। ব্যক্তিগত চরিত্রের এইসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ছাড়াও কৃষ্ণের জীবৎকালে যে যুদ্ধবিগ্রহগুলি চলেছে, এবং যেগুলিতে তিনি প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে অংশ নিয়েছেন, সেগুলিতে তৎকালীন যুদ্ধরীতি এবং নীতি অনেক সময়েই মানা হয়নি। মানা হয়নি কৃষ্ণের জন্যই। তিনিই অনেক জায়গায় সহায়ক পক্ষকে এমন উপদেশ দিয়েছেন, যাতে সমালোচকেরা তাঁর দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করে তাঁকেই দায়ী করতে পারেন।

কৃষ্ণের বিরুদ্ধে এই সব তিক্ত প্রশ্ন মহাভারতের মধ্যেই উঠেছে। প্রশ্ন তুলেছেন তাঁর সমসাময়িক মানুষেরা, যাঁরা তাঁর বিপক্ষে ছিলেন, যেমন শিশুপাল, জরাসন্ধ, দুর্যোধন এবং আরও অনেকেই। সম্পূর্ণ ভারতযুদ্ধের দায়ও বর্তেছে তাঁরই ওপর এবং তার জন্য তাঁকে অভিশাপ গ্রহণ করতে হয়েছে গান্ধারীর কাছ থেকে। পৌরাণিকেরা আবার তাঁর ব্যক্তিজীবনের নারীঘটিত কলঙ্কগুলির সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন কারও মারফত এবং অবশ্যই তার সমাধান এসেছে কৃষ্ণের ভগবত্তার পথ ধরে। অর্থাৎ কিনা সর্ব শক্তিমান ভগবান যা করতে পারেন, অন্য সাধারণ মানুষ তা পারে না। সাধারণে যদি এমনটি করেও, তা হবে—শিব ছাড়া অন্য কারও পক্ষে সমুদ্রমথিত বিষ খাওয়ার শামিল। পৌরাণিকেরা তাই বলেছেন—বড় মানুষেরা যা বলেন তাই কর, যা করেন তাই করতে যেও না—তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎসমাচরেৎ। শুধু পৌরাণিক কেন, বৈদিক মীমাংসক কুমারিল ভট্ট পর্যন্ত তাঁর তন্ত্রবার্ত্তিকে কৃষ্ণ এবং অর্জুনের মদ্যপান নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়েছেন। আকুল হয়েছেন এই প্রশ্নেও যে কৌলিক সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও কৃষ্ণ রুক্মিণীকে বিয়ে করেছেন এবং অর্জুন তাঁর মামাতো বোন সুভদ্রাকে বিয়ে করেছেন কি করে?

এ সব প্রশ্ন সমাধানের সময় কুমারিলকে নানাভাবে প্রমাণ করতে হয়েছে যে ক্ষত্রিয় রাজপুরুষেরা যদি একটু গৌড়ী কিংবা মাধ্বীমার্কা সুরা পান করেন তাতে দোষ কি, ওসব বারণ ব্রাহ্মণদের বেলায়। আবার অর্জুনের মামাতো বোন বিয়ে করার সময় কুমারিলের যুক্তি হল—সুভদ্রা যদিও কৃষ্ণের বোন বলেই প্রসিদ্ধ, তবু এদের সম্বন্ধ বিচার করলে দেখা যাবে তিনি সরাসরি কৃষ্ণের বোন নন। বোন হলে অর্জুনের দোষ হত ঠিকই, কিন্তু কৃষ্ণের সম্বন্ধটাই যেখানে দূরে সরে যাচ্ছে সেখানে অর্জুনের দিক থেকে কি অসুবিধে আছে—

বাসুদেবাঙ্গজায়া চ কৌন্তেয়স্য বিরুধ্যতে।
ন তু ব্যবেতসম্বন্ধমভবে তদ্বিরুদ্ধতা ॥

ঠিক এমনি করেই যোগ খুঁজলে রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মকের সঙ্গেও কৃষ্ণের কৌলিক যোগ আছে, কিন্তু যেহেতু সে সম্বন্ধ দূরগত, অতএব কৃষ্ণের দোষ কি আছে? কুমারিল কিন্তু সর্বশেষে সেই ভগবত্তার পথই প্রায় ধরেছেন। তিনি কৃষ্ণের

জবানীতে ভগবদ্‌গীতার শ্লোক উদ্ধার করেছেন প্রথমে। শ্লোকে বলা হয়েছে—অর্জুন, আমার নির্দিষ্ট পথ সাধারণ মানুষেরা সবাই অনুসরণ করবে, কেননা শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা যা আচরণ করেন, সাধারণ মানুষের কাছে সেইটাই প্রমাণ বলে গণ্য হয়, তারা সেই পুরুষকে অনুসরণও করে। এই শ্লোক বলেই কুমারিল বললেন—যে কৃষ্ণ সমস্ত লোকের আদর্শস্বরূপ, তিনি সমাজবিরুদ্ধ আচরণ করবেন কি করে—স কথং সর্বলোকাদর্শভূতঃ সন্ বিরুদ্ধাচারং প্রবর্ত্তিষ্যতি ? অতএব রুক্মিণীকে বিয়ে করে তিনি কোনই অসামাজিক আচরণ করেননি।

ভাল কথা। কিন্তু এই মদ্যপান আর রুক্মিণীহরণ ছাড়াও কৃষ্ণজীবনে আরো অনেক ঘটনা ঘটেছে যা তর্কের যুক্তিতে প্রতিষ্ঠা করা কঠিন হবে এবং ভট্ট কুমারিল নিজে ক্ষুরধার তার্কিক হওয়া সত্ত্বেও সেসব তর্কের ধার মাড়াননি, কেননা সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ। বস্তুত আমরাও সে ধারে যাব না ; তার কারণ এই নয় যে আমরাও কুমারিলের বুদ্ধিমত্তার অনুবর্ত্তী ; তার কারণ এই যে, কৃষ্ণ চরিত্রের নীতি-যুক্তি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে অশোক রুদ্র, বিমলকৃষ্ণ মতিলাল পর্যন্ত বহু পণ্ডিত-গবেষক এই বিষয়ে কলম ধরেছেন এবং আমরা বলব—নাস্তং জগাম, এখনও তর্কের অবকাশ আছে।

আমার বক্তব্য খুব অল্প। ভগবত্তা দিয়ে কৃষ্ণের সামাজিক কলঙ্কমোচনের গুরুদায়িত্ব আমার নেই ; এমনকি বিভিন্ন বিপন্ন মুহূর্তে তিনি ঠিক কাজ করেছেন না বেঠিক—তা নির্ণয় করাও আমার দায়িত্ব নয়। আমি শুধু বলতে চাই তিনি যা করেছেন, তার একটা পরম্পরা আছে। কৃষ্ণ যখন জন্মেছিলেন, সেই সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁর অনুকূল ছিল না। রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রায় পুরোটাই ছিল পূর্ব-মধ্য ভারতীয়দের দখলে, যার প্রধান পুরুষেরা ছিলেন মগধরাজ জরাসন্ধ, চেদিরাজ শিশুপাল এবং পুণ্ড্রবর্ধনের রাজা পৌণ্ড্র বাসুদেব। কৃষ্ণের মামা কংস ছিলেন জরাসন্ধের জামাই এবং তিনি মগধরাজ জরাসন্ধের প্রতিনিধিমাত্র ছিলেন মথুরায়। জরাসন্ধই ছিলেন শ্রেষ্ঠতম এবং সমগ্র রাজমণ্ডল তাঁর কথায় উঠত বসত।

এইরকম একটা বিরুদ্ধ পরিস্থিতি থেকে রাজনীতির খেলাটা সম্পূর্ণ নিজের অনুকূলে নিয়ে আসার সম্পূর্ণ কৃতিত্বটাই কৃষ্ণের। তিনি কাজ আরম্ভ করেন তাঁর অত্যাচারী মাতুলকে মেরে এবং কাজ শেষ করেন ভারতযুদ্ধে উত্তরভারতের কর্তৃত্ব কায়েম করে। কাজটা সহজ ছিল না এবং যে অস্বাভাবিক দ্রুততায় তিনি এই কাজ সম্পন্ন করেছেন, তার জন্য ছলনা এবং কৌশলের আশ্রয় নেওয়া ছিল স্বাভাবিক। কোথাও তিনি নিজে প্রত্যক্ষভাবে এই ছলনা করেছেন, কোথাও অন্যকে দিয়ে করিয়েছেন। কিন্তু যে দ্রুততায় তিনি তাঁর রাজনৈতিক সিদ্ধি ঘটিয়েছেন, তা প্রায় অলৌকিকতার পর্যায়ে পড়ে এবং সেই জন্যেই ভগবান হতে তাঁর দেরী লাগেনি হয়তো। মহাভারতের সভাপর্বে জরাসন্ধ বধের পর যুধিষ্ঠিরের যে রাজসূয় যজ্ঞ হল, তার একটা রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে। পূর্বতন প্রধানপুরুষ জরাসন্ধ মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গেই যে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটল, তাতে প্রধান পুরুষ বলে কে গণ্য হবেন সেই বিতর্কই ছিল যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের বিষয়। তর্কটা অস্বাভাবিক ; কেননা অন্য ক্ষেত্রে, অন্য সময়ে যিনি

রাজসূয় যজ্ঞ করেন তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হন। কিন্তু এখানে রাজসূয় হবার পরেই যুধিষ্ঠির প্রকাশ্য রাজসভায় ঘোষণা করলেন—কৃষ্ণ ! তোমার জন্যেই এই পৃথিবী আজ আমার বশে এসেছে—ত্বৎকৃতে পৃথিবী সর্বা মদ্‌বশে কৃষ্ণ বর্ত্ততে। তোমার জন্যেই আজকে আমার এত টাকা-পয়সা, এত উন্নতি—ধনঞ্চ বহু বার্ষ্ণেয় ত্বৎপ্রসাদাদ্ উপার্জিতম্।

স্বয়ং রাজসূয়ের অধিকর্তার এই আত্মনিবেদন এমনি এমনি নয়। সমস্ত রাজমণ্ডল রাজসূয় যজ্ঞে দীক্ষিত নৃপতির সভায় উপস্থিত হন। তাদের সবার সামনে পালাবদলের নায়ককে যদি সর্বসম্মতভাবে উপস্থিত করা যায়, তার রাজনৈতিক মূল্য অন্যরকম। সভায় এসে যুধিষ্ঠির কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মকে কিছুই না জানার ভান করে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি একটি মাত্র লোকের নাম বলুন, যাঁকে আমি রাজসূয়ের অর্ঘ্য দান করতে পারি। বহুদিনের বিরাট রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় ভীষ্ম অনুভব করেছিলেন যুধিষ্ঠিরের মনের বাসনা কি ? দ্বিতীয়ত জরাসন্ধহন্তাকে তিনি নতুন দিনের নায়ক হিসেবে চিহ্নিত করতে কোন কুণ্ঠা বোধ করেননি। তিনি বললেন—সত্যিই তো কৃষ্ণের দ্বারাই এ সভার মুখ উজ্জ্বল হয়েছে, তাঁর জন্যেই এ সভা আজ আহ্লাদিত।

কিন্তু অভিজ্ঞ বৃদ্ধের এই সিদ্ধান্ত সভার অন্য রাজারা কেউই মেনে নিতে পারেননি। জরাসন্ধ মারা যাবার কয়েক মাসের মধ্যেই অল্পবয়সী নতুন নায়কের এই নির্বাচন প্রতিষ্ঠিত রাজারা মেনে নিতে পারেননি। প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলেন জরাসন্ধের ভাবশিষ্য শিশুপাল। প্রতিবাদের কারণও ছিল। যাঁরা কৃষ্ণের শত্রুপক্ষ তাঁদেরকে নেমন্তন্ন করে সভায় ডেকে এনে তাঁদেরই সামনে তাঁদের চিরশত্রুকে যদি সম্মানের মালা দেওয়া হয়, তা তাঁদের সইবে কেন ? শিশুপাল তাই বলেছেন—এ তো ডেকে এনে অপমান—কিং রাজভিঃ ইহানীতৈ রবমানায় ভারত। মনে রাখবেন, আমরা কেউ কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরের ভয়ে, কিংবা তাঁর কাছ থেকে কিছু পাবার লোভে অথবা সান্ত্বনার জন্য তাকে রাজকর দিতে আসিনি ; ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ধর্মসাধক রাজসূয় যজ্ঞ করছেন, তাই রাজকর দিতে এসেছি তাঁকে। কিন্তু তিনি আমাদের অপমান করছেন।

কথাগুলি রাজসূয় যজ্ঞে দীক্ষিত ব্যক্তির কাছে উপাদেয় নয়, কারণ চতুর্দিক জয় করেই না রাজসূয় যজ্ঞ। কিন্তু শিশুপাল তাঁর প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করেছেন—তাই নয় শুধু। কৃষ্ণকে বিশেষ সম্মান দেখানোর উপযুক্ত যোগ্যতা কৃষ্ণের আছে কিনা সেটা নির্ধারণ করাও শিশুপালের লক্ষ্য ছিল। শিশুপাল বললেন—যদি মনে করেন বৃদ্ধ স্থবিরকে সম্মান দেখানো উচিত, তাহলে কৃষ্ণ কেন, তার বাবা বসুদেবকে আপনি অর্ঘ্যদান করুন। যদি মনে করেন বাসুদেব কৃষ্ণ আপনার হিতৈষী এবং অনুবর্তী, তাহলে এই হিতৈষিতা কিংবা অনুবর্তিতার জন্য আপনি আপনার শ্বশুর দ্রুপদকে বেছে নিন, কৃষ্ণ কেন ? যদি মনে করেন কৃষ্ণ আপনার কাছে আচার্যের মত, তাহলেই বা কৃষ্ণ কেন, আপনি দ্রোণাচার্যকে অর্ঘ্যদান করুন। যদি মনে করেন কৃষ্ণ একেবারে বেদজ্ঞ পুরুষ, ঋত্বিক্—তাহলেই বা তিনি কেন, মহর্ষি দ্বৈপায়নের মত মহামতি পুরুষ আপনার সভাতেই উপস্থিত, আপনি তাঁকে নির্বাচন করুন। যদি এদেরও পছন্দ না হয়, তাহলে স্বয়ং ভীষ্ম আছেন, দুর্যোধন আছেন, অশ্বত্থামা আছেন, কৃপ আছেন,

মহারাজ পাণ্ডুর সমকক্ষ সম্মানী পুরুষ ভীষ্মক আছেন, শল্য, কর্ণ—কে নেই ? আপনি আর লোক পেলেন না, এঁদের ছেড়ে আপনি অর্ঘ্যদানের জন্য এমন একটা মানুষ বেছে নিলেন, যিনি ঋত্বিক্‌ও নন, আচার্যও নন, রাজাও নন—নৈব ঋত্বিক্ ন চাচার্যো ন রাজা মধুসূদনঃ।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে হঠাৎ করে যখন কৃষ্ণের অভ্যুদয় হল, তখন শিশুপাল বা তাঁর মত প্রতিষ্ঠিত নৃপতিদের দিক থেকে আক্রমণের এই ভাষাগুলি মনে রাখতে হবে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও যে কারণে কৃষ্ণকে রাজসূয় যজ্ঞের অর্ঘ্যদান করা হল, আমার মত ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোকের কৃষ্ণ নিয়ে বই লেখার কারণও সেইটাই।

শিশুপালের কথা শোনার পর যুধিষ্ঠির মিন-মিন করে বলেছিলেন—দেখ শিশুপাল ! তোমার থেকেও বয়সে এবং অভিজ্ঞতায় বড় মানুষেরা আমার অর্ঘ্যদান প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন, তুমিও মেনে নাও—মৃশ্যন্তি চার্হণং কৃষ্ণে তদ্‌বৎ ত্বং ক্ষন্তুমর্হসি। কিন্তু মহামতি ভীষ্ম দেখলেন, তিনিও এই প্রস্তাবের সঙ্গে জড়িত, অতএব কুলবৃদ্ধ হিসেবে উত্তরটা তাঁরই দেওয়া উচিত। ভীষ্মের বক্তব্যে সার কথা যা ছিল, তা হল—যুদ্ধের সময় যে ক্ষত্রিয় অন্য ক্ষত্রিয়কে জিতে নেয়, তাকে নিজের বশীভূত করে ছেড়ে দেয়, সেই ক্ষত্রিয় বিজিত ক্ষত্রিয়ের গুরুর মত। ভীষ্ম বললেন, এই বিরাট রাজসভায় একটি রাজাও নেই, যে কৃষ্ণের কাছে পরাজিত হয়নি। নিখিল ক্ষত্রিয়কুল তাঁর বাহুর শক্তি বুঝে নিয়েছে এবং সেই কারণেই সমস্ত পৃথিবী এখন কৃষ্ণেই প্রতিষ্ঠিত। ঠিক এই কারণেই হাজারো বৃদ্ধ মানুষ এই রাজসভায় থাকতেও কৃষ্ণকেই আমাদের সম্মান দেখানো উচিত। ভীষ্ম যেন এবার একটু রেগেই গেলেন—শিশুপালের বলা 'ঋত্বিক্', 'আচার্য' এসব খোঁটা তাঁর মনে আছে। তিনি বললেন—ওইসব জ্ঞানবৃদ্ধ-টৃদ্ধ আমি অনেক দেখেছি জীবনে—জ্ঞানবৃদ্ধা ময়া রাজন্ বহবঃ পর্যুপাসিতাঃ, কিন্তু তাঁদের কাছেও তো আমি এই কৃষ্ণের জয়গানই শুনেছি। তাছাড়া যদি বল—কৃষ্ণ এখনও বাচ্চা ছেলে, কিন্তু সেও তো অপরীক্ষিত নয়। শৌর্য, বীর্য, কীর্তি এবং সংগ্রামে তাঁর জয়ের লিষ্টি তো আমরা যাচাই করেছি, তারপরেই না তাঁকে সম্মান দেবার প্রশ্ন এসেছে—যশঃ শৌর্যং জয়ঞ্চাস্য বিজ্ঞায়ার্চ্চাং প্রযুজ্মহে। ন চ কশ্চিদিহাস্মাভিঃ সুবালো' প্যপরীক্ষিতঃ। মহান বৃদ্ধদের অতিক্রম করেও যে অল্পবয়সী কৃষ্ণকে আজকের দিনের নায়ক সাজিয়েছি, তার কারণ এইটাই। একটি রাজনৈতিক সভায় শিশুপাল যে প্রশ্ন তুলেছেন, ভীষ্ম তার মোকাবিলা করেছেন রাজনৈতিকভাবে।

ভীষ্ম এবার সিদ্ধান্তে আসছেন। তিনি বললেন—ব্রাহ্মণদের মধ্যে যিনি জ্ঞানবৃদ্ধ, ক্ষত্রিয়দের মধ্যে সবচেয়ে বলবান যিনি, বৈশ্যদের মধ্যে যাঁর বেশি টাকাপয়সা আছে, আর শূদ্রদের মধ্যে যিনি বয়োবৃদ্ধ—তিনিই সম্মানের যোগ্য। কিন্তু কৃষ্ণকে আমরা অর্ঘ্য বাড়িয়ে দিয়েছি দুটো কারণে—হেতূ দ্বাবপি সংস্থিতৌ। এক, তিনি বেদবেদাঙ্গ জানেন ব্রাহ্মণের মত। দ্বিতীয়, তিনি সর্বাধিক বলশালী। কাজেই এই দুই বিষয়েই কৃষ্ণর মত মানুষ আর দ্বিতীয়টি নেই বলেই আজকে তাঁকে পুজো করছি—নৃণাং লোকে হি কো' ন্যোস্তি বিশিষ্টঃ কেশবাদৃতে।

ভীষ্মের এই বিশ্লেষণটি আমার কাছে খুবই মূল্যবান। এই ক্ষুদ্র-পরিসর গ্রন্থে আমি শুধু দেখাবার চেষ্টা করেছি—কি করে আস্তে আস্তে কৃষ্ণ নামে এই বিস্ময় বালকটি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াইতে একেবারে সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করেছেন। রাজসূয় যজ্ঞের শেষে খাতায় কলমে ক্ষমতা এসেছে যুধিষ্ঠিরের হাতে, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল কৃষ্ণের হাতেই। পরবর্তীকালে এই ক্ষমতা আরও বেড়েছে, যার পরিণতি কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে ক্ষত্রিয়কুলের প্রধান অর্জুনের তিনি রাজনৈতিক সারথি। মনে রাখা দরকার তখনকার দিনে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লাভ করতে গেলে শুধুমাত্র একটার পর একটা যুদ্ধ জয় করলেই হত না। ছলে হোক, আর বলে হোক যুদ্ধ জয় তো করতে হবেই, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতার চূড়ায় উঠতে হলে আরও একটি জিনিসের প্রয়োজন হত—সেটি হল ব্রাহ্মণদের 'স্যাংসন'।

কৃষ্ণ যে এ ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্যোগী ছিলেন, তা ভীষ্মের ভাষ্য-বিশ্লেষণেই প্রমাণিত। আমি নিজে এই গ্রন্থের মধ্যে এ দিকটায় খুব একটা নজর দিইনি। তবে দু-একটা কথা এখানে অবশ্যই বলা উচিত। বস্তুত 'গোব্রাহ্মণের হিতৈষী' বলে কৃষ্ণের যে উপাধি জুটেছে, তা বিনা কারণে নয়। প্রথম জীবনে সান্দীপনি মুনির আশ্রমে শিক্ষা নেওয়া ছাড়াও ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সব সময়েই তিনি যোগাযোগ রাখতেন, পারলে তাঁদের উপকারও করতেন। সেকালে কখনও কোন রাজা নানা কারণে অত্যাচারী বলে প্রমাণিত হতেন, এবং অহংকারবশে কখনও না কখনও ব্রাহ্মণদের অপমানও করে ফেলতেন। সেই অত্যাচারী রাজা যখন যুদ্ধে মারা পড়তেন, তখন ব্রাহ্মণেরা অবশ্যই অনুকূল হয়ে পড়তেন বিজয়ী রাজার। কৃষ্ণের জীবনে এ ঘটনা অনেকবার ঘটেছে। কংস জরাসন্ধরা মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণেরা অনেকেই যে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে স্বস্তিবাচন করেছেন, সে প্রমাণ তো আছেই—তত্রৈনং নাগরাঃ সর্বে সৎকারেণাভ্যয়ুস্তদা। ব্রাহ্মণপ্রমুখা রাজন্ বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ॥

এ তো গেল ব্রাহ্মণের নিজস্ব প্রতিক্রিয়া। কিন্তু প্রয়োজন পড়লে কৃষ্ণ যে কত সুচারুভাবে ব্রাহ্মণদের তোষণ করতে পারতেন, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ। দায়িত্বপূর্ণ হাজারো কাজ থাকা সত্ত্বেও তিনি আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের পা ধুইয়ে দেওয়ার কাজ নিলেন—চরণক্ষালনে কৃষ্ণো ব্রাহ্মণানাং স্বয়ং হ্যভূৎ। কাজটা সহজ ছিল না, অতগুলি লোকের সামনে জরাসন্ধজেতা পুরুষটি যদি ব্রাহ্মণের পদসেবা করেন, ব্রাহ্মণদের কাছে তার আলাদা মূল্য আছে এবং সে মূল্য ব্রাহ্মণদের তুষ্টি।

প্রণিধান করে মহাভারত পড়লে দেখা যাবে কৃষ্ণের রাজনৈতিক জীবনে আরও একটা সুবিধে ছিলেন যুধিষ্ঠির। যুধিষ্ঠির নিজে ক্ষত্রিয় হওয়া সত্ত্বেও তাঁর আচার-ব্যবহার সবই ব্রাহ্মণের মত ছিল—এ কথা মহাভারতেই বহুবার বলা আছে। বিশেষত ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল নিবিড়। জীবনের বহু অমূল্য সময় তাঁকে বনে বনান্তর ঘুরতে হয়েছে বলে এই যোগাযোগ আরও বেড়েছিল। কৌরবেরা যখন পাণ্ডবদের কপট-পাশায় হারিয়ে বনে পাঠালেন, তখন পাণ্ডবদের, বিশেষত যুধিষ্ঠিরের এই বিপদকে, নিকট স্বজনের বিপদ বলেই গণ্য করেছেন ব্রাহ্মণেরা। যুধিষ্ঠিরের প্রতি ব্রাহ্মণদের এই সহানুভূতি আখেরে

কৃষ্ণেরই কাজে দিয়েছে।

মহাভারতের বনপর্বে পাণ্ডবেরা যখন দ্বৈতবনে প্রবেশ করেছেন, তখন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। দ্বৈতবনে যুধিষ্ঠির প্রায় সব সম্প্রদায়ী ব্রাহ্মণদের সহানুভূতি লাভ করেন। এখানে দেখা যাচ্ছে, ভৃগু, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অগস্ত্য, অত্রি—এই সব নামী-দামী ব্রাহ্মণ-গোত্রীয়েরা যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, যার 'নিট' ফল একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মত। এই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় সম্মেলনে দালভ্য মুনি বক একটি সুচিন্তিত বক্তব্য পেশ করেন। তাতে বোঝা যাবে—সেকালের যে কোন রাজনৈতিক পালাবদলের সময়ে ব্রাহ্মণ্য সমর্থন কত জরুরী ছিল। বক দালভ্য যুধিষ্ঠিরকে বললেন—

সমস্ত সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণেরা এখানে আপনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে—ব্রাহ্মণাঃ সঙ্গতাঃ ত্বয়া। আপনি মনে রাখবেন, হাওয়া পেলে আগুন যেমন সমস্ত বন পুড়িয়ে ছাড়ে, তেমনি ব্রাহ্মণদের তেজ যদি ক্ষত্রিয়ের শক্তির সঙ্গে মেলে, তাহলে সমস্ত শত্রুকুল ধ্বংস করে ছাড়ে। ব্রাহ্মণদের বাদ দিয়ে কোন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বর্তমান জগৎ বশে আনা সম্ভব নয়, পরলোকের কথা নাই বা বললাম। হাতীকে অঙ্কুশ মারলে যেমন তার শক্তি কমে যায়, তেমনি যুদ্ধের সময় ব্রাহ্মণদের সমর্থনহীন ক্ষত্রিয়েরাও বলহীন হয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণদের কৃপাদৃষ্টি আর ক্ষত্রিয়ের তেজ—এই দুটো এক জায়গায় মিললেই আপনি স্বচ্ছন্দে সব করতে পারেন। আমি আবার সেই হাওয়ার তুলনা দিচ্ছি মহারাজ! লেলিহান আগুন যেমন উপযুক্ত হাওয়া পেলে দাহ্য বস্তু অবশ্যই দগ্ধ করে, তেমনি ব্রাহ্মণদের সহায় পেলে শত্রু জয় করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কিছুই নয়—তথা দহতি রাজন্যো ব্রাহ্মণেন সমং রিপুম্।

এই বক্তৃতা করে বক দালভ্য যুধিষ্ঠিরকে বললেন—আপনি মহারাজ, চিরকাল ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেছেন—ব্রাহ্মণেষূত্তমা বৃত্তিস্তব নিত্যং যুধিষ্ঠির—অর্থাৎ কিনা আপনার কি চিন্তা আছে? এই কথার পরে সমবেত ঋষিরা, যাঁরা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই অত্যন্ত নামী, তাঁরা প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ সমর্থন জানালেন যুধিষ্ঠিরকে। মহাভারতকার এঁদের নাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন ব্রাহ্মণেরা এখানে সবাই যুধিষ্ঠিরকে স্তব করলেন রীতিমত—স্তূয়মানে যুধিষ্ঠিরে, তাঁরা রীতিমত পূজা বন্দনা করলেন যুধিষ্ঠিরকে—অজাতশত্রুমানর্চ্চুঃ।

দ্বৈতবনের পত্রচ্ছায়ায় এই যে ব্রাহ্মণ্য-রাজন্যের সম্মেলন হয়ে গেল, তার রাজনৈতিক ফল সুদূরপ্রসারী এবং সে ফল কাজে লাগিয়েছেন কৃষ্ণ। তিনি যুধিষ্ঠিরকে সামনে রেখে রাজনীতির সমস্ত কল্প একে একে প্রয়োগ করেছেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত। বলা বাহুল্য কৃষ্ণের আপন ছেলে-পিলেরাই ব্রাহ্মণ্যশক্তি হাতে রাখার গুরুত্ব বুঝতে পারেনি, যার ফল মৌষল পর্ব, যদুবংশ ধ্বংস। কারণে অকারণে কৃষ্ণ যে কতখানি ব্রাহ্মণদের হাতে রেখে চলতেন তার একটা বড় উদাহরণ পাওয়া যাবে ভীমের ছেলে ঘটোৎকচ মারা যাবার পর।

ভীমের ছেলে ঘটোৎকচ যখন কর্ণের একাঘ্নী বাণের আঘাতে যুদ্ধক্ষেত্রে ধরাশায়ী হলেন, তখন পাণ্ডব শিবিরে শোকের ছায়া নেমে এল। সমস্ত পাণ্ডবেরা যখন শোকে অধীর, তখন দেখা গেল কৃষ্ণ উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করছেন। তাঁর এই অকারণ এবং অন্যায় আনন্দ দেখে অর্জুন পর্যন্ত হকচকিয়ে গেলেন এবং তাঁর

আনন্দের কারণও জিজ্ঞাসা করলেন। কৃষ্ণের মুখ থেকে প্রথম কারণ যা জানা গেল—তা হল, কবচ-কুণ্ডল হারিয়ে কর্ণ ইন্দ্রের কাছ থেকে পেয়েছিলেন একাঘ্নী শক্তি, যা পঞ্চ পাণ্ডবের একজনকে মারবেই। আর মারবে যখন, সে তো আর নকুল, সহদেবকে মারবে না, মারবে অর্জুনকেই। কৃষ্ণই ঘটোৎকচকে অতিযুদ্ধে তাতিয়ে দিয়েছিলেন, যার জন্য সযত্ন সঞ্চিত একাঘ্নী খরচ করতে হল কর্ণকে, ঘটোৎকচকে মারবার জন্য। এতে প্রিয়সখা অর্জুন বেঁচে গেলেন, তাই কৃষ্ণের নাকি আনন্দ।

বেশ। একথাটা বেশ বোঝা গেল। কিন্তু এরপর কৃষ্ণ একে একে প্রকাশ করতে থাকলেন তাঁর পূর্ব কৌশলগুলি, যার জোরে তিনি অর্জুনকে নানা বিপদে রক্ষা করেছেন। এ কথাগুলিও বোঝার অসুবিধে নেই। কিন্তু একেবারে শেষে কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন—দেখ অর্জুন, এই যে হিড়িম্ব, বক রাক্ষস, কির্মীর—এরা সবাই প্রায় ত্রেতা যুগের রাবণের মত রাক্ষস। এরা ব্রাহ্মণদ্রোহী এবং যজ্ঞবিদ্বেষী। এদের সবাইকে মধ্যম পান্ডব ভীম সাবাড় করে দিয়েছেন। বাকী ছিল এক অলায়ুধ রাক্ষস, সে কৌরবপক্ষে যোগ দিয়েছিল। রাক্ষস দিয়েই রাক্ষস মারিয়েছি, ঘটোৎকচ তাকে মেরেছে। এবার স্বয়ং ঘটোৎকচকে তাতিয়ে দিয়ে কর্ণের সামনে ফেলেছি, যাতে সেই তাকে বধ করে—হৈড়িম্ব শ্চাপ্যুপায়েন শক্ত্যা কর্ণেন ঘাতিতঃ। কেন জান অর্জুন? ঘটোৎকচ ছিল ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধাচারী এবং যজ্ঞদ্বেষী রাক্ষস—এষ হি ব্রাহ্মণদ্বেষী যজ্ঞদ্বেষী চ রাক্ষসঃ। সে পাপী ধর্মকর্মের লোপ ঘটাত, তাই কায়দা করে কর্ণের সামনে অতিযুদ্ধরত অবস্থায় ফেলে তাকে মারিয়েছি। বস্তুত কর্ণ যদি তার অমোঘ শক্তি দিয়ে এই ঘটোৎকচকে না মারত, তাহলে কোন না কোন সময়ে আমি এই রাক্ষসটাকে মারতাম, কারণ সে ছিল এতটাই ব্রাহ্মণদ্বেষী এবং যজ্ঞবিঘ্নকারী। এতদিন যে আমি তাকে মারিনি, সে শুধু তোমাদের প্রিয় সাধনের জন্য।

এই যুক্তি বড় মর্মান্তিক। কথাটা যুধিষ্ঠিরের পর্যন্ত ভালো লাগেনি। কৃষ্ণের কথার প্রতিবাদ করে তিনি বলেছিলেন—ধর্মাধর্মের সূক্ষ্ম গতি আমার ভালই জানা আছে (ভাবটা এই যে ও ব্যাপারটা আমি তোমার থেকে বেশি বুঝি)। কিন্তু তাতেও এটা বুঝতে পারছি না যে, ব্রাহ্মণদ্বেষিতা ব্যাপারটা ঘটোৎকচের ক্ষেত্রে কি করে খাটে—ব্রহ্মহত্যাফলং তস্য যৎ কৃতং নাববুধ্যতে। এরপর কবে কোথায় ঘটোৎকচ কিভাবে পাণ্ডবদের সাহায্য করেছিলেন—সে সব কথা বলতে বলতে যুধিষ্ঠির কেবল চোখ মুছতে থাকলেন। আমাদের এ বিষয়ে প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন এইটুকুই যে শুধু রাক্ষস নামটি ব্রাহ্মণদ্বেষিতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলেই কৃষ্ণ ঘটোৎকচকে নিজেই মারতে চেয়েছিলেন। বাস্তবক্ষেত্রে ঘটোৎকচ ব্রাহ্মণদ্বেষী ছিলেন কিনা, যুধিষ্ঠিরের কথায় তার সায় মেলে না। ঘটোৎকচের মৃত্যুর পর কৃষ্ণের বক্তব্য থেকে যা বোঝা যায় তা হল, ব্রাহ্মণদের হাতে রাখবার জন্য তিনি আপন স্বজনকে যুদ্ধে লড়িয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হননি, কুণ্ঠিত হননি সে কথা জোর গলায় বলতেও। জীবনের আরম্ভ থেকে রাজনৈতিক জগতের মূর্ধণ্যভূমিতে আসবার জন্য কৃষ্ণ নিজে যেমন ক্ষাত্র শক্তি ব্যবহার করেছেন, তেমনি ব্যবহার করেছেন ব্রাহ্মণ্যশক্তিকেও। পাণ্ডব ক্ষত্রিয়ের জ্যাঘোষে কৃষ্ণের যে লাভ হয়েছে, তাকেই অনুরক্ত সহায়তায় ধরে রেখেছে

ব্রহ্মঘোষ, কেননা এই দুয়ে মিলেই তখনকার রাজশক্তি নিরঙ্কুশ হত। বক দালভ্য তাই বলেছিলেন—জ্যাঘোষশ্চৈব পার্থানাং ব্রহ্মঘোষশ্চ ধীমতাম্। সংসৃষ্টং ব্রহ্মণা ক্ষত্রং ভূয় এব ব্যরোচত॥

ব্রাহ্মণ্য এবং রাজন্য—এই দুয়ের সুষম সদ্ব্যবহার ছাড়াও কৃষ্ণের যেটা বাড়তি সুবিধে ছিল, সেটি হল তাঁর বুদ্ধি এবং পুরুষকার। বিপদের সময় ভেঙে পড়া, উৎসাহ হারানো কিংবা অভীপ্সিত কাজ সম্পন্ন হলে উল্লম্ফন না করা—এসব গীতোক্ত গুণগুলি যে তাঁর ভিতরে ছিল, তারও কারণ এই পুরুষকার এবং বুদ্ধি। কিন্তু সুযোগের সদ্ব্যবহার, পৌরুষ, বুদ্ধি—এত সব গুণ দিয়ে কৃষ্ণের শেষ লাভ কি হল, তার একটা হিসেব কষা দরকার। দরকার এইজন্যে যে, কৃষ্ণ এক বিরাট ধর্মরাজ্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং মহাভারত তথা ভগবদ্গীতায় এই মর্মে বহুতর বিচিত্র বক্তৃতাও দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতিতেও এই ধর্মরাজ্যের চেহারাটা কিরকম হয়েছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে তার একটা রূপ পাওয়া গেছে বৈকি! রাজ্য জুড়ে হাহাকার, পুরুষসৈন্য প্রায় নিঃশেষ, কৌরবদের কেউ বেঁচে নেই, পাণ্ডবরা নিজেরা বেঁচে থাকলেও তাঁদের বংশে এক পরীক্ষিৎ ছাড়া আর কেউই বেঁচে নেই। আছে শুধু ধর্মরাজ্য, কেননা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জয় হয়েছে। যুধিষ্ঠিরের অভিষেক-বারিতে বিধবাদের অশ্রু মিশে গেল, শঙ্খধ্বনি-হুলু ধ্বনির সঙ্গে মিশে গেল বিধবাদের ক্রন্দন। ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হল, কৃষ্ণের স্বপ্ন সার্থক হল।

কিন্তু এই সার্থকতার একটা হিসেব কষা দরকার বলেই মহামতি ব্যাস একটা হিসেব মহাভারতের মধ্যেই কষেছেন। যে ধর্মরাজ্যে যুধিষ্ঠিরের প্রতিষ্ঠা হল, তার রূপেই তো নিশ্চয় এই হিসেবের আরম্ভ, যা ঔপন্যাসিক শ্রীগজেন্দ্র কুমার মিত্র তাঁর পাঞ্চজন্য উপন্যাসে দেখিয়েছেন, দেখিয়েছেন শ্রীবিমল কৃষ্ণ মতিলাল তাঁর নাতিক্ষুদ্র প্রবন্ধ নীতি, যুক্তি ও ধর্মে। কিন্তু যিনি এই বিরাট ধর্মরাজ্যের প্রবক্তা এবং প্রতিষ্ঠাতা, সেই কৃষ্ণেরও একটা হিসেব আছে মহাভারতেই। হিসেবটা ধরা আছে এত সূক্ষ্মভাবে, এমন সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় যে, পুরুষোত্তম কৃষ্ণের উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠার নিরিখে তা প্রায় ধরাই যায় না। কিন্তু ব্যাস যা বলার বলেছেন, এবং আমাদের যা ধরার তা থেকেই ধরতে হবে।

একটা কথা প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার যে, 'ধর্ম' বলতে ব্যাস কোন অতিলৌকিক ব্যাপার বোঝেন না, বোঝেন না ফুল, বেলপাতা, নৈবেদ্য। 'ধর্ম' বলতে তিনি জীবনের ধর্মই বোঝেন, গোটা মহাভারতে এই জীবন-ধর্মের কাহিনীই রসে, ব্যঞ্জনায় বিধৃত। ব্যাস জানেন জীবনের ধর্মে কতগুলি নিয়ম আছে, নীতি আছে। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্নেহে অন্ধ, তার ফল তাঁকে পেতে হয়েছে। কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম কামার্ত পিতার বিবাহ সম্বন্ধ করলেন, নিজে বিয়ে করলেন না, রাজ্য হাতে নিলেন না, তার ফলও তাঁকে পেতে হয়েছে—বংশ বংশ ধরে পুত্র-পৌত্রদের অন্যায়, অবিচার এবং বিনাশও তাঁকে দেখে যেতে হয়েছে। রেহাই পাননি দ্রোণাচার্য, কুন্তী, গান্ধারী কিংবা অন্য কেউ। আবার ব্যাসের ধারণায় যিনি উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছেন, তাঁকেও কতগুলি নীতি-নিয়ম মানতে হয়, না হলে শেষরক্ষা হয় না। এটা অবশ্যই ঠিক যে, যিনি চরম মেধাবী, তিনি আপন প্রতিষ্ঠার দিকে যেতে চাইলে সমস্ত বাধা বিঘ্নই তিনি অতিক্রম

করবেন। কিন্তু ব্যাসের দৃষ্টিতে তার মধ্যেও এক ধরনের শৃঙ্খলা থাকার কথা, নইলে চলে না। এ ব্যাপারে স্বয়ং কৃষ্ণই তাঁর উদাহরণ। কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল, শাল্ব একে একে সবাইকে সরিয়ে দিয়ে তিনি পাণ্ডবদের সঙ্গে জোট বেঁধেছেন জরাসন্ধ-শিশুপালের মিত্রশক্তি কৌরবদের পর্যুদস্ত করতে। তাঁর নিজের গোষ্ঠী অন্ধক, বৃষ্ণি, যাদবদের প্রতিষ্ঠা দিনে দিনেই বেড়ে উঠছিল, তাঁর আপন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠার সুযোগ নিয়ে তাঁর স্ববংশীয়রা বেড়ে উঠছিলেন বিকৃতভাবে। অন্তর্দ্বন্দ্ব তো ছিলই, সেই সঙ্গে জুটেছিল সুরাপান আর স্ত্রীলোকের ব্যসন। কৃষ্ণ তাঁদের সর্বাংশে শাসন করতে পারেননি কিংবা তাঁরা শাসন শোনেননি।

সে যুগে যা ধর্ম বলে প্রচলিত ছিল—বেদ-ব্রাহ্মণ্য ইত্যাদি, সেগুলির প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল থাকার ফলে আপাতত গো-ব্রাহ্মণের হিতকারী এক বেদধর্মের প্রবক্তা হিসেবেই তাঁর সুনাম হয়েছিল। কিন্তু জীবনের ধর্মে তাঁর কঠিন বিরোধীদের তিনি যে পন্থায় স্বধামে পৌঁছে দিয়েছেন, ব্যাস তা লুকোননি। ব্যাস তাঁর অতি পরিশীলিত ব্যঞ্জনায় বুঝিয়ে দিয়েছেন, কিভাবে যুধিষ্ঠিরকে তিনি হাতের পুতুলে পরিণত করেছিলেন। গল্প শোনা যায়, এক সময়ে রাশিয়ার অভিভাবক স্টালিন নাকি হাতে কলমে দেখিয়েছিলেন যে প্রতিরোধ এলে কেমন ব্যবহার করতে হয়। তিনি একটি জ্যান্ত মুরগীকে সমস্ত পালক ছাড়িয়ে রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। গরম কিংবা ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচবার জন্য মুরগীটি ক্রমাগত দেয়ালের কাছে সিঁটিয়ে যাচ্ছিল অথবা আশ্রয় নিতে চাইছিল দেয়ালের পাশে। যুধিষ্ঠিরের অবস্থাটা প্রায় ছিল এই মুরগীর মতন। যুধিষ্ঠির যদিও কৃষ্ণের বিরোধী ছিলেন না, কিন্তু কৃষ্ণের রাজনৈতিক ধুরন্ধরতায় যুধিষ্ঠির অথবা অন্য পাণ্ডবদের অবস্থা এমনই হয়েছিল যে, কোন ক্ষেত্রেই তাঁরা কৃষ্ণের মত বিরাট এক ব্যক্তিত্বের দেয়ালের পাশে না দাঁড়িয়ে পারছিলেন না। এ জিনিসটা ব্যাস আকারে প্রকারে, ব্যঞ্জনায় নানাভাবেই প্রকাশ করেছেন, ধৈর্যশীল মহাভারতের পাঠকের কাছে এর ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর একসময়ে ধৈর্যশীলা গান্ধারী পাণ্ডবদের অভিশাপ দিতে চান। কারণ, কৌরবপক্ষে বাতি দেবার জন্য একটি সন্তান-প্রদীপও তাঁরা অবশিষ্ট রাখেননি। কিন্তু মহামতি ব্যাস তাঁর পুত্রবধূকে এই শাপ দেওয়া থেকে নিরস্ত করেন। এর পরে সন্তানহারা জননীর ক্রোধ গিয়ে পড়ে কৃষ্ণের ওপর। অভিযোগ এই যে, কুরু-পাণ্ডবের এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম যদি কেউ বন্ধ করতে পারতেন তো তিনি কৃষ্ণ। তিনি এই চেষ্টা করেননি, অতএব গান্ধারীর অভিশাপ নেমে এল তাঁরই ওপর। শাপের বিষয়বস্তু ছিল যদুবংশের ধ্বংস। বিস্ময়ের ব্যাপার, ব্যাস কিংবা আর কেউ গান্ধারীকে এই শাপ দেওয়া থেকে নিরস্ত করেননি। মহাভারতকার হিসেবে ব্যাসের হয়তো ধারণা ছিল যে গান্ধারীর অভিশাপ ধারণের ক্ষমতা কৃষ্ণের ছিল এবং তা পাণ্ডবদের ছিল না। কিন্তু দুষ্টমনে এই প্রশ্নও জাগে—গান্ধারীর মত ব্যাসেরও এই ধারণা ছিল না তো, যে, কৃষ্ণ এই যুদ্ধ বন্ধ করলেও করতে পারতেন এবং যুদ্ধের জন্য কৃষ্ণই দায়ী, পাণ্ডবরা নন।

উদ্যোগপর্বে ব্যাস যেন আপাতত দেখিয়েছেন যে কৃষ্ণ সন্ধি-টন্ধির প্রস্তাব

নিয়ে যাচ্ছেন, তিনি যেন যুদ্ধ বন্ধ করতে চান। কিন্তু সেই উদ্যোগপর্বেই ব্যাস এটাও দেখিয়েছেন যে, আপাতত কৃষ্ণ যাই প্রস্তাব করুন না কেন, তিনি মনে প্রাণে যুদ্ধ বন্ধ করতে চাননি। এই কথাটা বর্তমান প্রবন্ধে যথাসম্ভব প্রমাণ সহযোগে আমিও দেখাবার চেষ্টা করেছি এবং তা অবশ্যই ব্যাসের মনোভাব বুঝে, স্বকপোলকল্পনায় নয়। ব্যাস দেখিয়েছেন কৃষ্ণ কৌরবদৌত্যে ব্যর্থ হয়ে যখন ফিরে যাচ্ছেন, তখন তিনি একাকী যুদ্ধবীর কর্ণের কাছে গিয়ে তাঁকে পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিতে বলেন। কৃষ্ণই কর্ণকে প্রথম বলেন যে তিনি সূতপুত্র নন, কুন্তীর পুত্র। কর্ণ পাণ্ডবদের সঙ্গে মিলিত হলে কত সুফল ফলবে এবং ভাবী মহারাজ কর্ণকে পাণ্ডবেরা এবং স্বয়ং কৃষ্ণও যে কতভাবে বিনতি দেখাবেন, তার কাল্পনিক চিত্র এঁকে কৃষ্ণ বার বার কর্ণকে প্রলোভিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কর্ণ একটুও বিচলিত হননি। তিনি নিজের জন্মবৃত্তান্ত, যেভাবেই হোক আগেই জেনেছিলেন এবং সেই কারণেই হয়তো বিচলিত হননি। কিন্তু লক্ষ্য করার মত বিষয় হল, কৃষ্ণ কর্ণের কাছে কথাটা বললেন, কিন্তু কই যুধিষ্ঠিরের কাছে তিনি তো এই সত্য প্রকাশ করেননি। যদি যুদ্ধ বন্ধ করার ইচ্ছে থাকত, তাহলে কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত যুধিষ্ঠিরের কাছে তোলা উচিত ছিল স্বয়ং কৃষ্ণের অথবা কুন্তীর। কুন্তী তো পরিষ্কার যুদ্ধ চেয়েইছেন এবং উদ্যোগ পর্বে কৃষ্ণের মাধ্যমে ছেলেদের রীতিমত উত্তেজিতও করবার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য তাঁর উত্তেজনার কারণও আছে।

কানীন পুত্রের মাতৃত্ব স্বীকার করে নেওয়ার মত বুকের পাটা হয়তো কুন্তীর ছিল না, কিন্তু কৃষ্ণ সত্যটা জানতেন এবং তিনি কুন্তীরও আগে কর্ণের সঙ্গে দরবার করতে গিয়েছিলেন। সেই নিরিখে, বিশেষত কর্ণের সারা জীবনের অপমান, অভিমানের নিরিখে এই সত্যটা তো কৃষ্ণই প্রকাশ করতে পারতেন পাণ্ডবদের কাছে, যুধিষ্ঠিরের কাছে। এতে যে ফল হত তাতে আমি নিঃসন্দেহ, কেননা তার প্রমাণ আছে স্ত্রীপর্বের শেষ অধ্যায়ে এবং শান্তিপর্বের প্রথম কয়েকটি অধ্যায়ে। স্ত্রীপর্বের শেষ অধ্যায়ে গঙ্গার তীরভূমি আকীর্ণ হয়ে গেছে বীরপত্নী বিধবাদের দ্বারা। কারও মনে আনন্দ নেই, উৎসাহ নেই, প্রত্যেকেই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে বীর নায়কদের তর্পণে ব্যস্ত। এরই মধ্যে ক্রন্দনরতা কুন্তী হাহাকার করে পাণ্ডবদের অনুচ্চস্বরে বললেন—ওরে তোরা তোদের বড় ভাইয়ের উদ্দেশ্যে একটু জল দে গঙ্গায়। যে মানুষটার মত বীর আর ছিল না, যাকে এতকাল তোরা সূতপুত্র, রাধার ছেলে বলে জেনে এসেছিস, যুদ্ধক্ষেত্রে যে বীরের সদ্গতি লাভ করেছে, সূর্যের মত তেজী যে ছেলেটাকে অর্জুন মারল, সেই সত্যবদ্ধ বীর কর্ণ তোদের আপন ভাই, সবার বড় ভাই, তার জন্যে এক অঞ্জলি জল দে গঙ্গায়।

কুন্তীর কথা শুনে যুধিষ্ঠিরের মত যুদ্ধে স্থির থাকা মানুষও সাপের মত নিঃশ্বাস ছাড়ছিলেন ক্রোধে। মাকে অনেক কথা শোনানোর পর যুধিষ্ঠির বললেন অভিমন্যু মারা যেতেও আমি যে শোক পাইনি, দ্রৌপদীর সমস্ত ছেলেগুলি মারা যেতেও আমি যে শোক পাইনি, তার চেয়েও শতগুণ দুঃখ আজ আমি পেলাম কর্ণের মৃত্যুতে। তুমি যদি একবারের তরেও আমাকে বলতে যে, কর্ণ আমাদের বড় ভাই, তাহলে স্বর্গে থাকা জিনিসও আমাদের অপ্রাপ্য থাকত না এবং সমগ্র কুলের অন্তকারী এই যুদ্ধেরও সূত্রপাত হত না—ন চ স্ম বৈশসং ঘোরং

কৌরবান্তকরং ভবেৎ।

অগ্রজ কর্ণের মৃত্যুতে যুধিষ্ঠিরের এই প্রতিক্রিয়ার মধ্যে এক বিরাট সত্য লুকানো আছে। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের হাতে পুতুল হলেও কোথাও কোথাও ধর্মের নামে তিনি বেশ খানিকটা একবগ্গা ; ঘটোৎকচের মৃত্যুর পরেও কৃষ্ণের যুক্তি তিনি মেনে নেননি, বরঞ্চ প্রতিবাদ করেছেন। সেই যুধিষ্ঠির যদি জানতেন যে, কর্ণ তাঁর অগ্রজ সহোদর তাহলে হয়তো যুদ্ধ নাও লাগতে পারত। বয়স্কা জননী লজ্জায় আপন পুত্রকেই তাঁর কন্যাবস্থার কলঙ্ক জানাতে চাননি। কিন্তু কৃষ্ণের কী হয়েছিল, তিনি কেন যুধিষ্ঠিরকে অথবা তাঁর প্রিয়সখা অর্জুনকেই বা জানাননি যে, কর্ণ তাঁদের বড় ভাই, কুন্তীর ছেলে। বিশেষত কানীন পুত্র সে যুগে সমাজে অসম্মানিত ছিল না। গান্ধারীর শাপটা তাই মিথ্যে নয়। কৃষ্ণ যুদ্ধ বন্ধ করতে চাননি, বরঞ্চ মনে মনে যুদ্ধ চেয়েইছিলেন।

মহাভারতের কর্তা হিসেবে ব্যাস দেখিয়েছেন যে, কৃষ্ণ যতই মেধাবী, যতই কূটবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হোন না কেন, অথবা হোন না তিনি ঈশ্বর—মনুষ্যশ্রদ্ধার চরম আসনে অধিষ্ঠিত, কিন্তু তিনি যখন নরলীলা মনুষ্য-ব্যবহারী, তখন জীবনের ধর্ম তাঁকে পালন করতেই হবে। সে ধর্মে যদি ফাঁকি থাকে তবে ঈশ্বরকেও তার ফলভোগ করতে হবে ! এই নিরিখে গান্ধারী অভিশাপ একটি রূপকমাত্র। ব্যাস দেখিয়েছেন—একে একে সমস্ত প্রতিপক্ষ শাতন করে কৃষ্ণ যখন ক্ষমতার চূড়ায় উঠে বসেছেন, তখন সেই ধর্মরাজ্যে টিকে আছেন শুধুই ধর্মরাজ—সদানত, সর্বদা অনুগামী। ততদিনে তাঁর নিজের ঘরেই আগুন লেগে গেছে ; দু-তিনটি স্ত্রী ছাড়া কৃষ্ণের অন্য স্ত্রীরা সবাই প্রায় বিপথগামিনী ;তাঁর পুত্রেরা এবং অন্যান্য বংশজেরা কৃষ্ণের ক্ষমতাতেই এত মদোন্মত্ত যে, তাঁদের লঘু-গুরু জ্ঞান নেই। কৃষ্ণের সামনেই তাঁরা যথেচ্ছ সুরাপান করেন, ব্যবহার করেন প্রতিকূল। ব্যাস দেখিয়েছেন—ঈশ্বরত্ব কিংবা ঐশ্বর্য ব্যক্তিজীবনের পক্ষে কোন সমাধান নয়। ছোট ছোট অন্যায়, ছলনা এবং অনীতি সাময়িকভাবে কৃষ্ণকে সুবিধে দিয়েছে মাত্র, কিন্তু সেগুলি পরিণাম-রমণীয় হয়নি কখনও।সেজন্য সারাজীবন ধর্ম ধর্ম করে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পক্ষে অন্তত যে সম্মান নিয়ে মহাপ্রস্থানের পথে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল, স্বয়ং ঈশ্বরীভূত কৃষ্ণের পক্ষে সেই সম্মানে দেহত্যাগ করা সম্ভব হয়নি। কারণ জীবনের ধর্মে কৃষ্ণের অন্যায় ছিল, ছলনা ছিল, এমনকি হীনতাও ছিল এবং মহাভারত মহাকাব্যের সর্বময় কর্তা হিসেবে ব্যাস সে অপরাধ ক্ষমা করেননি। কিন্তু মহাকবি কিংবা ইতিহাস প্রণেতা হিসেবে ব্যাস এতটাই নির্বিকার এবং এতটাই নির্মোহ যে, বুদ্ধি, বল এবং মেধাবিত্বের নিরিখে এই ছলনাময় পুরুষটিকে ঈশ্বরের আসনে বসিয়ে ভগবত্তায় প্রতিষ্ঠিত করতেও তাঁর কুণ্ঠা হয়নি। অন্য দিকে স্ত্রীলোকের মুখে শাপের প্রতীকে কিংবা নিজের অন্যায়ের নিরিখে তাঁকে এবং তাঁর বংশ ধ্বংস করতেও ব্যাসের বাধেনি। কৃষ্ণ তাই এখনও বিতর্কের বিষয়ই রয়ে গেলেন। তাঁর সমসাময়িকেরাও তাঁকে যখন যা ভেবেছেন, তার থেকে তিনি হয়তো অন্যরকম থেকে গেছেন, এখন আমরাও যা ভাবছি, তার থেকেও তিনি হয়তো অন্যরকম। কৃষ্ণের মধ্যে অর্জুন যে বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন সেটা তাই কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, কৃষ্ণের বিশ্বরূপিতার বীজ রয়েছে স্বয়ং ব্যাসের হৃদয়ের মধ্যেই।

কৃষ্ণ

কৃষ্ণ-নামের মহিমা যে কতখানি সে অনুভূতি আমার না থাকলেও পরিষ্কার জানি এই প্রাচীন নামটি যুগ-যুগান্তরের মানুষকে কত বিচিত্রভাবে আকর্ষণ করেছে। 'কৃষ্ণ' এই শব্দটি যে ধাতু থেকে নিষ্পন্ন সেই 'কৃষ্' ধাতুর মানেও নাকি আকর্ষণ করা। মানুষটির চরিত্রও বিচিত্র। প্রথম জনে যদি বলেন কৃষ্ণ সেই পুরাণ পুরুষোত্তম, তবে দ্বিতীয় জন বলবেন—তিনি কপটের চূড়ামণি। তৃতীয় মানুষের দৃষ্টিতে ভারতীয় রাজনীতির প্রথম সূত্রধার বোধহয় কৃষ্ণ। চাণক্যের আগে এমন ধুরন্ধর রাজনৈতিক নেতা আর দ্বিতীয় নেই। আবার চতুর্থ ব্যক্তি যখন কৃষ্ণের বৃন্দাবনী লাম্পট্যে বিচলিত, তখন কবি বলবেন কৃষ্ণের সেই বিশ্বমোহন লাম্পট্য তোমাকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করুক—ইত্যুক্তে ধৃতবল্লবী-কুচযুগস্ত্বং পাতু পীতাম্বরঃ। কেমন করে এমনটি হয় আমার জানা নেই। পরস্পর বিরোধী গুণের এমন সমবায় আর কোন দেবতা বা মানুষের মধ্যে দেখা যায়নি বলেই বোধহয় কৃষ্ণের আকর্ষণ এই দু হাজার বছরেও অম্লান।

সেকালের দিনে বহুরূপী সাজত, তার জন্য সাজ দরকার হত। পোশাক পাল্টাতে হত। কৃষ্ণ, যাঁকে আমরা অনেকেই ভগবান বলে জানি এবং মানি—তাঁর যে কত রূপ এবং তিনি যে কত বড় বহুরূপী—তা তাঁর রূপ বদলের সহস্র রকম-ফেরেই প্রমাণিত। কৃষ্ণকথার সর্বোত্তম গ্রন্থ ভাগবত পুরাণে কৃষ্ণের এই বহুরূপিত্ব সম্বন্ধে একটি শ্লোক আছে। কৃষ্ণ তখন দাদা বলরামের সঙ্গে কংসের দরবারে ঢুকতে যাবেন। কংসহত্যার বিধ্বংসী ক্রিয়াকলাপ তখনও বাকি আছে। ভাগবতকার বলছেন, কৃষ্ণের আগমনে—সেই সময় কংস-সভার মল্লদের কাছে যেন অশনিসঙ্কেত ভেসে এল। সাধারণ মনুষেরা মনে করল যেন সর্বকালের সেরা মানুষটি ঢুকেছে কংসের সভায়। যুবতীরা ভাবলেন বুঝি অঙ্গ ধরেই এসেছেন সাক্ষাৎ ভালবাসার দেবতা। মল্লনামশনি র্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্। এরই মধ্যে গোপ-বালকেরা কিন্তু নির্বিকার। তাদের মনে ব্যত্যয় হয়নি একটুও, তারা ভাবল তাদের সেই চিরকালের বাঁশিওয়ালাটি বুঝি এসেছেন—শুধু জায়গাটা বৃন্দাবন নয়, মথুরা। ঠিক একই ভাব ছিল দেবকী এবং বসুদেবের। বহুদিন আগে দেখা কংস কারাগারের সেই উজ্জ্বল শিশুটিও যেন নতুন করে তাঁদের বাৎসল্য জাগ্রত করে তুলল। তবে কংসের সভায় যে সব অসৎ সামন্তরাজারা ছিলেন তাঁরা কিন্তু বুঝলেন যে তাঁদের শায়েস্তা করার

মানুষটি এসে গেছেন। স্বয়ং ভোজপতি কংস, কৃষ্ণের মধ্যে দেখতে পেলেন মৃত্যুকে। কৃষ্ণকে দেখে যোগী-মুনিদের পরমতত্ত্ব লাভের অনুভূতি হল। বৃষ্ণিবংশীয়রা তাঁকে জানলেন রাজা বলে, দেবতা বলে। আর অজ্ঞ লোকেদের বড় মানুষ দেখলে যা হয়, তাই হল। তারা বুঝলে—এ মানুষ তাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে, বড় মানুষের ব্যাপার—নাক গলিয়ে লাভ নেই—

মৃত্যুর্ভোজপতের্বি রাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ।

এই শ্লোকটিতে ঈশ্বরী মায়ার কোন চিহ্ন নেই। কিংবা নেই কোন বিভূতি-প্রদর্শনের চেষ্টা। একটি মাত্র মানুষ এখানে বহুরূপীর মত। পোশাক-আশাক পাল্টানোরও কোন ব্যাপারই নেই। তবুও কেমন বহুরূপী। এর পরে অবতারতত্ত্বের আমদানি হলে, সবিশেষ ব্রহ্মের আকৃতি প্রতিষ্ঠা হলে—অর্থাৎ কিনা সত্যি সত্যি বহুরূপীর মত সাজ পাল্টালে—এ কৃষ্ণকে যে কত শত রূপে দেখা যাবে তাই এখন বিচার্য।

যাঁরা কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম পড়েছেন, তাঁরা মনে রাখবেন কৃষ্ণের প্রত্যেকটি নামের পেছনেই একটা ইতিহাস আছে। অবশ্য ইতিহাস না বলে, এগুলিকে গল্প বলাই ভাল। তবে হ্যাঁ, পণ্ডিত মানুষ যাঁরা, তাঁরা কৃষ্ণের এই অষ্টোত্তর শতনাম নিয়ে গবেষণা না করলেও কৃষ্ণ এই মানুষটি একজনই কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট চিন্তিত। অর্থাৎ যিনি 'পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ বিদুরের প্রভু', তিনিই 'গোপীকুল বস্ত্রহারী শ্রীরাসবিহারী' কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ তো রয়েই গেছে, উপরন্তু অষ্টোত্তর না হলেও মহাভারতের কৃষ্ণ, বাসুদেব কৃষ্ণ, গোপাল কৃষ্ণ—এই রকম অন্তত পাঁচ-ছ রকমের কৃষ্ণের আমদানি হয়েছে পণ্ডিতদের মানস-লোকে ; তাতে যন্ত্রণা আরও বেড়েছে। পণ্ডিতদের যন্ত্রণা উপশমের দায় যেহেতু আমার নয়, আমি তাই সরাসরি কৃষ্ণের সামগ্রিক চিত্রে আসি।

একজন জলজ্যান্ত মানুষ হিসেবে কৃষ্ণের নামটি প্রথম পাওয়া যায় ছান্দোগ্য উপনিষদে। পণ্ডিতেরা অনেকেই এই মত পোষণ করেন যে, ছান্দোগ্য উপনিষদের কৃষ্ণ হলেন ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য। কিন্তু মনে রাখা দরকার এ ধারণাটি চালু হয়েছে শঙ্করাচার্যের ভাষ্যব্যাখ্যা থেকে। তিনিই বলেছেন "কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় শিষ্যায়"। মূল উপনিষদে কিন্তু কৃষ্ণ যে ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য, তার কোন উল্লেখমাত্র নেই। সেখানে সোমযাগের রূপকে মানুষের জীবনচক্রের বর্ণনা চলছিল। এই যজ্ঞদর্শনটিই ঘোর আঙ্গিরস নামক ঋষি উপদেশ করেন কৃষ্ণকে। ছান্দোগ্য উপনিষদের মূল পঙক্তিটি এই রকম—তদ্ধৈতদ্ ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় উক্ত্বা উবাচ অপিপাস এব স বভুব। সো'ন্ত বেলায়াম্ এতৎ ত্রয়ং প্রতিপদ্যেত—অক্ষতম্ অসি, অচ্যুতম্ অসি, প্রাণ সংশিততমসীতি।[১] অঙ্গিরা গোত্রীয় ঘোর নামক ঋষি দেবকীনন্দন কৃষ্ণকে এই যজ্ঞদর্শন উপদেশ দিয়ে [পরবর্তী তিনটি মন্ত্রও] উপদেশ করেছিলেন। সেই দেবকীপুত্র কৃষ্ণ [উক্ত বিদ্যার উপদেশ শুনে অন্য বিদ্যা বিষয়ে] নিঃস্পৃহ হয়েছিলেন। ঐ বিদ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তি মৃত্যুকালে এই তিনটি মন্ত্র জপ করবেন—'অক্ষত আছ, আপন প্রকৃতি থেকে বিচ্যুত হওনি অর্থাৎ অচ্যুত আছ, প্রাণের প্রতি সূক্ষ্ম অবস্থা তৈরি হচ্ছে'।

এই পঙ্‌ক্তির মধ্যে দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য বানানো শঙ্করের পক্ষে একটু অন্যায় হয়েছে। অন্তত শ্রদ্ধেয় বিমানবিহারী মজুমদারের মতে তাই, তবে তিনিও বোধহয় একটু অন্যায় করেছেন—যখন ছান্দোগ্য উপনিষদের পরবর্তী পঙক্তিটির অর্থ ধরে বলেছেন যে, ওখানে 'অচ্যুতমসি'—এই 'অচ্যুত' শব্দে ঘোর আঙ্গিরস কৃষ্ণকেই সম্বোধন করেছেন—ঠিক যেমনটি গীতার মধ্যে অর্জুন তিন তিনবার 'অচ্যুত' বলে সম্বোধন করেছেন কৃষ্ণকে।[২] আসলে কিন্তু মূল ছান্দোগ্যের পঙক্তিতে কৃষ্ণ সম্বন্ধী কোন সম্বোধনের ব্যাপারই নেই, ঠিক যেমনটি নেই শঙ্করের বলা কোন শিষ্যত্বের ব্যাপারও। বস্তুত পুরাণে ইতিহাসে যেমনটি পাই তাতে কৃষ্ণ ছিলেন সান্দীপনি মুনির শিষ্য, আর তাঁর পারিবারিক পুরোহিত ছিলেন গর্গ। কিন্তু শঙ্করের বক্তব্যেও আমি কোন অন্যায় দেখতে পাই না, কেননা সে যুগে যে কেউ ব্রহ্মবিদ্যার মত গম্ভীর তত্ত্ব কিংবা শাস্ত্রীয় কোন শাসন উপদেশ করতেন তাঁকেই গুরু বলে মেনে নেওয়া হত এবং যিনি অনুশাসনযোগ্য তিনিই তো শিষ্য। স্বয়ং কৃষ্ণও তো তাঁর বিচিত্র জীবনকালে কত বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করেছেন। শঙ্কর হয়তো এই রকম একটা বিশদ অর্থেই কৃষ্ণকে ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য বলে প্রতিপন্ন করেছেন। তার চেয়েও বড় কথা, ছান্দোগ্য উপনিষদ রচনার সময়েই, অন্য কোন কৃষ্ণ নয় 'দেবকীর ছেলে কৃষ্ণ' এইটাই কি তাঁর সত্তা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়? ছান্দোগ্যের প্রায় সমকালীন কিংবা পূর্বেই তো তৈত্তিরীয় আরণ্যকে 'বাসুদেব' শব্দটির উল্লেখ রয়েছে নারায়ণ এবং বিষ্ণুর সমান কক্ষায়। বাসুদেব মানে বসুদেবের ছেলে।

ব্যাস্, আবার বিপদ বেধে গেল। পণ্ডিতেরা বড় আজীব জীব। জার্মান পণ্ডিত জ্যাকবি, অপেক্ষাকৃত পুরাতন তৈত্তিরীয় আরণ্যকের সূত্র ধরে মন্তব্য করে বসলেন—বৈদিক যুগ যখন প্রায় শেষ হয়ে এল তখন বসুদেবের ছেলে কৃষ্ণ অবশ্যই নারায়ণ এবং বিষ্ণুর সমকক্ষায় পুজিত হতেন; কিন্তু দেবকীর ছেলে কৃষ্ণ যেহেতু ছান্দোগ্য উপনিষদে একজন তত্ত্বজিজ্ঞাসু পণ্ডিত হিসেবেই পরিচিত, তাই তিনি পূজা পেতে শুরু করেন কিছুদিন পর থেকে। অর্থাৎ কিনা দেবকীর ছেলে কৃষ্ণের বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ ঘটতে বসুদেবের ছেলের থেকে সময় লেগেছে বেশি।[৩] পিতা বসুদেব এবং জননী দেবকীর মধ্যে এই শতাব্দীর ব্যবধান কৃষ্ণকে দেখে যেতে হয়নি ভাগ্যিস।

পাঠককুল সবিস্ময়ে লক্ষ করুন, তৈত্তিরীয় আরণ্যকে এবং ছান্দোগ্য উপনিষদে এক একবার মাত্র কৃষ্ণনাম সংকীর্তনেই পণ্ডিতদের ধারণা হয়েছে—পিতা বসুদেবের নামে পরিচিত কৃষ্ণ ছেলেটি, মাতা দেবকীর নামে পরিচিত ছেলেটির থেকে আলাদা এবং নিশ্চয়ই ভিন্ন শতাব্দীর। তাঁরা আবার Syncretism নামে এক সর্বব্যাধি বিনাশক শব্দ আমদানি করেছেন, যাতে প্রমাণ হয়ে যাবে যে মনুষ্যলোকের সমীকরণের বুদ্ধিতে দুই কৃষ্ণ এক হয়ে গেছেন। আধুনিক যুগের একজন প্রগতিশীল গবেষকের কাছে syncretism শব্দটা যে যথেষ্ট প্রয়োজনীয়—তা আমিও জানি, কিন্তু এই শব্দের কিছু অপব্যবহারও লক্ষ করার মত। পাঠক মহাশয়! ধরুন আমি ক-বাবু। আমি হয়তো প্রথম যৌবনে কিঞ্চিৎ অসংবদ্ধ স্ত্রীসঙ্গ করেছি কিন্তু বিবাহোত্তর জীবনে

আমি একেবারে একপত্নীব্রত হয়ে গেলাম। পাঠক মহাশয়! আপনি যদি গবেষক হন তাহলে একশ বছর পরেই বলতে পারবেন—যৌবনোদ্ধত ক-বাবু লোকটি আলাদা, আর একপত্নীব্রত ক-বাবুটি আসলে খ-বাবু; কেবলমাত্র মনুষ্যলোকের সমীকরণের বুদ্ধিতে দুজনেই পরে ক-বাবু বলে পরিচিত হয়েছেন, মূলে তাঁরা আলাদা মানুষ।

ঠিক এই রকমই এক সমীকরণের পদ্ধতিতে যে সাহিত্যে যে কৃষ্ণকে পাওয়া যাবে তাঁকে প্রথমে আলাদা করে ফেলা হবে অপর সাহিত্যে বর্ণিত কৃষ্ণটি থেকে। তারপর বলা হবে যে, এঁরা সবাই ছিলেন ভিন্ন ব্যক্তিত্ব, কিন্তু মনুষ্যলোকের সমীকরণের বুদ্ধিতে তাঁরা সবাই এক হয়ে গেছেন।

সত্যি কথা বলতে কি আরণ্যক কিংবা উপনিষদের সঠিক কাল নির্ণয় করা খুবই কঠিন। সাধারণ নিয়মে বেদে সংহিতার পরেই আসে ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি, তারপর আরণ্যক, তারপর উপনিষদ। কিন্তু এক্ষেত্রে সামবেদের কোন আরণ্যক নেই এবং ছান্দোগ্য উপনিষদটি সামবেদের ধারায় ব্রাহ্মণগ্রন্থের পরেই লিখিত। কিন্তু যজুর্বেদের অন্তর্গত তৈত্তিরীয় উপনিষদের আগে আছে তৈত্তিরীয় আরণ্যক। কাজেই তৈত্তিরীয় আরণ্যক যখন লেখা হচ্ছিল, তখন হয়তো ছান্দোগ্য উপনিষদ লেখা হয়ে গেছে। বিশেষত তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ভাষা এবং ছন্দ অনেক ক্ষেত্রেই ছান্দোগ্য উপনিষদের চেয়ে পুরানো বলে মানা যায় না, বরঞ্চ অবচীন। অপিচ এই আরণ্যক গ্রন্থে কৃষ্ণ বাসুদেবের নাম বিষ্ণুর সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় স্বাভাবিক কারণেই এই সিদ্ধান্তের কথা মনে আসে যে, ছান্দোগ্য উপনিষদের মানুষ কৃষ্ণ, তৈত্তিরীয় আরণ্যকের সময়ে ভগবান হয়ে গেছেন এবং সেই দিক দিয়ে তৈত্তিরীয় আরণ্যক অবশ্যই ছান্দোগ্যের চেয়ে নবীনই বটে। কিন্তু তাই বলে কোন অবস্থাতেই পিতা বসুদেবের সঙ্গে জননী দেবকীর আরণ্যক ব্যবধান তৈরী করা ঠিক নয়।

ভারত সমাজের আর এক নামকরা পণ্ডিত আর· জি· ভাণ্ডারকার আবার বললেন—এ বাসুদেব, সে বাসুদেব নয়। অর্থাৎ কিনা তৈত্তিরীয় আরণ্যকের বাসুদেব মোটেই আমাদের কৃষ্ণ বাসুদেব নয়। বাসুদেব হলেন সাত্বত-বৃষ্ণিকুলের কুলাধিদেবতা, ইনি কৃষ্ণ নন। তাঁর মতে, সেই দেবতা বাসুদেবের সঙ্গে আঙ্গিরস শিষ্য কৃষ্ণের সমীকরণ হয়েছে অনেক পরে।[৪] দুঃখের বিষয়, এই ভারতীয় পণ্ডিতকে বিরাট এক তর্কের জালে ফেলে দিলেন ইউরোপীয় কিথ সাহেব। তিনি বললেন—The seperation of Vasudeva and Krisna as two entities, it is impossible to justify.[৫] পুরাণে ইতিহাসে যে কৃষ্ণকে আমরা সহজে চিনি, তাঁকে পুরাণকর্তারা প্রায় সব সময়েই 'ভগবান সাত্বতাং পতিঃ' কিংবা 'বৃষ্ণীণাং পরদেবতা' অর্থাৎ সাত্বত-বৃষ্ণিকুলের দেবতা বলেই সহস্রবার চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, পুরাণকারদের সময়ে কৃষ্ণ সম্পূর্ণ ভগবত্তায় প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বংশ, প্রতিবংশের অনুক্রম বর্ণনা যেখানে পুরাণকারদের প্রধান উদ্দেশ্য, সেইসব জায়গায় তাঁরা নিপুণভাবে দেখিয়েছেন সত্বান্ বা বৃষ্ণি থেকে কত পুরুষ পরে নিছক মানুষের মতই কৃষ্ণের জন্ম হয়েছে। একটি বংশে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষ জন্মালে পরবর্তীকালে তিনি সেই বংশের মহাপুরুষ কিংবা দেবতাও হয়ে যান, এ তো আমরা লৌকিক জগতেও

দেখি। তা ছাড়া বসুদেবের ছেলে বাসুদেব নন এ কথা তো কোথাও বলা হয়নি, না মহাভারতে, না পুরাণে। এসব জায়গায় বাসুদেব নামে সাত্বত-বৃষ্ণিকুলের পৃথক কোন কুলদেবতারও তো উল্লেখ নেই, যা ভাণ্ডারকার বলতে চেয়েছেন। ভগবান বাসুদেবের পৃথক্ কোন বৈশিষ্ট্য যদি পুরাণকারেরা কোথাও বলেও থাকেন, তা আমাদের কৃষ্ণকেই উদ্দেশ্য করে, এবং কোন অবস্থায়ই তাঁকে অতিক্রম করে নয়।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে কৃষ্ণের উৎস নিয়ে ভান্ডারকার আর কিথের উতোর-চাপান খুব জমেছিল। ভাণ্ডারকার নন্দগোপের প্রযত্নে বেড়ে ওঠা গোপালক কৃষ্ণের কোন প্রাচীনত্বই স্বীকার করেন না। তাঁর ধারণা, আভীর জাতির লোকেরা ভারতবর্ষে এসেছিল সিরিয়া কিংবা এশিয়া মাইনর থেকে। তারা তাদের সঙ্গে বয়ে এনেছিল যীশুখ্রীষ্টের গল্প। সেইগুলিই নাকি রূপান্তরিত হয়ে কৃষ্ণকথার সূচনা হয়েছে ভারতবর্ষে। খ্রীষ্টের নামই কোমল সুরে কৃষ্ণনামের ধ্বনি বয়ে এনেছে।[৬]

তাও ভাল, এই মহাত্মা পি· জর্জির মত জুডা থেকে যাদব কিংবা জন থেকে অর্জুনের নাম টিপে টিপে বার করেননি। উইলিয়ম জোন্স, হেবার সাহেব, ফ্লুকার—এঁরা সবাই যে কত রকম করে ভারতবর্ষের চিরপরিচিত কৃষ্ণকে খ্রীষ্টের ছাঁচে ফেলবার চেষ্টা করেছেন, তা আর বলবার নয়। এসব প্রসঙ্গে তাঁদের পাণ্ডিত্য যতখানি গভীর তার চেয়েও বেশি উদ্ভট এবং কষ্টকর।

পণ্ডিতদের মধ্যে আরেক দল আছেন, যাঁরা ঐতিহাসিকতাকেই অবতারবাদের মৌল উপাদান বলে মনে করেন। জে· এন· ফারকুহার এই কথাটি স্বীকার করে নিয়েও বলেছেন যে ভারতবর্ষের রাম আর কৃষ্ণের কথা যতখানি ঐতিহাসিক তার থেকে অনেক বেশি পৌরাণিক, more mythical than hsitorical। ফারকুহার অবশ্য যীশুখ্রীষ্টকেই একমাত্র ঐতিহাসিক পুরুষ বলে মনে করেন।[৭] কিন্তু তাঁর এই উক্তি স্ববিরোধী। কেন না, তাঁর নিজেরই লেখা অন্য একখানি গ্রন্থে তিনি বলেছেন—খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতেই রাম আর কৃষ্ণ দুজনেই যুদ্ধবীর হিসেবে খ্যাতি লাভ করে গেছেন। ফারকুহার বিশ্বাস করেন মেগাস্থিনিসের সময়েই রাম আর কৃষ্ণের নামের প্রথমে ভগবানের উপাধি যোগ হয়েছে এবং খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর গোড়া থেকেই তাঁরা বিষ্ণুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে দেখা দেন।[৮]

আগে মানুষ, তারপর প্রবাদপুরুষ যুদ্ধবীর, তারপর ভগবান—অবতারবাদের এই তো ক্রমিক বিবর্তন। কিন্তু এসব কথা মূলত স্বীকার করে নিলেও ঠিক রুডল্‌ফ অটো সাহেবের মত ফারকুহারেরও ধারণা যে, ভগবদ্‌গীতার কবির মনোলোকে যীশুখ্রীষ্টের ছবি ছিল। ভগবদ্‌গীতার অনুশাসনে কর্তব্য-নিষ্ঠার যে চরম প্রকর্ষ দেখানো হয়েছে সে নাকি যীশুখ্রীষ্টের কল্পনা ছাড়া সম্ভবই নয়। একথা ঠিকই যে, যীশুখ্রীষ্ট তাঁর আপন কোটিতে যথেষ্ট মহনীয়। কিন্তু পরম মহত্ত্বের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই যে অন্য কোন ধর্মে, অন্য কোন বিশ্বাসেও থাকতে পারে সেটাও তো বোঝা দরকার। প্রথমত গীতার মধ্যে এত ভিন্নজাতীয় উপদেশ, এমন প্রকীর্ণ তত্ত্বজ্ঞান একই ব্রহ্মসূত্রে গাঁথা আছে যে গীতার শ্রোতা অর্জুনই স্বয়ং বার বার বিভ্রান্ত হয়ে কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করেছেন—তাহলে কোনটা 'শ্রেয়ঃ'

কোনটা 'জ্যায়সী', আমি কোন পথে যাব ? সেখানে একটিমাত্র বিশেষ মানুষের ছাঁচে ভগবদ্‌গীতা লিখিত হয়েছে, এ কথাটা বড় বেশি সহজ বা সহজীকরণ। দ্বিতীয়ত যদি স্বকর্মনিষ্ঠা স্বধর্মপরায়ণতা কিংবা চরম কোন কর্তব্যবোধই ভগবদ্‌গীতার প্রথম পাঠ হয় এবং সেই ধর্মকর্ম করার জন্য যে কষ্ট, যে আত্মত্যাগ অবশ্যম্ভাবী বলে মনে হয়, তাহলে তাঁর একটা জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ খুঁজতে যীশুখ্রীষ্ট পর্যন্ত দৌড়তে হবে কেন, তাঁর অনেক আগেই তো আমরা রামচন্দ্রকে পাচ্ছি। তাঁর একটা বংশ পরিচয়ও তো পুরাণে ইতিহাসে আছে। জি· পারিন্দার অবতারবাদের ব্যাপার-স্যাপার যথাযথ আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে কৃষ্ণ বড়ই সমস্যাসঙ্কুল বটে, কিন্তু রামের ঐতিহাসিকতা নিয়ে কোন সন্দেহই নেই—Rama seems clearly historical.[৯] এমন কি শুধু ঐতিহাসিকতাও নয়, অবতারের স্বভাববিধিতে যাঁরা বাইবেলীয় নৈতিকতাই (Biblical sense of morality) বড় বলে মনে করেন তাঁদের উদ্দেশ্যে পরিষ্কার বলা যায় যে রামের মত নীতিবোধ, মায়া-মমতা, বন্ধুত্ব এবং তার জন্য কষ্টস্বীকার—এসব কিছুই বাইবেলীয় নীতিবোধের চেয়ে কোন অংশে কিছু কম নয়—Rama affords more patterns of conduct in nobility, affection and long suffering.[১০]

অবতারের কথা যখন উঠল তখন একটা কথা বলতেই হবে। ঐতিহাসিকতা যদি অবতারবাদের মৌল উপাদান হয় তাহলে আমাদের দশখানি অবতারের পাঁচ/ছ'খানাই বাদ যাবে। তা যাক্। পশুস্বভাব অবতারগুলির মধ্যে ভূভার হরণ ব্যাপারটাই বড় কথা ছিল—পুরাণজ্ঞ পণ্ডিতেরা যাকে বলেছেন reordering of the cosmos. কিন্তু যেদিন থেকে পশুর সঙ্গে আধেক মানুষ এসে জুটল (পাঠক বুঝতেই পারছেন আমরা নরসিংহ অবতারের কথা বলছি) সেদিন থেকেই অবতারবাদের সঙ্গে মিশে গেছে ভক্তিবাদ, যার পরিবর্তে ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি করুণা। আবার দেখুন তিনপেয়ে বেঁটে বামন অবতার। তিনি দৈত্যরাজ বলিকে আপন ছলনায় নিগৃহীত করে দেবতাদের ইজ্জৎ রক্ষা করেছেন। আবার তিনিই দৈত্যরাজের থাকবার সুবন্দোবস্ত করেছেন পাতালে, নিজেও ছিলেন তাঁর দ্বাররক্ষী হয়ে। পরিত্রাণ, রক্ষা—এ যদি ঈশ্বরীয় স্বভাব হয়, তবে করুণাও ঈশ্বরের স্বভাব। কিন্তু তবু যেন এই বেঁটে বামনের মধ্যে একটু মানব-চরিত্রের দূষণ লাগল—সেটি হল তাঁর ছলনা, কুটিলতা—যে গুণে তিনি বলিকে প্রতিহত করেছেন এবং যা নিজমুখে স্বীকারও করেছেন। বামন অবতারের দুই-পঙ্‌ক্তি বর্ণনার মধ্যেও জয়দেবকে তাই প্রথমেই লিখতে হয়েছে ছলয়সি বিক্রমণে বলিম্ অদ্ভুতবামন'।

বামন অবতারের পরেই আছেন তিনখানি রাম এবং বুদ্ধ। বুদ্ধ অবশ্যই মানুষ এবং অবশ্যই ঐতিহাসিক। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বৌদ্ধধর্মের ঘোর বিরোধী, তবু তিনি ব্রাহ্মণদেরই করা অবতারের লিষ্টিতে স্থান পেয়েছেন। এর ওপরে আরও যন্ত্রণা হল—বৌদ্ধদের আপন দর্শনেই অবতারবাদ মূলত স্বীকৃত নয়। তবু যে তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্মে অবতার বলে স্বীকৃত, তার একটা কারণ তিনি অতি বড় মাপের মানুষ—যদিও নিন্দুকেরা বলে যে বুদ্ধকে অবতার হিসেবে স্থান দিয়ে ব্রাহ্মণেরা কৌশলে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার বন্ধ করেছিলেন। তিনখানি রামের মধ্যে পরশুরাম

দাশরথি রামের মহিমায় ঢাকা পড়ে গেছেন—তেজোভি র্গতবীর্য্যত্বাদ্ জামদগ্ন্যো জড়ীকৃতঃ (রামায়ণ ১·৭৬·১২) এবং ঠিক একই অবস্থা হয়েছে বলরামের। ভারতবিখ্যাত ছোটভাই কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকার জন্যই তিনি অবতার হয়ে গেছেন, নচেৎ বলরামকে খুব একটা কেউ পুঁছত না। কিন্তু আমাদের আসল রাম হলেন দাশরথি রাম এবং লক্ষ্য করার বিষয় হল তাঁর মধ্যে দেবতা আছেন যতখানি, মানুষ আছেন তার চেয়ে অনেক বেশি। বাস্তবিক পক্ষে বাল্মীকি রামায়ণের প্রতিজ্ঞাও ছিল তাই। একটি আদর্শ মানুষকে খুঁজে খুঁজেই বাল্মীকির শ্লোক শেষ পর্যন্ত উত্তরকাণ্ডে গিয়ে আবিষ্কার করে ফেলল ভগবানকে। রামায়ণের বালকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ড অত্যন্ত প্রামাণিকভাবেই প্রক্ষিপ্ত বলে পরিচিত এবং এর মধ্যেই যত বিষ্ণু নারায়ণের-তত্ত্ব রামের ঘাড়ে এসে পড়েছে। নইলে অযোধ্যাকাণ্ড থেকে লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত যে রামচন্দ্রকে পাই সে একটা সম্পূর্ণ মানুষ। ভূ-ভার হরণের মত অতিলৌকিক কাজ যার সূত্র ধরে বানরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব, সেতুবন্ধন এবং রাবণবধ সম্পন্ন হয়েছে, সে সবই তো অবতারবাদের কল্প অনুসারে—অধর্মের অভ্যুত্থান, ধর্মের স্থাপন, পরিত্রাণায় চ সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। কিন্তু এসব সত্ত্বেও রাম অবতারের যেটা বাড়তি পাওনা সেটা হল দোষে গুণে মিলিয়ে তার মানুষ মানুষ ভাব, যে ভাবটি শুধু দৈত্যরাক্ষসদের পক্ষশাতন করেই নিরস্ত হয় না, শুধুই পৃথিবীকে দুষ্টমুক্ত করেই তিরোহিত হয় না, আরও কিছু থেকে যায়, যা একান্তই মানুষিক। এই মানুষিকতার মধ্যেই ঐতিহাসিকতা লুকিয়ে থাকে, যেটা রাম অবতারের ব্যাপারে পারিন্দার সাহেবের মনে হয়েছে পরিষ্কার, আর কৃষ্ণের ব্যাপারে মনে হয়েছে জটিল, 'complex'। পারজিটার, আর· সি· হাজরা কিংবা হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মত পণ্ডিতেরা এই জটিলতার জাল খুলতে চেষ্টা করেছেন। প্রাচীন বংশাবলী এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস নতুন করে সাজিয়ে তাঁরা দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, আমাদের কৃষ্ণ নিতান্তই ঐতিহাসিক পুরুষ এবং একান্তই মানুষ। কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস হয়ে যাবে অসম্পূর্ণ। আর ধর্ম এবং দর্শন হয়ে যাবে নিরাশ্রয়। সাধারণের কাছে আমাদেরও তাই দায় আছে কৃষ্ণকে ইতিহাসের দৃষ্টি থেকে যতটা সম্ভব পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করার।

এ ব্যাপারে প্রথম কথা হল ছান্দোগ্য উপনিষদে ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য যে দেবকীপুত্র কৃষ্ণ তার সঙ্গে আমাদের কৃষ্ণের চরিত্র বেশ মেলে। ভগবদগীতার মধ্যে যে উপদেশগুলি ভগবান কৃষ্ণের জবানীতে দেওয়া আছে এবং ছান্দোগ্য উপনিষদে যে উপদেশগুলি কৃষ্ণ লাভ করেছেন—তার একটা তুলনামূলক আলোচনা করেছেন হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী। শ্লোক ধরে ধরে বিচার করে তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, এই দুই কৃষ্ণ একই।[১১] তবে হ্যাঁ, সময়ের অনুক্রমে এককালের আঙ্গিরস শিষ্য যেমন মাস্টার হয়ে উঠেছেন, তেমনি মানুষটা হয়ে গেছে ভগবান।

উল্লেখ্য, খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতেই মহাবৈয়াকরণ পাণিনি, বাসুদেব কৃষ্ণ এবং অর্জুনের নাম একসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। পাণিনির এই সূত্রটির গঠনই এমন যে, তাতে কৃষ্ণের পূজ্যত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না।[১২] মহাভারতে কৃষ্ণের পার্থসারথি রূপ তখনকার মানুষের মনে এমন প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল

যে রাজারা যুদ্ধে গেলে সৈন্যবাহিনীর সামনে কৃষ্ণের প্রতিমূর্তি বয়ে নিয়ে যেতেন। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর ঐতিহাসিক কার্টিয়াস জানিয়েছেন যে, ভারতের সেই স্মরণীয় সমরনায়ক পুরু যখন আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন, তখন তাঁর প্রাগ্রসর সেনাবাহিনীর সামনে ছিল কৃষ্ণের প্রতিমূর্তি।[১৩] পুরুর মনে ছিল ভগবদ্‌গীতার অভয় বাণী—যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ। তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতি র্ধ্রুবাণীতি মতি র্মম ॥ পুরু যুদ্ধে হেরেছিলেন, কিন্তু ভারতবাসী তবু ভোলেনি যে কৃষ্ণ যেখানে জয়ও সেখানে।

সময়ের অনুক্রমে আলেকজাণ্ডারের পরেই আসে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির কথা। খ্রীষ্টপূর্ব একশ পঞ্চাশ শতাব্দীতেই তিনি লিখছেন যে তাঁর সময়ে কৃষ্ণজীবনের নানা ঘটনা নিয়ে রীতিমতো নাটক বাঁধা হয়ে গেছিল। বিশেষ করে কৃষ্ণের কংসবধ তখন এতই জনপ্রিয় যে পতঞ্জলি উল্লেখ করেছেন—অভিনেতারা সব দুই ভাগে ভাগ হয়ে যেত। কংসপক্ষে যারা থাকত তারা হল, 'কালামুখ' আর কৃষ্ণপক্ষে যারা অভিনয় করত তাঁরা হল 'রক্তমুখ'। শুধু অভিনয় নয়, কৃষ্ণের কংস হত্যার কাল সম্বন্ধে পতঞ্জলি এমন একটি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন, যাতে বোঝা যায় তাঁর সময়েই এই ঘটনা ছিল সুদূর অতীতের—জঘান কংসং কিল বাসুদেবঃ। পতঞ্জলির ধারণা কৃষ্ণ শুধু ক্ষত্রিয়মাত্র নন, বাসুদেব নামটিই হল ভগবানের সংজ্ঞা—সংজ্ঞৈষা তত্রভবতঃ। আর বাসুদেবের ভক্তদের নাম ছিল বাসুদেবক।[১৪]

ইতিহাসের দৃষ্টিতে মেগাস্থিনিস পতঞ্জলির আগের মানুষ। তিনিও কৃষ্ণের কথা জানতেন এবং আরও জানতেন যে মথুরা এবং কৃষ্ণপুর, সেই যেখান দিয়ে যমুনা বয়ে গেছে সেই কৃষ্ণপুর, সেখানকার সমভূমির লোকেরা, বিশেষত শৌরসেনীরা কৃষ্ণের পূজা করত।[১৫]

সমস্ত প্রমাণ থেকেই পাণিনি, পতঞ্জলি কি মেগাস্থিনিস কার্টিয়াস সবার প্রমাণেই, এমন একটা সিদ্ধান্ত করা যায় যে, খ্রীস্টজন্মের পূর্বেই বাসুদেব কৃষ্ণ পরম ঈশ্বরে পরিণত। কাজেই তিনি যখন মহাভারতের ইতিহাস রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত ছিলেন, সে নিশ্চয়ই আরও আগের ঘটনা। ভারত-যুদ্ধের কাল নির্ণয় করা অবশ্যই খুব কঠিন। তবু বেশি কচকচির মধ্যে না গিয়ে বেশির ভাগ গবেষকের মত একত্র সংগৃহীত করে সময়ের একটা বৃহৎ পরিসর বেছে নিলে দেখব—মহাভারতের যুদ্ধ হয়েছিল পনেরোশ' খ্রীস্টপূর্বাব্দ থেকে আরম্ভ করে আটশ পঞ্চাশ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে।

যদি পুরাণগুলির মত স্বীকার করে নিই তাহলে মহাপদ্মনন্দের সিংহাসনে আরোহণের সময় থেকে পরীক্ষিতের জন্ম পর্যন্ত সময়টি ধরা হয় ১০৫০ বছর। এই ধারণা অনুযায়ী ভারতযুদ্ধ গিয়ে পড়বে সেই ১৪০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের এদিক-ওদিক। পুরাণের হিসেবগুলিকে আজকের পণ্ডিতেরা প্রায়ই গল্পগাথা বলেই উড়িয়ে দেন। আরেক দল আছেন যাঁরা পুরাণকারদের কথাবার্তা সাহেবদের অনুদৃষ্টিতে মিলিয়ে নেন। আমরা বলি, পুরাণগুলির মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্য আছে প্রচুর—এবং সেগুলি সমসাময়িক জৈন বৌদ্ধ (পালি এবং সংস্কৃত) এবং অন্যান্য ধারার সঙ্গে মিলিয়ে নিলে পুরাতত্ত্বের অনেক খবরই আমাদের নিজস্ব দৃষ্টিতেই মীমাংসিত হতে পারে, যাকে যোসেফ কিটাগাওয়া বলেছেন

'internal consistency'।[১৬] এই সমস্ত ধারার একটা সুষ্ঠু সামঞ্জস্য করে পণ্ডিতেরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে খ্রীস্টজন্মের অন্তত হাজার বছর আগে কোনও সময় কৃষ্ণ স্বদেহে বর্তমান ছিলেন। কাজেই কৃষ্ণের মধ্যে খ্রীস্টের এবং কংসের মধ্যে রাজা হেরডের ছায়া দেখে যাঁরা পুলকিত হন তাঁদের জানাই—তৈত্তিরীয় আরণ্যক কিংবা ছান্দোগ্য উপনিষদের সময়েই মহাভারতের মূল ঘটনাটি তখনকার কথক ঠাকুর সূত মাগধদের কল্যাণে, পৌরাণিক তথা ব্যাসেদের মাধ্যমে যথেষ্ট প্রচারিত হয়েছিল। মনে রাখবেন—খোদ ছান্দোগ্য উপনিষদ, যা কিনা খুব সঠিক না হলেও অন্তত খ্রীষ্টপূর্ব ৭০০/৮০০ বছর আগে লেখা, তাতে ইতিহাস পুরাণ অর্থাৎ কিনা মহাভারত পুরাণকে পঞ্চম বেদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে—'ঋগ্বেদং ভগবো'ধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্।'[১৭] কাজেই ছান্দোগ্য উপনিষদে 'দেবকীপুত্র কৃষ্ণের' নাম শুনে কিংবা তৈত্তিরীয় আরণ্যকে 'বাসুদেব' কৃষ্ণকে বিষ্ণুকক্ষায় প্রতিষ্ঠিত দেখে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। পরবর্তীকালে পঞ্চম থেকে দ্বিতীয় খ্রীস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত অজস্রবার কৃষ্ণের নামোল্লেখ পাওয়া যাবে ; তবে দুঃখ এই সর্বত্রই তিনি ভগবান হয়ে গেছেন। একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসেবে, এক সময়ের অতিমান্য পুরুষ, অথচ মানুষ হিসেবে তাঁকে যেন পাওয়াই যায় না। রাজা-রাজড়াদের প্রতিষ্ঠিত শিলালিপিগুলিও এই দেবায়নী ধারা থেকে বিচ্যুত হয়নি। শিলালিপিতে শতবার কৃষ্ণের নামোল্লেখ দেখিয়ে এই রচনাকে ভারাক্রান্ত করতে চাই না ; কেন না কৃষ্ণসম্বন্ধে প্রথম যে শিলালিপিটি আমরা পাই তাতেই তিনি উল্লিখিত হয়েছেন 'দেবদেব' মানে দেবতাদেরও দেবতা বলে। আরও মজা, কৃষ্ণসম্বন্ধীয় এই শিলালিপিগুলিরমধ্যে এখনও প্রথম বলে পরিগণিত এই লিপিটি কিন্তু কোন ভারতীয় রাজার কৃতি নয়। গ্রীসদেশের যবন রাজা আণ্ডিয়ালকিডাস হেলিওডোরাসকে, রাজা কাশীপুত্র ভগভদ্রের কাছে দূত করে পাঠিয়েছিলেন। সেই হেলিওডোরাস ভারতবর্ষে এসে ভাগবত ধর্মের প্রেমে পড়ে গেলেন, প্রেমে পড়লেন বাসুদেব কৃষ্ণেরও। যবন রাজার কাছে তিনি হলেন 'দেবদেব'।[১৮]

বাসুদেব কৃষ্ণের প্রাচীনত্বে এবং ঈশ্বরত্বে আরেকটি বড় প্রমাণ হল পঞ্চরাত্র গ্রন্থগুলি। জয়াখ্য সংহিতা, অহির্বুধ্ন্য সংহিতা—এইসব অতি পুরাতন পঞ্চরাত্র গ্রন্থগুলিতে যে ব্যূহবাদের সূচনা হয় তারও মূলে আছেন এই বাসুদেব কৃষ্ণ। ব্যূহবাদের প্রধান কথা হল, বাসুদেব কৃষ্ণই সব, তাঁর থেকেই অন্যান্য দেবতাদের শক্তিবৈচিত্র্য। পরবর্তীকালের আবেশ অবতার, বিভব অবতার, সাক্ষাৎ অবতার এবং আরও শতেক অবতারবাদের অন্যতম উৎসভূমি এই পঞ্চরাত্র গ্রন্থগুলি এবং তারও মূল এই বাসুদেব কৃষ্ণ।[১৯] কৃষ্ণের প্রতাপ দিনে দিনে এমনই বেড়ে চলছিল যে মহাভারতের নারায়ণীয়পর্বাধ্যায়ে যে নর, নারায়ণ, হরি এবং কৃষ্ণের চতুর্মূর্তি দেখতে পাই (১২·৩৩৪·৮-৯) সেগুলি একাত্ম হয়ে গেছে বাসুদেব সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধের সঙ্গে অর্থাৎ কিনা কৃষ্ণ, কৃষ্ণের বড় ভাই বলরাম, কৃষ্ণের ছেলে প্রদ্যুম্ন এবং তাঁরই নাতি অনিরুদ্ধের সঙ্গে।[২০] সত্যি কথা বলতে কি খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর মধ্যেই কৃষ্ণের জ্ঞাতি-গুষ্টি, আত্মীয়-স্বজন, ছেলে-পুলে সবাই জনমনের পূজ্য আসনে বসে গেছেন। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর

একটি শিলালিপিতে সঙ্কর্ষণ আর বাসুদেবের নাম তো সম মাহাত্ম্যে উচ্চারিত।[২১] আর খ্রীষ্টজন্মের প্রথম বছরেই অন্য একটি শিলালিপিতে তোষা নামের এক অভিজাত মহিলা শৈলদেবগৃহে পূজা-অর্চনার উদ্দেশ্যে অতিমান্য পাঁচজন বৃষ্ণিবীরদের—ভগবতাং পঞ্চবীরাণাং—অপূর্ব পাঁচটি মূর্তি স্থাপনের কথা ঘোষণা করেন। লুডার্স সাহেব জৈন গ্রন্থের সূত্র ধরে বৃষ্ণিবংশের এই পাঁচ বীর পুরুষের নামকরণ করেছেন—বলদেব, অক্রূর, অনাধৃষ্টি, সারণ এবং বিদূরথ অর্থাৎ কৃষ্ণ নয়, কৃষ্ণের গুষ্টি। এঁদের মধ্যে অক্রূর ছাড়া আর সবাই কৃষ্ণের পূর্বজ, যদিও পুরাণের বংশাবলীতে তাঁদের সবারই নাম পাওয়া যায় এবং বিদূরথ তো বেশ বিখ্যাত। অধ্যাপক জে· এন· ব্যানার্জি কিন্তু বায়ু পুরাণের প্রমাণ উল্লেখ করে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, লুডার্সের অঙ্কে ভুল আছে। বায়ু পুরাণের মতে এই পাঁচ বৃষ্ণিবীর হলেন যথাক্রমে বলরাম, কৃষ্ণ, শাম্ব, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ। এই প্রমাণই পণ্ডিতমহলে এখন গৃহীত।[২২] তার মানে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যেই শুধু কষ্ণ নয়, কৃষ্ণের ছেলে-পুলে মায় নাতি অনিরুদ্ধ পর্যন্ত পূজ্য পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

বঙ্কিম লিখেছেন—"রুক্মিণী ভিন্ন আর কোনও কৃষ্ণমহিষীর পুত্র পৌত্র কাহাকেও কোন কর্মক্ষেত্রে দেখা যায় না। রুক্মিণীবংশই রাজা হইল—আর কাহারও বংশের কেহ কোথাও রহিল না।

এই সকল কারণে আমার খুব সন্দেহ যে, কৃষ্ণের একাধিক মহিষী ছিল না।"[২৩]

বঙ্কিমের দৃষ্টি বড়ই একপেশে। মহাভারত ছাড়া অন্য কিছু তিনি মানতেই চান না। কৃষ্ণকে আদর্শ নেতা তথা একপত্নীব্রত সাজানোর জন্য তাঁর যুক্তিজালের অন্ত নেই। কিন্তু রুক্মিণীর বংশই রাজা হল অতএব রুক্মিণীই কৃষ্ণের একমাত্র পত্নী—এ কিরকম যুক্তি? আমরা যদি বলি সুভদ্রার বংশই শেষ পর্যন্ত রাজা হল, অতএব দ্রৌপদী অর্জুনের স্ত্রী ছিলেন না, চিত্রাঙ্গদা উলূপীও মিথ্যা কল্পনা, তা হলে তো বড়ই বিপদ। স্মরণীয়, বৈষ্ণবাচার্য রামানুজের গুরু যামুনাচার্য শঙ্করের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ব্রহ্মতত্ত্বের প্রস্তাবে একটি শ্লোক লিখেছিলেন। শঙ্করের বিরুদ্ধাচরণ করে তিনি বলেছিলেন—"যদি বলি, এই যে চোল দেশের রাজা, ইনিই হলেন পৃথিবীর অদ্বিতীয় সম্রাট—তাহলে বুঝতে হবে তাঁর মত রাজা আর দুটি নেই জগতে। কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে তাঁর পুত্র-পরিবার, চাকর-বাকর কেউ ছিল না—ন তু তৎপুত্র-তৎভৃত্য-কলত্রাদি নিবারণম্।"

আমরাও তাই বলি। আমরা বলি, কৃষ্ণ রুক্মিণীর স্বামী ছিলেন নিশ্চয়ই, তাই বলে কি সত্যভামা, জাম্ববতী ছিলেন না, কিংবা প্রথম যৌবনে রাধা-চন্দ্রাবলী? রাধার কথা উঠলে তো বঙ্কিমের কৃষ্ণাদর্শ ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে, রাগে রাঙা হয়ে তিনি বলে উঠবেন—আর প্রশ্ন করিও না গার্গী, তোমার মুণ্ড খসিয়া পড়িবে। বঙ্কিমের বক্তব্য :

> মনুষ্য কতটা নিজরক্ষা ও বৃত্তি সকলের বশীভূত হইয়া স্বতঃই কর্মে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু যে কর্মের দ্বারা সকল বৃত্তির সর্বাঙ্গীন স্ফূর্তি ও পরিণতি, সামঞ্জস্য ও চরিতার্থতা ঘটে তাহা দুরূহ। যাহা দুরূহ, তাহার শিক্ষা কেবল উপদেশে হয় না—আদর্শ চাই। সম্পূর্ণ ধর্মের সম্পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর

ভিন্ন আর কেহ নাই।...

অতএব যদি ঈশ্বর স্বয়ং সান্ত ও শরীরী হইয়া লোকালয়ে দর্শন দেন, তবে সেই আদর্শের আলোচনায় যথার্থ ধর্মের উন্নতি হইতে পারে। এই জন্যই ঈশ্বরাবতারের প্রয়োজন। মনুষ্য কর্ম জানে না ; কর্ম কিরূপে করিলে ধর্মে পরিণত হয় তাহা জানে না ; ঈশ্বর স্বয়ং অবতার হইলে সে শিক্ষা হইবার বেশী সম্ভাবনা, এমত স্থলে ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণা করিয়া শরীর ধারণ করিবেন, ইহার অসম্ভাবনা কি ?[২৪]

অবতারমাত্রেই জনসমক্ষে একটা বড় আদর্শ স্থাপন করবেন—এই জিনিসটা বঙ্কিমের মাথায় বড় বেশি ক্রিয়া করেছিল। অবতার হয়ে দু-চারটে রাবণ-কুম্ভকর্ণ কি কংস-শিশুপাল বধ করা তাঁর মতে 'অতি অশ্রদ্ধেয় কথা'। ঈশ্বরের অবতারের কাজ হল আদর্শ স্থাপন। আমরা বলি কি তাঁর কথাটা রামচন্দ্র সম্বন্ধে ভালই খাটে, কিন্তু কৃষ্ণের চরিত্র বড়ই জটিল। বিশেষত বঙ্কিমের কৃষ্ণ যত আদর্শবাদী নেতা কিংবা মহাভারতের 'বিসমার্ক' হন না কেন, তবু তিনিই সম্পূর্ণ কৃষ্ণ নন। এর ওপরে আছেন দার্শনিকেরা, যাদের সঙ্গে বঙ্কিমের বিবাদ হতে বাধ্য এবং সেই বিবাদে বঙ্কিমের হার এতটাই অবশ্যম্ভাবী যে তিনি জেনে বুঝে সে দিকটার ধারও মাড়াননি। দার্শনিক বলবেন—মনুষ্য অবতারের কাজ শুধু দু-চারটে রাবণ-কংস বধ হবে কেন, এমন কি তার উদ্দেশ্য জনসমক্ষে একটা বিরাট আদর্শ স্থাপনও নয়। মানুষ হয়ে জন্মাবার পেছনে ঈশ্বরের নিজেরই উদ্দেশ্য আছে, আছে স্বার্থ। এর সঙ্গে আছেন মহাকবি, তিনি ধুয়া ধরবেন—তিনি মুক্ত, তাই তাঁর লীলা বন্ধনে ; আমরা বদ্ধ, সেইজন্য আমাদের আনন্দ মুক্তিতে।[২৫] ঠিক এই কারণে তিনি রাজার রাজা হয়েও আপনিই আসেন ধরা দিতে ; সে যতখানি আমাদের জন্য ঠিক ততখানি তাঁর নিজের জন্যেও। ভারতবর্ষের সমস্ত ধর্ম যেখানে একান্তভাবেই দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত সেখানে দার্শনিকদের মূল কথাটি ছেড়ে দিলে চলে না। দার্শনিকেরা বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রাচীন পংক্তিটির দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করে বলেন—উপনিষদের সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' পুরুষ নাকি একা একা হাঁপিয়ে উঠেছিলেন, তাঁর মনে ছিল না এতটুকু আনন্দ—স বৈ নৈব রেমে, যস্মাদ্ একাকী ন রমতে—কেননা একা একা আনন্দ পাওয়া যায় না। তাই তিনি জায়া হলেন, নিজেকে এই রকম করে দ্বিধা বিভক্ত করলেন। শুধু অসুর রাক্ষস বধ নয়, শুধু আদর্শ স্থাপন নয়, আরও কিছু। জন্ম-মরণের আবর্ত তাঁকে স্পর্শ না করলেও—অজো'পি সন্ অব্যয়াত্মা—তিনি জন্ম নিলেন। সমস্ত ভূতবর্গের অধীশ্বর হয়েও—ভূতানামীশ্বরো'পি সন্—তিনি বাঁধা পড়লেন মানব জীবনের সুখ-দুঃখের মায়ায়। তাতে মানুষেরই মত কখনও তার কপালে জুটল সুখ, কখনও দুঃখ কখনও বা যন্ত্রণা। রসিক দার্শনিকেরা এই ব্যাপারগুলোকে বলেছিল 'লীলা'। শব্দটি সাধারণ নয়, কেননা এই শব্দের সাহায্যেই ঈশ্বরের মনুষ্যোচিত ক্রিয়াকলাপের ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে, অন্য কোন শব্দের দ্বারা নয়। ব্রহ্মসূত্র লিখেছে—আমাদের জগৎটিই সৃষ্টি হয়েছে ঈশ্বরের লীলাবশে—লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্। কাজেই সেই লীলাবশেই যদি তিনি তাঁর আপন সৃষ্ট খেলাঘরে কিছুদিন মনুষ্য-ব্যবহার করে আনন্দ পান, তাতে দার্শনিক খুশি হন। কিন্তু খুশি

হন না ঐতিহাসিক, তাঁরা এসব লীলা-টীলার ধার ধারেন না। আমরা বলি, তাতে ক্ষতি কিছু নেই। উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ মহাভারতে মনুষ্য থেকে যাঁর দেবায়ন ঘটেছে, ঐতিহাসিক যে তাঁকে মনুষ্য বলবেন তাতে আশ্চর্য কি ! যেমন ধরুন, যেসব পণ্ডিতেরা বাল্মীকির রামায়ণকে মূলত পাঁচ কাণ্ড বলে মনে করেন, তাঁরা রামচন্দ্রের মনুষ্যত্বেই বিশ্বাসী। ইতিহাসের দৃষ্টিতে রামায়ণ আরম্ভ হয়েছে অযোধ্যার রাজবাড়ির অন্তঃকলহ এবং সিংহাসনের অধিকার নিয়ে, শেষ হয়েছে লঙ্কাকাণ্ডে রাবণ-বিজয়ের সূত্র ধরে। কিন্তু রামচন্দ্রের যৌবনকাল, বিবাহ, আত্মত্যাগ, বনবাসের হাজারো কষ্ট এবং শেষে রাক্ষস-বিজয়—এই সব কিছুর মাধ্যমে ঐতিহাসিক যেখানে পৌঁছোতে চান তা হল রামের মনুষ্যত্ব, পারিন্দার যাকে বলেছেন—**all make up a human being.** আবার দার্শনিকও স্বরূপত রামচন্দ্রের বিষ্ণুত্ব স্বীকার করে নিয়ে যে জায়গাটায় পৌঁছতে চান, তাও কিন্তু রামের মনুষ্যত্বই। দুজনের মধ্যে মূল পার্থক্য হল—প্রথম জন প্রথম থেকেই রামকে মানুষ বলেই জানেন এবং তাঁর ধারণা—ভারতবর্ষীয় মানুষের ব্যক্তিপূজার সুযোগে বিষ্ণুর সঙ্গে রামের সমীকরণ ঘটেছে। আবার অন্যজন, মানে দার্শনিক, তাঁকে প্রথম থেকেই বিষ্ণু বলে জানেন এবং তাঁর ধারণা ঈশ্বরীয় লীলাবশে তিনি মানুষের রূপ ধারণ করেছেন মাত্র। তিনি যে মানুষের মত সমস্ত ব্যবহার—কর্ম, ধর্ম এমনকি অপকর্ম করছেন, সেও লীলাবশেই।

ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক—দুই তরফেই যখন ঈশ্বরের মনুষ্যত্ব প্রতিপাদনই কাম্য, সেখানে রামচন্দ্রের পথ ধরেই আমরা কৃষ্ণে পৌঁছতে পারি, যদিও ঐতিহাসিকতা এবং দার্শনিকতা—দুটিই ভীষণভাবে জটিল হয়ে গেছে কৃষ্ণ-জীবন এবং সামগ্রিক কৃষ্ণচরিত্র প্রসঙ্গে। প্রথম, কৃষ্ণের জীবন কথায় ব্যাসদেবের মহাভারতই একমাত্র উপাদান নয়, আরও শতেক পুরাণ কাহিনী আছে যা তাঁকে মহাভারতের একান্ত লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। দ্বিতীয়, অবতারবাদের মূল উদ্দেশ্য যাকে পুরাণজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেছেন ভূ-ভার হরণ, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন—এই উদ্দেশ্য কৃষ্ণের ব্যাপারে একেবারেই গৌণ হয়ে গেছে। এমনকি বঙ্কিমের কথামত জীবজগতের সামনে একটা বিরাট আদর্শ স্থাপনও যদি কৃষ্ণ অবতারের মূল উদ্দেশ্য হয়, তাহলেও নিতান্ত ঐতিহাসিক কারণেই দেখা যাবে যে, কৃষ্ণ একেবারেই বেদের বার।

পুরাণ এবং মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত শ্লোকপঙ্ক থেকে কৃষ্ণকে উদ্ধার করার একটা গুরু দায়িত্ব বঙ্কিম নিয়েছিলেন বটে ; কিন্তু তাঁর, একান্তভাবে তাঁরই আদর্শ কৃষ্ণের পক্ষে বিপজ্জনক শ্লোকগুলিকে সোজাসুজি প্রক্ষেপবাদের আওতায় আনার অধিকার বঙ্কিমেরও নেই, কোনও সাহেবেরও নেই। বিশেষত সেইসব শ্লোকের প্রাচীনত্বও কম নয় এবং সেগুলি কালে কালে ভারতীয় ধর্ম এবং দর্শনকেও প্রভাবিত করেছে। কাজেই সেগুলিকে সুবিধে বুঝে বাদ দিয়ে চললে সামগ্রিক কৃষ্ণচরিত্র বোঝা যেমন কঠিন হয়ে পড়বে, তেমনি অসুবিধে হবে ভারতবর্ষের দার্শনিকতার চরিত্র বুঝতে, সমাজ-ইতিহাস তো দূরের কথা। যেমন ধরুন বাল্মীকি রামায়ণের বাল এবং উত্তরকাণ্ড প্রক্ষিপ্ত বলে পরিচিত হলেও এই কাণ্ড দুটির বিভিন্ন অংশ অবলম্বন করে চতুর্থ/পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দেই কালিদাস তাঁর রঘুবংশের অনেকখানি লিখে ফেলেছেন। আবার তারও আগে দ্বিতীয়/তৃতীয়

ঘটনাকে ভাস তাঁর অভিষেক নাটক, প্রতিমা নাটক লিখেছেন রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত অংশ অবলম্বন করেই। বলতে পারেন এঁরা সব কবি। উগ্র, মধুর বিকৃত এমনকি অবস্তুও কবির মনোলোকে রসের পরিণতি লাভ করে, কাজেই প্রক্ষিপ্তবাদের নিরসনে কল্পনামুখর কবি সহায় হবেন কি করে। আমরা বলব, বঙ্কিমও ঔপন্যাসিক, তাঁর মনোলোকের সমস্তটাই জুড়ে বসে অছেন এমন এক আদর্শ কৃষ্ণ, যিনি আমাদের দৃষ্টিতে এক বৃহৎ চরিত্রের একাংশ মাত্র। যদি বলেন কৃষ্ণচরিত্রের লেখক আপাতত গবেষকের ব্যাসাসনে উপবিষ্ট, তাহলে বলব—পৃথিবীর কোন্ গবেষক আপন লক্ষ্যস্থাপনে অন্যত্র অন্ধ না হন? গবেষকের সুবিধে, তিনি পণ্ডিত, তাই অন্যের সেই যুক্তিগুলিই তিনি গ্রহণ করেন, যেগুলি তাঁর লক্ষ্যপূরণ করে। আবার আরও গভীরে যান—সেখানে দেখবেন একই বেদান্তদর্শন এবং একই উপনিষদ গ্রন্থ অবলম্বন করে শংকরাচার্য অদ্বৈতবাদী এবং রামানুজ তাঁর উল্টো— বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। আবার নিম্বার্ক, মধ্বাচার্য, বল্লভাচার্য, চৈতন্যদেব—এঁরাও একে আরেক জনের থেকে আলাদা। যুক্তি কারও কম নয়, কিন্তু এঁরা প্রত্যেকে ব্রহ্মসূত্র, উপনিষদ্ এবং পুরাণ গ্রন্থের সেই অংশগুলিই সদ্ব্যবহার করেছেন, যেগুলি তাঁদের বিশেষ লক্ষ্য পূরণে সাহায্য করে। আমরা বলি—বঙ্কিমও তাই করেছেন, তার ওপরে তাঁর সুবিধে ছিল আরেক কাঠি। তিনি যখন ১৮৯২ সালে কৃষ্ণচরিত্রের একটা যুৎসই বর্ণনা দিলেন, তখন ভারতবর্ষে সাহেবদের প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা আরম্ভ হয়ে গেছে। মুখে একটা আপাত ইংরেজ-ভাব বিরোধী সুর জিইয়ে রেখেও তিনি যা যা লিখেছেন, তা সাহেবদের লেখা হলেই মানাত ভাল। বুদ্ধ, রাম, কৃষ্ণ—এই সব প্রাচ্যচরিত্রের উৎস সন্ধানে সাহেবসুবোরা মাঝে মাঝে এমন মূলোচ্ছেদী পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেছেন যে তাতে প্রাচ্যদেশের পণ্ডিতেরাও অনেকেই বিমুগ্ধ হয়ে পড়েছেন। আমাদের ভয় হয় এইসব অসাধু প্রকোপ, এইসব মুগ্ধতা বঙ্কিমের হৃদয়েও কাজ করেনি তো? নিন্দুক গবেষকরা আজকাল বলছেন যে রেভারেণ্ড হেষ্টি, যিনি কৃষ্ণের বৃন্দাবনী লাম্পট্য নিয়ে নানা অকথা-কুকথা বলতেন, তাঁর সমুচিত জবাব দিতে গিয়েই বঙ্কিম তাঁর আদর্শ কৃষ্ণচরিত্র সমাজের সামনে উপস্থাপন করেন।[২৬] কাজেই যদি এমন একটা ভাবনা কাজ করে থাকে যে, দেখ সাহেবদের মত করে লিখলেও আদর্শ কৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহলে বলব, তার জন্য বঙ্কিমকে বড় বেশি মূল্য দিতে হয়েছে। অর্ধেক কৃষ্ণকে তিনি প্রক্ষিপ্তবাদের ছাই দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন।

বঙ্কিমের সমকালীন সমাজেই বঙ্কিমের এই একদেশদর্শিতার প্রতিবাদ হয়েছিল। শোনা যায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও জ্যেষ্ঠপুত্র মহাপণ্ডিত দ্বিজেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন—"দ্যাখো, বঙ্কিম যে রকম করে কৃষ্ণচরিত্র আলোচনা করছে, তার একটা প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক।"[২৭] দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করেছিলেন অত্যন্ত কড়া ভাষায় :

> বঙ্কিমচন্দ্র শেষাশেষি যতই গীতাভক্ত হউন না কেন তিনি অনেকদিন ধরিয়া পাকা পজিটিভিস্ট ছিলেন। পজিটিভ ফিলসফি যাহাই হউক না কেন, শুধু মানুষকে লইয়া একটা পজিটিভ রিলিজন দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিলে চলিবে কেন? রিলিজন কি অমনি গড়িয়া তুলিলেই হয়?

পজিটিভিস্ট চাহিল একজন গ্রান্ড ম্যান, মহাপুরুষ। বঙ্কিমবাবু ভাবিলেন, এই তো আমার হাতের কাছে একজন গ্রান্ড ম্যান রহিয়াছেন ; যেমন বিষয়বুদ্ধি, তেমনি পরমার্থ জ্ঞান, এইরকম চৌকস মানুষ দরকার। অতএব আমাদের দেশে পজিটিভিস্ট রিলিজন দাঁড় করাইতে হইলে শ্রীকৃষ্ণকে গ্রান্ড ম্যান করিলেই সর্বাঙ্গ সুন্দর হইবে। তবে বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণকে আর মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণকে এক করিলে চলিবে না। ফলে দাঁড়াইল বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র।[২৮]

আমরা এই কথাটা একভাবে বলেছি। বলেছি, যে বিশ্বাস বহুকাল ধরে ভারতবর্ষের ধর্ম এবং দর্শন পরিচালনা করে এসেছে তাকে প্রক্ষিপ্তবাদের ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেই চলে না। সন্ন্যাসী পণ্ডিত বিবেকানন্দ ম্যাড্রাসের এক জনসভায় বঙ্কিমকে কটাক্ষ করে বললেন :

গোপীপ্রেম দ্বারাই সগুণ ও নির্গুণ ঈশ্বরের সম্বন্ধে বিরোধের একমাত্র মীমাংসা হইয়াছে। কৃষ্ণ অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য এই গোপীপ্রেম শিক্ষা দেওয়া। এমন কি দর্শনশাস্ত্র শিরোমণি গীতা পর্যন্ত সেই অপূর্ব প্রেমোন্মত্ততার সহিত তুলনায় দাঁড়াইতে পারে না। আমাদেরই স্বজাতি এমন অনেক অশুদ্ধচিত্ত নির্বোধ আছে যাহারা গোপীপ্রেমের নাম শুনিলেই উহা অতি অপবিত্র ব্যাপার ভাবিয়া ভয়ে দশ হাত পিছাইয়া যায়।...ভারতে এখন অনেকের মধ্যে একটা চেষ্টা দেখা যায়—সেটা যেন ঘোড়ার আগে গাড়ি জোতার মত। আমাদের মধ্যে অনেকের ধারণা—কৃষ্ণ গোপীদের সহিত প্রেম করিয়াছেন, এটা সাহেবরা পছন্দ করেন না। তবে আর কি, গোপীদের যমুনার জলে ভাসাইয়া দাও। সাহেবদের অনুমোদিত না হইলে কৃষ্ণ টেকেন কি করিয়া ? কখনই টিকিতে পারেন না !...মহাভারতের দু-একটা স্থল ছাড়া—সেগুলির বড় উল্লেখযোগ্য স্থল নহে—গোপীদের প্রসঙ্গই নাই। দ্রৌপদীর স্তবের মধ্যে এবং শিশুপালের বক্তৃতায় বৃন্দাবনের কথা আছে মাত্র। এগুলি সব প্রক্ষিপ্ত। সাহেবরা যা চায় না সব উড়াইয়া দিতে হইবে। গোপীদের কথা, এমনকি কৃষ্ণের কথা পর্যন্ত প্রক্ষিপ্ত !”[২৯]

এই যথেষ্ট। এ বিষয়ে আমাদের আর কোন বক্তব্য নেই। আমরা শুধু ছোট্ট করে বলি সম্পূর্ণ কৃষ্ণকে যথাসম্ভব বর্ণনা করতে হলে তাঁর বাল্য বয়স, যৌবনটাও চাই।

২

কৃষ্ণের সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের নিরিখে যে লিপিটিকে আমার সবচেয়ে সম্পূর্ণ বলে মনে হয় সেটি হল দ্বাদশ শতাব্দীর ভোজবর্মার বেলাভ তাম্রশাসন ভোজবর্মা কৃষ্ণের সম্বন্ধে লিখেছেন, 'সো'পীহ গোপীশতকেলিকারঃ কৃষ্ণো মহাভারতসূত্রধারঃ।'[১] শ্লোকটি বড় মধুর। দুই দিকে দুটি জব্বর বিশেষণ, মধ্যখানের শব্দটি কৃষ্ণ। কৃষ্ণচরিত্রের এই দুটিই দিক। একদিকে তিনি শত

গোপীর ভালবাসার ধন—অন্যদিকে মহাভারতের মত বিশাল জীবন-নাটকের সূত্রধার হলেন তিনি। কিন্তু এই দুটি বিশেষণই পণ্ডিতদের মধ্যে বিবাদ ডেকে এনেছে। তাঁরা বলবেন শতগোপীর নায়ক যিনি, তিনি এক কৃষ্ণ। আর মহাভারতের সূত্রধার যিনি, তিনি আরেক কৃষ্ণ। তাঁদের মতে কৃষ্ণকৃত গোপীরঙ্গ—সে যে একেবারেই হাল আমলের ব্যাপার। বরঞ্চ মহাভারত গ্রন্থটার ঐতিহাসিকত্ব যেহেতু একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না, তাই ওই কৃষ্ণকে তবু খানিকটা মেনে নেওয়া যায়।

অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে মহাভারতের কিছু শ্লোক পরবর্তী কালে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। একথাও স্বীকার করি, পুরাণগুলির মধ্যেও অনেক পুরাণই বেশ অবচীন। কিন্তু সঙ্গে এও জিজ্ঞাসা করি—মহাভারতের মধ্যে যে শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত হয়েছে, সেগুলির প্রাচীনতা নির্ধারণ করার ক্ষমতা কে রাখেন? পণ্ডিতদের এক কলমের আঁচড়ে ভগবদ্‌গীতাও তো প্রক্ষিপ্ত বলে প্রমাণিত, কিন্তু সেই গীতার প্রাচীনতাও তো কম নয়। অন্যদিকে সমস্ত পুরাণগুলির প্রাচীনতা সংশয়াতীত না হলেও, এমন পুরাণও তো আছে, যা যথেষ্ট প্রাচীন। তার মধ্যেও যদি বা প্রক্ষেপ ঘটে থাকে তার প্রাচীনতা নির্ধারণ করবেন কে? স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই অনেক পুরাণের প্রামাণিকতা দু-চার কথায় উড়িয়ে দিয়েছেন। আবার যেগুলিকে প্রাচীন বলে তিনি মনে করেন, তার মধ্যেও যদি বা কোথাও আহিরিণী যুবতীর পাশে রাখাল রাজার পদধ্বনি শোনা গেছে, সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিম তাঁর বঙ্কিম দৃষ্টি দিয়ে সেই পুরাণকারকে শাসন করেছেন।—বঙ্কিমের উদ্দেশ্য ছিল কৃষ্ণকে রুক্মিণীর একান্ত নায়ক করে তোলা। মহাভারতের কতগুলি স্তরবিভাগ করে একেবারে মূলস্তরের কৃষ্ণকে জনসমক্ষে নিয়ে আসা—এও ছিল বঙ্কিমের অভীষ্ট। সন্দেহ নেই, যুক্তিতর্কের উপন্যাসে বঙ্কিম তাঁর মত করে বেশ খানিকটা সফলও হয়েছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটাও বলব যে, 'গোপীশতকেলিকার' কৃষ্ণকে তিনি যেভাবে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছেন, ব্যাপারটা অত সোজা নয়। প্রথমত তিনি বোধ হয় খেয়াল করেননি যে মহাভারতের মত বিশাল গ্রন্থে—ভীম, অর্জুন, দুর্যোধন—সবারই বালক বয়সের একটা জুৎসই বর্ণনা আছে, কিন্তু কৃষ্ণের বালকোচিত লীলাখেলার আভাসমাত্র নেই; এমনকি তাঁর জন্মকথাও মহাভারতে অবহেলিত। এই গ্রন্থে কৃষ্ণকে যেন প্রথম থেকেই পাই কূটবুদ্ধি এক নেতা হিসেবে, যে নেতার কোনকালে যে একটা বালক বয়স ছিল, তা অন্তত মহাভারত পড়ে মনে হয় না। কৃষ্ণের বাল্যকাল সম্বন্ধে মহাভারতের মত গ্রন্থের এই নীরবতা পুরাণগুলির এবং অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থের প্রামাণিকতা স্বভাবতই বাড়িয়ে তুলেছে। বিশেষত আমরা যদি প্রক্ষিপ্তবাদ আর পরদেশী প্রভাবের কথা পদে পদে তুলে ধরি, তাহলে কম্বলের লোম বাছতে বাছতে শেষ পর্যন্ত মহাভারতের মত চিরোষ্ণ কম্বলখানিই বরবাদ হয়ে যাবে; পুরাণের কথা তো বাদই দিলাম। কাজেই কৃষ্ণের সর্বাঙ্গীণ জীবনকথায় মহাভারত, পুরাণ, শিলালিপি এবং অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থগুলিও দরকারমত প্রতিপূরণ করবে।

কৃষ্ণের অলৌকিক জন্মরহস্য নিয়ে কোন বাদানুবাদ করতে চাই না, কেননা পৃথিবীতে সৌর বংশলতায় যত দেবতা বা বীর (solar Gods and heroes)

আছেন, তাঁদের অনেকেই অযোনিসম্ভব—খ্রীস্ট থেকে বুদ্ধ, অ্যাপোলো থেকে রামচন্দ্র কিংবা আর্মেনীয় কাব্যগাথার সনাসর—সবাই।[২] এমনকি এই সেদিন, চৈতন্যদেবের জন্মও দেখি জগন্নাথ মিশ্রের হৃদয় থেকে শচীর হৃদয়ে। পৃথিবীর সৌর বংশতালিকায় আরও এক আশ্চর্য মিল হল—এই সৌর বীরেরা জন্মের পরেই এমন সব বিপদ-আপদের মধ্যে দিয়ে মানুষ হন, যা তাঁদের পরবর্তী শৌর্য-বীর্যকে প্রতি তুলনায় আরও উজ্জ্বল করে তোলে। কংসের ভয়ে যেমন কৃষ্ণের জীবন বিপন্ন। হেরডের ভয়ে তেমনি খ্রীস্টের, ফারাওদের ভয়ে তেমনি মোজেসের। আবার জন্মের পরেই কৃষ্ণ যেমন গোপপল্লীতে নির্বাসিত, ভীষ্ম তেমনি পরিত্যক্ত হয়েছেন গঙ্গার কূলে, সূর্যপুত্র কর্ণ নদীতে আর মোজেস পরিত্যক্ত হয়েছেন নলখাগড়ার বনে।[৩]

জন্ম-মুহূর্তেই এই পুত্র বিসর্জন নাকি সৌর দেবতার জীবনে অত্যন্ত জরুরী, কেননা এতে জন কিংবা ভক্তমানসে যুগপৎ করুণা, ভয় এবং শেষ পর্যন্ত বিস্ময়ের সঞ্চার হয়। কাজেই সৌরশক্তিসম্পন্ন দেবতা-বীরদের অলৌকিক জন্ম নিয়ে আমরা বেশি সময় নষ্ট করব না। কৃষ্ণ কংসের কারাগারে জন্মেছেন। অত্যাচারী কংসের ভয়ে পিতা বসুদেব তাঁকে রেখে এসেছেন ঘোষপল্লীতে, বন্ধু নন্দগোপের কাছে। সৌর দেবতার ছাঁচে ঢালা শুধু এইরকমই একটা জীবন যদি হত কৃষ্ণের, তাহলে এই প্রবন্ধ লেখার প্রয়োজন পড়ত না। মুস্কিল হয়েছে বর্তমান লেখক কৃষ্ণকে ঐতিহাসিক পুরুষ বলেই মনে করে। কাজেই তাঁর বাল্যজীবন এবং যৌবনে অলৌকিকতার ভাগ যদি অনেকখানি থাকেও, তবু তাঁর বাল্য, কৈশোর কিংবা যৌবনটাও মিথ্যে নয়। বিশেষত তাঁর জীবনকালের এই অংশটুকু আভিধানিক অর্থেই বড় সফল, কাজেই আমাদের পূর্ব প্রতিজ্ঞামত কৃষ্ণচরিত্রের এই অংশটাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই মুহূর্তে অত্যাচারী কংসের কথা আমরা আলোচনা করব না, কেননা তার সময় আসবে কৃষ্ণের প্রথম যৌবনের শেষাশেষি। কৃষ্ণকে যারা শুধু রাজনৈতিক নেতা হিসেবেই চেনেন, তাঁরা জানেন, রাজনীতির ক্ষেত্রে কৃষ্ণ একা ছিলেন না। সেখানেও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ ছিল, বিরোধী পক্ষ ছিল, আর ছিল স্তুতি-নিন্দার জ্বর এবং তার জন্যে সুখ-অসুখ দুইই। এমন বড় মাপের একটা মানুষের ব্যক্তিগত জীবন এবং যৌবনও যে খুব একটা তরঙ্গহীন সাধারণ পর্যায়ের হবে, তা আমি মনে করি না। এমনকি তাঁর বাল্যকালটিও মোটেই ভাবলেশহীন নয়। ভগবত্তার জয়কার এখানে যতটুকু আছে, তার থেকে অনেক বেশি আছে মানব-শিশুর দৌরাত্মি।

না না, আমরা এখানে পালাগান করতে বসিনি কিংবা বসিনি ভাগবতপাঠের আসরে যে, নানা সুরে হরি বলে সেই লীলা গাইব। তবে যেটা না বললে নয়, তা হল যশোদা-মায়ের মমতা-মাখা গল্পগুলিও যথেষ্ট পুরানো। অন্তত ততখানিই পুরানো যতখানি বিষ্ণুপুরাণ কিংবা হরিবংশ। পণ্ডিতদের ধারণা যে কৃষ্ণ ব্রজে 'নবনীত-চৌর' বলে প্রসিদ্ধ কিংবা যাঁর দুষ্টুমি ছিল নিতান্তই অভিনব, তাঁর সমস্ত গল্পগুলিই পুরাণ রচনার বহুকাল আগে থেকেই লোকমুখে প্রচলিত ছিল, ইংরেজিতে যাকে বলে oral tradition তাই।[৪] বাস্তবিকপক্ষে একথা অবিশ্বাস করারও কোনও কারণ নেই। নইলে দেখুন, প্রায় একই সময়ে হরিবংশ-পুরাণ, ভাসের বালচরিত নাটক, এবং প্রাকৃত ভাষার কবি সাতবাহন হালের

গাহাসত্তসঈ—এগুলি সবই একযোগে অন্য মাতৃস্থানীয়া ব্রজগোপীদের মুখে দুষ্টু-কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে। এই দুষ্টুমি স্থান পেয়েছে প্রাচীন শিলালিপিগুলিতেও এবং তাও খ্রীষ্টীয় কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই। এখনকার ভেলোরে রাখা একটি শিলালিপিতে তো কৃষ্ণ পুরো কান ধরে দাঁড়িয়ে আছেন, যদিও এই শিলালিপিটি আরও পরের। শিলালিপি কোন ব্যক্তিচরিত্রের ঐতিহাসিকতার প্রমাণ কি না জানি না, কিন্তু লোকপ্রিয়তার প্রমাণ তো বটেই। আবার যে মানুষটি এত লোকপ্রিয় তিনি কি একেবারেই কল্পলোকের আকাশ থেকে উড়ে এসে শতাব্দীর মায়ের কোল জুড়ে বসলেন ? বস্তুত যশোদা যদি মিথ্যে হয়, তবে রাধাও মিথ্যে, আহিরিণী যুবতীরাও সব মিথ্যে।

সাহিত্যের মধ্যে প্রাকৃত ভাষায় লেখা সাতবাহন রাজা হালের গাহাসত্তসঈ বোধহয় প্রথম, যার মধ্যে কৃষ্ণের বাল্যকাল এবং যৌবনের তিনটি ঘটনার উল্লেখ আছে, যা প্রক্ষিপ্তবাদের আওতায় পড়ে না। খ্রীস্টপূর্ব ২৩৫ শতাব্দ থেকে আরম্ভ করে ২২৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে হালের সময় নির্ধারিত। হালের সংগৃহীত একটি শ্লোকে দেখি—যশোদা মাতৃস্নেহে উদ্বেলিত হয়ে বলছেন—কৃষ্ণ আমার এখনও দুগ্ধপোষ্য শিশু—অজ্জ বি ব্যালো দামোঅরত্তি—এই কথা শুনে কৃষ্ণের মুখের দিকে তেরচা করে তাকিয়ে ব্রজবধূরা সব মুখ লুকিয়ে হাসিছল।[৫]

সম্পূর্ণ শ্লোকটির মধ্যে কৃষ্ণের সঙ্গে ব্রজবধূদের রহস্যজনক সম্বন্ধটি যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি যশোদার বাৎসল্য—যা অন্য সব পুরাণগুলিতে সবিস্তারে বর্ণিত। কৃষ্ণ-গোপী সম্বন্ধে এ শ্লোকটি যদি সাধারণ উল্লেখমাত্র হয়, তাহলে একেবারে স্পষ্ট করে রাধার উল্লেখও পাব হালেরই গাথায়। কবি বলেছেন—কৃষ্ণ ! তুমি যখন ফুঁ দিয়ে রাধার চোখে-পড়া ধূলিকণাটি উড়িয়ে দিচ্ছিলে, তখনই অন্য ব্রজবধূদের গর্ব ধুলোয় মিশে গিয়েছিল।[৬]

পণ্ডিত আর সি হাজরা মশায় ভাগবত পুরাণকে ষষ্ঠ/সপ্তম খ্রীস্টাব্দের পরে স্থান দিয়েছেন, কিন্তু হালের এই কবিতার মর্ম উপলব্ধি করতে পারবেন তিনিই, যিনি ভাগবত পুরাণের রাসপঞ্চাধ্যায়ীতে একবারটি নজর দেবেন। রাসনৃত্যের মাঝখানে সমস্ত গোপীদের মধ্যে থেকে এক ধন্যা তরুণীকে কৃষ্ণ প্রায় কোলে করেই উঠিয়ে নিয়ে অন্যত্র চলে গেছেন। ভাগবতকার এই তরুণীর নাম বলেননি, কিন্তু সেই গোপীর ভাগ্যলিপিতে রাধার নামই শুধু আবছা করে পড়া যায়। পুরাণ বলেছে—কৃষ্ণ এক কাজে দুই কাজ করেছেন—প্রশমায় প্রসাদায়, রাধাকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে তিনি অন্য গোপীদের কৃষ্ণসম্বন্ধীয় গর্ব খর্ব করেছেন আর রাধাকে দেখিয়েছেন—আমি তোমাকেই সব থেকে বেশি ভালবাসি। হালের ভাষায় যার চোখে এককণা ধুলো পড়লেও কৃষ্ণ স্থির থাকতে পারেন না, ভাগবতকার তাকেই নিয়ে এসেছেন বিজন বনে ; কৃষ্ণ তাকে উঁচু করে ধরেছেন—সে ফুল তুলবে বলে। তাকে আপন হৃদয়ের গোপন কথাটি বলে দিয়েছেন পথ চলতে চলতে। শেষে সে বলল—আর পারছিনে গো হাঁটতে। এই কাতর অনুবন্ধে প্রেমিক কৃষ্ণ আর স্থির থাকতে পারেননি, তিনি বলেছেন—হাঁটতে হবে না তোমাকে, তুমি আমার কাঁধে উঠে পড়—এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধ আরুহ্যতামিতি।[৭]

কৃষ্ণপ্রিয়া এই সৌভাগ্যবতী রমণীটি বেশ কয়েকবার ভাগবত পুরাণের

মধুরতম শ্লোকগুলি অধিকার করেছে আর অন্য শ্লোকে ধরা পড়েছে শতগোপীর ঈর্ষা, বেদনা। ঠিক এইখানেই হালের শ্লোকটির সঙ্গে ভাগবতের শ্লোকরাজির মূল সুরে তফাত কোথায় ?

পণ্ডিতেরা যতই বলুন—মহাভারতের কৃষ্ণ আলাদা, আর রাধাহৃদয়ের অবুঝ অধিবাসীটি আলাদা—আমি বিশ্বাস করি না বা করতে চাই না। বরঞ্চ চৈতন্যদেবকে আমি অনেক বড় ঐতিহাসিক বলে মানি। তাঁর মতে মহাভারতের বাসুদেব কৃষ্ণ হলেন ঐশ্বর্যের কৃষ্ণ, আর ব্রজগোপীদের কৃষ্ণ হলেন মাধুর্যের কৃষ্ণ—দুজনে একই। তবে চৈতন্যদেব কৃষ্ণের সেই কৈশোরগন্ধী যুবক-বয়সটাকে ভালবাসেন, মথুরা-দ্বারকার রাজবেশী পরিণত পুরুষটিকে তিনি শুধু মাথায় রাখেন।[৮] যাঁরা বড় বড় রাজনৈতিক নেতা বলে আজকেও পরিচিত, তাঁদের জীবনেও কি যৌবনোচ্ছল কোন অধ্যায় থাকতে নেই ; থাকতেই পারে। তাতে নিন্দাপঙ্ক একেবারে ঘুলিয়ে উঠতে পারে বটে, কিন্তু তা অসত্য নাও হতে পারে। মহাভারতে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ হচ্ছিল, তখন দ্রৌপদী 'কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয়' বলে খুব কেঁদেছিলেন, সে ডাক কৃষ্ণের কানে পৌঁছলেও, পুনা থেকে যাঁরা মহাভারতের পরিশুদ্ধ সংস্করণ বার করেছেন, তাঁদের কানে পৌঁছোয়নি, বঙ্কিমের কানেও তা বাঁকা শুনিয়েছে। শুধু মজা হল, মহাভারতের সংস্কারকেরা বাল্যবয়সে কৃষ্ণের পূতনাবধ, কেশিবধ মেনে নিয়েছেন, গোবর্ধন-ধারণের মত অলৌকিক ঘটনাকেও প্রক্ষেপ বলেননি, কিন্তু বাদ সাধল শুধু কৃষ্ণের গোপীজনপ্রিয়তা।

পুরাণবেত্তা মানে মিথলজিস্টরা কিন্তু বলেন, পৃথিবীতে যাঁরা সৌরকক্ষের দেবতা বলে পরিচিত, তাঁরা বীরের ধর্মে যতখানি বড়, ভালবাসার ব্যাপারেও ততখানি দৃঢ়। গ্রীকদেবতা অ্যাপোলোর কথা ভাবুন, একে তিনি সৌরকোটির দেবতা, তাতে কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বড় মিল। স্বীকৃত এবং বিবাহিত প্রেমে কৃষ্ণের যেমন রুক্মিণী, গ্রীক-সূর্যের তেমনি ল্যুকোথ, কৃষ্ণ যেমন অষ্টমহিষীর নায়ক, অ্যাপোলোর তেমনি ড্যাফেন, কীরেনি, বিওবিস কি করোনিস। আর রাসলীলা ! মিউজদের সঙ্গে অ্যাপোলোর নাচা-গানা খেয়াল করুন। ভাগবতে শুকদেবের রাসস্তুতির মত হেসিয়ডের স্তুতিটিও মাথায় রাখুন—'There the long-robed Ionians gather in your honour with their...shy wives', 'the girls of Delos, hand-maidens of the Far-shooter', 'Shall I sing of you as wooer in the fields of love, how you went wooing the daughters of Azan. (Hesiod, Theogony)[৯]

একথাটা পরিষ্কার মনে রাখা দরকার যে পৃথিবীর সৌর দেবকুলের বেশিরভাগ দেবতার প্রেম এবং বীরত্ব দুইই বড় বেশি। ঋগ্‌বৈদিক দেবকল্পে যিনি সৌর দেবতা হিসেবে সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন, সেই ইন্দ্রের বীরত্বগাথায় যেমন ঋগ্‌বেদ ছেয়ে গেছে, তেমনই প্রেমিক হিসেবে তাঁর গুণপনাও কম নয় ; এমনকি পরকীয়া প্রেমেও তাঁর চরিত্র যথেষ্ট কলঙ্কিত। তার প্রমাণ আছে বেদ, ব্রাহ্মণ, রামায়ণ, মহাভারত এবং সমস্ত পুরাণগুলিতেও। আমাদের

ধারণা—ঋগ্বৈদিক বিষ্ণুর পরিত্রাতার ভূমিকা যেমন কৃষ্ণজীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে মিশে গিয়েছিল, অপর সৌর দেবতা ইন্দ্রের অসামাজিক অপপ্রেমগুলিও তেমন স্থান করে নিয়েছে কৃষ্ণের পূর্বজীবনের রঙ্গরসে। পণ্ডিতেরা জানিয়েছেন যে, ইন্দ্রপূজার সঙ্গে কৃষ্ণপূজার একধরনের বিরোধ ছিল।[১০] এই বিরোধে কৃষ্ণ শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রের ওপর জয়ী হলেও, দিন যত যাচ্ছিল, ইন্দ্রের বীরত্বসূচক গুণগুলি কৃষ্ণের শৌর্যবীর্যের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল।[১১] আবার ইন্দ্রের প্রেমিক স্বভাবটিও একাত্ম হয়ে যাচ্ছিল কৃষ্ণের সঙ্গে। ঋগ্বৈদিক ইন্দ্রের পরবর্তী সময়ে, কারও যদি বিভিন্ন রকমের, বিভিন্ন আকৃতির অসুর-দৈত্য বধের কৃতিত্ব থাকে, সে কৃষ্ণের। কেউ যদি ধর্ম এবং দর্শনের বড় প্রবক্তা বলে গণ্য হন তো সে কৃষ্ণ। ইন্দ্র বৃত্র বধ করেছিলেন, কৃষ্ণ বধ করেছেন শম্বরাসুরকে, যে বৃত্রেরই প্রতিমূর্তি বলে গণ্য। ইন্দ্র বিরাট সাপটিকে মেরে সপ্তসিন্ধুর গতি মুক্ত করলেন, কৃষ্ণও কালিয় দমন করে যমুনার জলকে করলেন পরিস্রুত, মুক্ত।[১২] কাজেই কৃষ্ণের প্রেমিক স্বভাবটিও যে উত্তরাধিকারসূত্রে এই স্বর্গস্বভাব থেকেই আসবে, এতে আশ্চর্যের কি আছে!

আশ্চর্যের বিষয় হল, বীরত্বে আর প্রেমে গ্রীকদেবতা দুই ভাগ হয়ে যান না। কিন্তু প্রেমিক-রসিক কৃষ্ণের সঙ্গে বীরকৃষ্ণকে মেলানো যায় না—এটাই আমাদের পাণ্ডিত্য। কৃষ্ণ যদি শুধু কংসের জ্যাঠতুতো বোনের ছেলে হিসেবে পরিচিত হতেন তা হলে দোষ হত না। গোয়ালাদের ঘরে মানুষ হলেও সারাজীবন তাঁর ওঠা-বসা ছিল আর্য নরপতিদের সঙ্গে; বরঞ্চ অনার্য বলে পরিচিত যাঁরা তাঁদেরই তিনি যম হয়ে উঠলেন, কিন্তু অল্পবয়সের হৃদয়ে প্রেম জন্মালে তারও তো একটা পথ চাই। বধের আগে শিশুপাল চিৎকার করে বলেছিলেন—জরাসন্ধ কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করে সম্মান খোয়াতে চাননি, কেননা কৃষ্ণ 'দাস' জাতির ছেলে—যো'নেন যুদ্ধং নেয়েষ দাসো'য়মিতি সংযুগে। শিশুপাল মহামতি ভীষ্মের মুখের ওপর বলেছিলেন—উচ্চকুলে জন্ম নিয়ে গয়লার ছেলের প্রশংসা করতে তোমার লজ্জা করে না। তুমি কি জান—জরাসন্ধ যখন ব্রাহ্মণ বলে কৃষ্ণকে পাদ্য-অর্ঘ্য জুগিয়েছিলেন, তখন শুধু নীচকুলতার জন্যই সেই পাদ্য-অর্ঘ্য কৃষ্ণ গ্রহণ করতে সাহস পায়নি।[১৩] শিশুপালের এই সব কথা শুধু গালাগালিও হতে পারে, আবার সত্যও হতে পারে এবং সত্যি কথা বলতে কি সত্যই বটে। আমাদের কথা হল, মহাভারতের মধ্যেই তাহলে গোপকৃষ্ণের সত্তা স্বীকার করা হচ্ছে, কিন্তু পণ্ডিতেরা তবু গোপীদের অস্তিত্বে সন্দিহান। আমরা বলি গোপেরা থাকলে, গোপীরাও থাকবে এবং তাদের প্রেমও যে থাকবে, তাতেই বা আশ্চর্য কি?

আমার ধারণা, শুধু কৃষ্ণ কেন, কৃষ্ণের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে এই গোপ-গোপীদের সম্পর্ক বহুদিনের। কৃষ্ণের পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে দু-চার কথা পরে বলতেই হবে, তবে একটা কথা এখনই বলা প্রয়োজন। গোপালক ব্রজবাসীরা মহারাজ কংসের রাজ্যভুক্ত ছিলেন, সে কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কৃষ্ণের পালক পিতা নন্দ, যিনি অবশ্যই রাজা বলেই পরিচিত, যদিও সামন্ত নৃপতি, কংসের করদ, তবুও তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি গোপালক। কিন্তু তাঁর সঙ্গে অভিজাত যদুবংশীয় পুরুষ বসুদেবের এত ভাব কেন? এতই ভাব যে

তিনি তাঁর কয়েকটি স্ত্রীকেই রেখে দিয়েছেন নন্দগোপের ঘরে, ছেলেরাও সেখানেই জন্মাচ্ছে। আরও একটা কথা আছে হরিবংশে, ব্রহ্মপুরাণে, যেখানে বসুদেবের অন্যান্য পুত্র-পরিবারের কথা সবিস্তারে বলা হচ্ছে, সেখানে হঠাৎ করে অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে এই দুই পুরাণই গর্গবংশীয় এক পুরুষের কথা উল্লেখ করেন। বলার ভঙ্গিটা ঠিক এইরকম—"বসুদেবের ঔরসে বৃকদেবী (বসুদেবের চৌদ্দ বউ-এর এক বৌ) মহাত্মা অনাবহকে জন্ম দিলেন। ত্রিগর্তরাজার এক মেয়ে ছিল, তার স্বামী ছিল গর্গগোত্রীয় শৈশিরায়ণ।"[১৪] তারপর এদের পুত্রজন্মের ইতিহাস।

মজা হল, বসুদেবের সঙ্গে এই গর্গগোত্রীয় শৈশিরায়ণের কোন রক্তের সম্পর্ক নেই বলে আপাতভাবে মনে হয়। কিন্তু গর্গ ছিলেন বসুদেবদের কুলপুরোহিত। হরিবংশ একবার এই শৈশিরায়ণের কথা বলেছে বটে কিন্তু অন্য দুই জায়গায় সোজাসুজি তার নাম বলেছে গার্গ্য বা গর্গ এবং বলেছে তিনি ছিলেন যাদবদের কুলপুরোহিত । তিন জায়গাতেই ছেলের নামটি কিন্তু একই আছে। কাজেই আমি আমার বক্তব্যটি এবারে পরিষ্কার করতে পারি। আমার ধারণা এই গর্গ যদুবংশেরই লোক ছিলেন। তার কারণ হরিবংশ এবং পুরাণগুলিতে যেখানে যেখানে বংশবর্ণনা আছে, সেখানে সেখানেই দেখা যাবে, এক ক্ষত্রিয় বংশের চার ছেলের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ হয়ে গেল, পাঁচজনের মধ্যে দুজন ব্রাহ্মণ হয়ে গেল। ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণ হওয়ার ঘটনা অনুসরণ করেই হোক, বা এমনি-এমনিই, ক্ষত্রিয় বংশ থেকে হঠাৎ ব্রাহ্মণ হয়ে যাওয়াটা অসম্ভব ছিল না। মৎস্যপুরাণ এঁদের বলেছে—ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ আর পারজিটার বলেছেন Ksatrian Brahmans. প্রমাণ উদ্ধৃত করে পারজিটার স্পষ্ট জানিয়েছেন—Even the brahmanical Bhagavata says plainly that Gargya (Gargas) from a ksatriya became a brahman.[১৫] যাই হোক আমার ধারণা গর্গ ছিলেন এই ধরনের ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ, নইলে বসুদেবের পুত্র-পরিবার বর্ণনার সময় তাঁর কথা আসবেই বা কেন ? এইবার আসল কথাটা বলি। এই গর্গ বা গার্গ্য বা শৈশিরায়ণের আপন স্ত্রী বা শ্যালকের ধারণা ছিল যে গর্গ ছিলেন তেজাহীন পুরুষ। ব্রহ্মপুরাণ মতে তাঁর স্ত্রী তাঁকে সন্দেহ করতেন যে গর্গের বীর্যস্খলন হত না—জিজ্ঞাসাং পৌরুষে চক্রে ন চস্কন্দে চ পৌরুষম্। ব্যাপারটা কোনও কারণে তাঁর ভাইয়ের কানে যায়। তখন সেই ভাই মানে গর্গের শ্যালক প্রকাশ্য রাজসভায় সবার সামনে এমনভাবেই বলেন যাতে মনে হবে তিনি নপুংসক—অপুমানিতি রাজনি। গর্গই বা কম কিসে, ব্রাহ্মণ হয়ে গেছেন বলে কি তাঁর কোনও ক্ষমতাই নেই। রাগে তাঁর শরীর হয়ে গেল কালো, লোহার মত। আর ক্রোধের প্রথম প্রতিক্রিয়ায় তিনি হঠাৎ এক গোপকন্যা, তার নামও আবার গোপালী, তাকে ধরে মৈথুন আরম্ভ করলেন—গোপকন্যামুপাদায় মৈথুনায় উপচক্রমে।[১৬] সেই গোপালীই গর্গের ঔরসে জন্ম দিলেন কালযবনকে। কালযবনের কথা পরে আসবে। আমার শুধু জিজ্ঞাসা, এই গর্গ বা গার্গ্য—তিনি যদুবংশীয়ই হোন কিংবা তাঁদের আচার্য গুরু—তিনি কি আর কোন মেয়েছেলে খুঁজে পেলেন না, হাতের সামনে একটি গোপকন্যাই খুঁজে পেলেন ? পুরাণকারেরা বলেছেন এই গোপকন্যাটি নাকি স্বর্গের অপ্সরা, আমি

বলি—কৃষ্ণের ভালবাসার গোপীদেরও অনেকেই বলেছে স্বর্গের অপ্সরা, কিংবা স্বর্বেশ্যা[১৭], আসলে গোপকন্যা গয়লার ঘরেরই মেয়ে।

এই ঘটনা থেকে আমার বোঝানোর জিনিস এইটুকুই যে, গোপালক আভীরজাতির সঙ্গে যদুবংশীয়দের দহরম-মহরম ছিল অনেক আগে থেকেই, কাজেই কৃষ্ণকে রাখাল-রাজা নন্দের ঘরে পালিত হতে দেখে আমাদের আশ্চর্য লাগে না। অনেক পণ্ডিতই খুব করে অঙ্ক কষে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে আভীরেরা ভারতবর্ষে ছিলেন বৈদেশিক। কিন্তু তার প্রতিবাদ করেছেন অনেকেই, এবং মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির প্রমাণে বলা যায় যে, অভীরেরা খ্রীস্টপূর্ব দেড়শ শতাব্দীতেই শূদ্রবর্ণের শাখা হিসেবে গণ্য ছিল।[১৮] এই সময়েই যারা জাতি-বর্ণের ব্যবস্থায় স্থান পেয়ে গেছেন, তারা যে ভারতবর্ষে নবাগত, তা বলা যায় না। আভীর জাতির পুরুষেরা যে পরবর্তী ভারতবর্ষের ইতিহাসেও যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিলেন, সে প্রমাণও আছে।[১৯] অন্য দিকে কুষাণ যুগের প্রথম পর্বেই মথুরার স্থাপত্যে দেখতে পাই বসুদেবের হাত থেকে কৃষ্ণ চলে গেছেন নন্দগোপের হাতে। শেষ নাগের ছত্রছায়ায় বসুদেব পার হচ্ছেন যমুনা। মথুরার এই স্থাপত্য শিল্পের সঙ্গে তো ভাগবত পুরাণের বর্ণনার কোন তফাতই নেই। তাহলে কৃষ্ণের এইসব গল্পগাথাকে একেবারে অবচীন প্রশস্তি বলে উড়িয়ে দিই কি করে? আরও একটা কথা আছে। বৌদ্ধ গ্রন্থ ঘট জাতকে দেখা যাচ্ছে বাসুদেব এবং তাঁর ভাইয়েরা সব কংসের বোন দেবগভ্‌ভার ছেলে। তাদের পালনের ভার পড়ল যাঁদের হাতে, তাঁদের একজন নাকি দেবগভ্‌ভার (মানে অবশ্যই দেবকীর) পরিচারিকা। তার নাম নন্দগোপা এবং আরেকজন তাঁর স্বামী অন্ধকবেহ্লু।[২০] ঘট জাতকের সব সংবাদই চিরন্তন ব্রাহ্মণ্য গাথাগুলির সঙ্গে মেলেনি বলে পণ্ডিতেরা অনেকেই এগুলিকে উল্টোপাল্টা বলেছেন কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসা, নন্দগোপা না হয় যশোদা, না হয় স্বামীর নামেই তিনি মিসেস নন্দ হলেন—কিন্তু এই 'অন্ধকবেহ্লু'টি কে? কৃষ্ণ তো অন্ধক-বৃষ্ণি কুলেরই বংশধর, এবং 'অন্ধকবেহ্লু' অবশ্যই অন্ধক-বৃষ্ণি শব্দেরই অমার্জিত রূপ। অন্ধক এবং বৃষ্ণি এঁরা দুজনেই যদুবংশেরই অধস্তন পুরুষ বলে পরিচিত। আমরা আগেই বলেছি—যদুবংশীয় পুরুষদের সঙ্গে গোপালকদের গভীর সম্বন্ধ ছিল। তাই ঘটজাতকের সংবাদ শুনে আমাদের মনে হয়, এ সম্বন্ধ ছিল এতটাই যে, অন্ধক-বৃষ্ণিকুলের পুরুষেরা গোপালক নন্দকে অন্ধক-বৃষ্ণিদেরই একজন বলে ভাবতেন, যার জন্য তাঁর নামই হয়ে গেছে অন্ধক-বৃষ্ণি বা অন্ধকবেহ্লু।

বসুদেব তাঁর জ্যেষ্ঠা পত্নী রোহিণীর গর্ভসম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই নন্দগোপের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। রোহিণীর গর্ভে জন্মেছিলেন বলরাম। আর কৃষ্ণকে নন্দগোপের হাতে শুধু পালন করতে দিয়ে তিনি আর নিজের ঋণ বাড়াতে চাননি। তিনি বললেন—"রৌহিণেয় বলরাম আমার বড় ছেলে, আর কৃষ্ণ তোমার ছোট ছেলে—স চ পুত্রো মম জ্যায়ান্ কনীয়াংশ্চ তবাপ্যয়ম্। তুমি এদের দুজনকেই রক্ষা কোর।"[২১] একজনের মা গর্ভবতী অবস্থায় ব্রজে এল, অন্য ছেলেটি জ্বলজ্যান্তই এল চুপিসাড়ে, এদের সম্বন্ধে কি ব্রজে কোন কথাবার্তাই হোত না? নিশ্চয়ই হোত এবং জনগণের চোখে এই ছেলে দুটির আলাদা একটা মূল্যও ছিল। যেদিন গোবর্ধন পাহাড়কে হাতে তুলে ধরে

বৃষ্টি-বন্যার হাত থেকে সমস্ত মানুষকে কৃষ্ণ রক্ষা করলেন, সেদিন বৃদ্ধ গোপেরা এবং তাদের জাতি-গুষ্ঠি কৃষ্ণকে বলল—এত অল্প বয়সেই তোমার এই শক্তি ! তুমি মানুষ নও, দেবতা ; আজকে তোমায় বলতেই হবে কি করে বসুদেব তোমার পিতা হলেন—কিমর্থঞ্চ বসুদেবঃ পিতা তব ।[২২]

বিচক্ষণেরা বলেছেন—ব্রজের লোকেরা তখনও কেউ কৃষ্ণকে বসুদেবের ছেলে বলে চিনত না । অতএব এখানে বসুদেব মানে গোপরাজ নন্দকেই বুঝতে হবে । আমাদের জিজ্ঞাসা, কৃষ্ণ নন্দের ঘরেই বড় হচ্ছিলেন । সেখানে নন্দ কেমন করে তোমার বাবা হলেন—এ প্রশ্ন বাতুলের । যদি এ প্রশ্ন তারা করেও থাকে, তবে তাদের মনে সন্দেহ আছে যে, কৃষ্ণ হয়তো নন্দের ছেলে নয় । বিশেষত জনগণ খবর রাখে বেশি । আবার বসুদেব অর্থ যদি বসুদেবই ধরি তাহলেও বুঝতে হবে সাধারণের মনে সঙ্গত প্রশ্ন আছে—তুমি পালিত হচ্ছ এখানে, অথচ তোমার বাবা আসলে বসুদেব । হয়তো পুত্র বদলের ব্যাপারটা তারা ঘোলাটে হলেও জানতেন । তাই তাদের প্রশ্ন—তোমার কাজকর্ম অলৌকিক, অথচ গয়লাদের মত ছোট ঘরে তোমার জন্ম—বলঞ্চ বাল্যে ক্রীড়া চ জন্ম চাস্মাসু গর্হিতম্ ।[২৩] জনসাধারণ আজকে সত্য কথাটা বার করে নিতে চায় ; তারা বলে—কি দরকার বাপু তোমার, কেন গোপবালকের ছদ্মবেশে আমাদের মত ছোট জাতের ঘরে আনন্দ করে বেড়াচ্ছ—কিমর্থং গোপবেশেন রমসে' স্মাসু গর্হিতম্ । লক্ষণীয়, কৃষ্ণ এই সময় নিজেকে চাপা দিতে পারলে বাঁচেন । তিনি বললেন—আপনারা আমাকে তেমন বিরাট কিছু ভেবে দূরে সরিয়ে রাখবেন না, আমি আপনাদেরই একজন—তথাহং নাবমন্তব্যঃ স্বজাতীয়ো'স্মি বান্ধবঃ । সবচেয়ে বড় কথা যদি আপনারা আমাকে নিতান্তই বন্ধু বলে মনে করনে, তবে আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করবেন না—পরিজ্ঞানেন কিং কার্য্যম্ । এ ব্যাপারে যত চুপ করে থাকবেন ততই আমার ওপর অনুগ্রহ করা হবে । আর যদি নিতান্তই আমার কথা সবিশেষ জানতে হয়, তাহলে অপেক্ষা করুন—কালঃ সংপ্রতিপাল্যতাম্—সময়ে সব জানতে পারবেন । এই কথা শুনে গোপজনেরা একেবারে মুখটি চেপে মানে মানে যে যেদিকে পারেন চলে গেলেন—বদ্ধমৌনা দিশঃ সর্বে ভেজিরে পিহিতাননাঃ ।[২৪]

আমি আগে বলেছি, অন্ধক-বৃষ্ণিরা যেহেতু গোপরাজ নন্দকে তাঁদেরই একজন বলে ভাবার চেষ্টা করতেন তেমনি কৃষ্ণ-বলরামেরও সারাজীবন আকুল চেষ্টা ছিল নিজেকে গোপজনের একজন বলে দেখাবার—স্বজাতীয়ো'স্মি বান্ধবঃ । বৃদ্ধগোপেদের মনে নানা প্রশ্ন জাগছিল, তাদের মেয়েরাও আর বাগ মানছিল না, কেননা হরিবংশে এই গোপেরা মুখ চেপে চলে যাবার পরেই রাস-নৃত্যের সময় এসেছে । আমার ব্যক্তিগত ধারণা—গোপ-গোপীরা একেবারে পুরোপুরিই কবি-কল্পনা নয় । ইতিহাসের চোখ কচলে দেখা যাবে, গোপ-গোপীরা আকাশ দিয়ে উড়ে এসে কবির মনোভূমি জুড়ে বসেননি । কবিকল্পনা—তা সে যতই লাগামছাড়া হোক না কেন, তারও একটা সামাজিক ঐতিহাসিক পটভূমিকা থাকবে, যার জন্যে কাব্যে নাটকে, শিলালিপিতে যেখানেই গোপীদয়িত কৃষ্ণকে পাই তার চরিত্র তো বদলায়নি কোথাও । এমনকি তাঁর রাজনৈতিক ছল-চাতুরির সঙ্গেও তাঁর পূর্বজীবনের প্রেম-চাতুরির মিল আছে । পণ্ডিতেরা কোমর বেঁধে

বলবেন, খ্রীস্টপূর্ব সময়ের কোন শিলালিপি যেহেতু বৃন্দাবনের রাখালরাজার কথা বলেনি, অতএব ওসব অনেক পরের কথা—কবিদের কল্পনাবিলাসে তৈরি। আমার বাতুল মনে জিজ্ঞাসা জাগে—ভারতবর্ষের পুরাতাত্ত্বিকদের কাছে খ্রীস্টের জন্ম সময়টি, কৃষ্ণ-জন্মের কাল থেকে অনেক বেশি জরুরী। কেননা যা কিছুই পুরানো, তার খবর যদি খ্রীস্টজন্মের আগে না হয়, তাহলে সেটির পৌরাণিকতা নিয়ে নানান বিবাদ হবে। বিশেষত ধরুন কোন মানুষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যদি বেশ কিছু সূত্র না থাকে এবং কোন পুরাতন সাহিত্যে যদি তাঁর উল্লেখ না পাওয়া যায়, তবে পণ্ডিতেরা বলবেন, সে মানুষের ঐতিহাসিকতাও নেই, পৌরাণিকতাও নেই। অর্থাৎ কিনা ডি এল রায় যদি ঊনবিংশ শতাব্দীতে শাজাহান কিংবা চন্দ্রগুপ্ত নাটক লেখেন তাহলে বুঝতে হবে শাজাহান তাঁর পঞ্চাশ বছর আগে জন্মেছিলেন আর চন্দ্রগুপ্তের কথা ছেড়েই দিলাম। আমি আগেও বলেছি—কোন ঐতিহাসিক পুরুষ যদি বিখ্যাত হন, তবে তাঁর কথা তাঁর সমকালে যতখানি শোনা যেতে পারে, তার থেকেও বেশি শোনা যেতে পারে পরে। সাহিত্যের বিষয়বস্তু হতে সময় লাগে আরও বেশি। তবে পাঁচ রকমের সাহিত্যে সেই মানুষটির আকার-প্রকার-স্বভাব যদি একই রকমের হয়, তবে তাঁর ঐতিহাসিকতায় সন্দেহই বা করি কি করে? রাখালিয়া কৃষ্ণের সম্বন্ধে পাথুরে কোন প্রমাণ যেহেতু খ্রীস্টপূর্বাব্দে পাই না (খ্রীস্ট জন্মের কিছু দিনের মধ্যে অবশ্য পাই), তাই সাহিত্যগুলিই হবে গোপকৃষ্ণের ঐতিহাসিক আশ্রয়।

আর একটি কথা। আমাদের প্রাচীন পুরাণকারেরা একেবারে গর্দভ ছিলেন না; গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে একটা নিয়ম-বিধি তাঁদের মত করেই তাঁরা তৈরি করেছিলেন। যে সব ঘটনা একবার সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে, সেই ঘটনাগুলিরই বিস্তৃত পুনরাবৃত্তি যে গ্রন্থরচনা-রীতির পরিপন্থী—এটা তাঁরা কথঞ্চিৎ নিশ্চয়ই জানতেন। আবার যে সব ঘটনা খুবই বিখ্যাত, সেগুলির দ্বিরাবৃত্তি করাও তাঁরা সঠিক মনে করতেন। পাঠক খেয়াল করবেন, হরিবংশের কথকঠাকুরকে গ্রন্থারম্ভেই নতুন কথা বলতে অনুরোধ করা হয়েছে। শৌনক বললেন—সৌতি মুনি! আপনি আমাদের মহাভারতের অমৃত-কথা সবিস্তারে জানিয়েছেন, জানিয়েছেন কি করে কুরুবংশের প্রতিষ্ঠা হল (পাণ্ডবেরাও এই কুরুবংশের মধ্যেই পড়েন, কেননা কুরু তাঁদেরও বহুপূর্ব পুরুষ)। কিন্তু আপনি বলেননি সেই বৃষ্ণি এবং অন্ধকদের কথা, যা অন্তত দয়া করে এখন বলতে পারেন—ন তু বৃষ্ণ্যন্ধকানাঞ্চ তদ্ ভবান্ বক্তুমর্হসি।

সত্যি কথাই তো, সারা মহাভারত জুড়ে তো শুধু পাণ্ডব আর কৌরবদের ক্রমিক প্রতিষ্ঠার কথা। কিন্তু দূরে থেকে যিনি দক্ষ বাজিকরের মত তাঁর কুহক-সুতোয় পাণ্ডব-পুত্তলিকাদের নাচাচ্ছিলেন, তাঁর নিজের মাতৃ-পিতৃবংশ অন্ধক-বৃষ্ণিদের কথা কেউ তো বলেনি। প্রতিষ্ঠিত রাজা কংস-জরাসন্ধের নিগ্রহের ব্যাপারে পাণ্ডবদের থেকে, বৃষ্ণি-অন্ধকদের অবদান অনেক বেশি। এই তো পুরাণগুলির কাজ—বংশো মন্বন্তরাণি চ—কোন পুরাণ যদি বিশেষ একটি বংশের কীর্তিকলাপ সংকীর্তন করে তো আরেক পুরাণ অন্য বংশের। মহাভারত যদি কৃষ্ণের পরিণত বয়সের ইতিহাস হয়, তো হরিবংশ হল তাঁর যৌবনোচ্ছল দিনগুলির রঙিন ইস্তাহার। ঠিক যেমন এই সেদিনও, বৃন্দাবন দাস

চৈতন্যজীবনের পূর্ব ইতিহাসটুকু ধরেছেন চৈতন্যভাগবতে আর কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিস্তার করেছেন তাঁর উত্তর জীবনকথা। হরিবংশও তেমনি মহাভারত কথার প্রতিপূরণ করেছে, কারণ প্রতিপূরণ করাই ইতিহাস পুরাণের কাজ। হতে পারে, কথকঠাকুরদের কল্পনার রঙে কৃষ্ণজীবনের অনেক কাহিনীই নতুন মাত্রা লাভ করেছে, তাই বলে কি মূল কাঠামোটাই মিথ্যে হয়ে যাবে! তা হতে পারে না এইজন্যে যে, আমরা অন্যান্য সাহিত্যকেও এ ব্যাপারে সাক্ষী মানব।

যে তথ্যটা ভীষণভাবে লক্ষ্য করার মত, সেটা হল—যে সময়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতে গোপালক কৃষ্ণের জীবন কাহিনীগুলি কবির লেখনীমুখে নিঃসৃত হয়েছে, প্রায় সেই সময়েই দক্ষিণ ভারতের কবিরাও কৃষ্ণজীবনের এই কাহিনীগুলি উল্লেখ করেছেন একই সুরে। আধুনিক এক গবেষক বহু পরিশ্রমে দক্ষিণ ভারতের মায়োনের সঙ্গে কৃষ্ণের একাত্মতার প্রমাণ করে অতি প্রাচীন চঙ্কম্ সাহিত্যে কৃষ্ণের অনুপ্রবেশটি সুন্দর করে দেখিয়েছেন।[২৫] খ্রীস্টীয় দু-এক শতাব্দীর মধ্যে লিখিত 'শিলপ্পড়িকারম্' নামে তামিল গ্রন্থটিতে দেখা যাচ্ছে মায়োন (মায়বন) এবং তাঁর স্ত্রী নপ্পিনাই—(এঁরা অবশ্যই কৃষ্ণ-রাধা)-পূজিত হতেন গোপ-গোপীদের দ্বারাই।

তামিল কবি লিখেছেন—কেমন করে মাদুরাইয়ের রমণীরা বালিয়োন, (বলরাম) মায়োন আর নপ্পিনাই-এর অনুকরণে রাসনৃত্য করতেন। নাচের সময়ে তারা গান করে বলে, কেমন করে মায়োন কিশোরী নপ্পিনাইয়ের কাপড় আর গয়না চুরি করেছিল। কেমন করে এই ঘটনায় নগ্না নপ্পিনাইয়ের মুখটি লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে।[২৬]

আমরা বুঝি, এসব সেই বস্ত্র হরণের কথা। বৃন্দাবনের মেয়েদের সঙ্গে কৃষ্ণের এই সব ব্যাপার-স্যাপার পণ্ডিতেরা বিশ্বাস করতে চান না। কিন্তু উত্তর ভারতে বৃন্দাবনের নাম-খ্যাতি বহুদিনের। স্ত্রী-পুরুষের একই রকম বেচাল দেখলে আমরাও তো বলি—'বৃন্দাবন বানিয়ে ফেলেছে'। ঠিক একই রকম করে চতুর্থ শতাব্দীতেই উজ্জয়িনীর কবি জানতেন বৃন্দাবন মানেই—মেয়েদের নিয়ে মজা করার জায়গা। কৃষ্ণের ভগবত্তা সম্পূর্ণ মাথায় রেখেও কালিদাস তাঁর স্বয়ংবরা নায়িকাকে উপদেশ দিয়েছেন—এই শূরদেশের রাজা সুষেণকেই তুমি বেছে নাও, তারপর ঠিক কুবেরের বাগানের মত সুন্দর সেই বৃন্দাবনের বনে প্রবেশ করে আপন যৌবন সফল কর—বৃন্দাবনে চৈত্ররথাদনূনে নির্বিশ্যতাং সুন্দরি যৌবনশ্রীঃ।[২৭]

আর বৃন্দাবনে গোপ-গোপীদের নাচ দেখে সেটিকে অবাস্তব কবিকল্পনা ভাবার কোন কারণ নেই। গোপ-গোপীদের খানিকটা অবলীলায় নাচার-অভ্যেস ছিল। যার জন্যে তামিল কবিতায় নাচের প্রসঙ্গে বলরামের নাম এসেছে। সাধারণে জানেন শুধু কৃষ্ণই রাধা আর হাজারো গোপীদের সঙ্গে রাসের নাচটি নেচেছিলেন কিন্তু খেয়াল করে দেখবেন বলরামেরও রাস আছে কোন কোন পুরাণে।[২৮] আবার একটা জিনিস দেখুন, এই নাচগুলি হয়েছে এমন অবলীলায় যে তার আগে পরে দু-একটা রাক্ষস কিংবা অসুরবধও হয়ে যাচ্ছে। জয়বল্লভের বজ্জালগ্নে দেখা যাচ্ছে রাধা খুব গর্বিত, কেননা কৃষ্ণের যে হাতখানি রাধার বক্ষবন্ধনী রাঙিয়ে দিয়েছে, সে হাতে লেগে ছিল কেশী দানবের রক্ত।

বজ্জালগ্নের কথা রেখে দিন, হরিবংশে কি বিষ্ণুপুরাণে যে রাত্রে বিখ্যাত সেই রাসনৃত্য হচ্ছিল সেই নাচা-গানার মাঝখানেই এসে পড়েছে অরিষ্টাসুর বা বৃষভাসুর। কিন্তু সেই অসুরটিকে মেরে কৃষ্ণ কিন্তু আবার ফিরে এসেছেন তাঁর অবশিষ্ট নাচটি নাচবার জন্য।[২৯] এ নাচটা গোপ-গোপীর সমাজে ছিল এতটাই সহজ, এতটাই স্বাভাবিক।

হালের আর একটি শ্লোকে তো কৃষ্ণের রাসনৃত্যেরই কথাই প্রায় উল্লিখিত। কোন নিপুণা গোপী কৃষ্ণের নৃত্যপ্রশংসার ছলা করে অন্য গোপীর স্বেদচিক্কন কপোলে প্রতিবিম্বিত কৃষ্ণকে চুম্বন করছিলেন।[৩০]

এই নৃত্যকে রাস বলে অভিহিত করুন বা অন্য কোন নামে গোপীসঙ্গে কৃষ্ণের নৃত্যবিলাস কিছু না কিছু যে হয়েই ছিল তার প্রমাণ আছে ভাসের নাটকেও, যে নাটকটি কোনক্রমেই দ্বিতীয়/তৃতীয় খ্রীস্টাব্দের পরে যাবে না। ভাসের এই বালচরিত নাটকের মধ্যে কৃষ্ণের বাল্যজীবনের অনেক ঘটনাই বিধৃত, এবং অনেকেই মনে করেন যে, এই নাটক রচিত হয়েছে হরিবংশের পটভূমিকায়। তা হতেই পারে, ভারতীয় সাহেবরা কিছু নাই বলুন, ইন্‌গলস্‌ সাহেব কিন্তু বলেছেন—হরিবংশে আমরা যেন এক নতুন জগতে প্রবেশ করি, কৃষ্ণকাহিনীর এই রূপ যেন সাধারণে প্রচলিত লোকগাথার অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে ; এ যেন সেই চিরন্তনী বাধা-শুদ্ধতা থেকে অনেক মুক্ত, পরবর্তী পুরাণগুলির ব্রাহ্মণ্য গোঁড়ামি যেন হরিবংশের কৃষ্ণকাহিনীকে একটুও লাঞ্ছিত করেনি। এখানে আমরা প্রবেশ করি রাখালিয়ার বাঁশির ছন্দে বাঁধা এমন এক জগতে, যেখানে কেউ শহুরে ভদ্রতা পছন্দ করে না। এমনকি এদের স্বর্গলোকও কোন অভিজাতের ক্রীড়াভূমি নয়, সেখানে আছে শুধু গরু আর রাখালবালকেরা।[৩১] এমন একটা অনাবিল ধূসর জগতের অধিবাসী যারা, তাদের ন্যায়নীতিবোধের সঙ্গে চিরন্তন ব্রাহ্মণ্য নীতিবোধ যে মিলবে না তাতে আর আশ্চর্য কি ? কাজেই কোন শারদ রাত্রিতে শত অভিসারিকারা এসে যদি নেচে থাকে রাখালবঁধুর সঙ্গে তাতে দোষ দেখি না কোনও। নাট্যকার হিসবে ভাস তো আরও বিশ্বাসযোগ্য চিত্র এঁকেছেন। সেখানে এক গয়লাবুড়োর তত্ত্বাবধানে কৃষ্ণের নাচা-গানার আরম্ভ এবং আধুনিক পল্লীবাসী বুড়ো মুখিয়ার সঙ্গে সে গয়লা-বুড়োর কোন তফাত নেই। ভাসের নাটকে দামক নামে এক রাখাল ছেলে বৃদ্ধ-গোপালকের কাছে জানাচ্ছে—

ও খুড়ো, আজ যে আমাদের দামোদর কৃষ্ণ আসছেন এই বৃন্দাবনে ; সে হল্লীসক নাচবে সব গোপ-বালিকাদের সঙ্গে।

বুড়ো বললে—তা বেশ তো ! তাহলে আমরা সবাই মিলে সেই হল্লীসক দেখব।

নাচের নামে গয়লাবুড়ো ভাঙা গলায় এক গানই আরম্ভ করে দিল, আর গলা ছেড়ে ডাকতে লাগল বাছা বাছা সুন্দরী সব গোপরমণীদের—ও ঘোষসুন্দরী, ও বনমালা, চন্দ্ররেখা, মৃগাক্ষি তাড়াতাড়ি এস সব। বাদ্যি-বাজনা নিয়ে এস সব—আন মৃদঙ্গ মুরজ মুরলী মধুরা।

একটু পরেই গয়লা বুড়ো জানাচ্ছে—শোন হে ছুকরিরা সব ! সিংহ যেমন বেরিয়ে আসে পাহাড়ের গর্ত থেকে, তেমনি ধেয়ে আসছেন আমাদের দামোদর,

তাঁর সঙ্গে আছেন সঙ্কর্ষণ বলরাম। দামক ছেলেটির বয়স বুঝি কম ; সে কৃষ্ণের অবর্তমানে কিংবা হয়তো নাট্যশৈলীর অনুরোধ বনফুলের শোভায় সুবেশা ঘোষরমণীদের একটা দশাসই রূপবর্ণনা দিয়ে দিল। বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে বলরামও জানালেন যে, গোপবালকেরাও সব তাদের বেসুক আর ডিণ্ডিমের বাদ্যি নিয়ে এসে গেছে। গোপবৃদ্ধের কাছে তাঁর আকুল জিজ্ঞাসা—মেয়েগুলা সব এসেছে তো! সবাই এসে গেছে, স্বয়ং দামোদরও এসে গেছেন। এবারে তিনিই ঘোষপল্লীর সেরা মেয়েটিকে বললেন—ঘোষসুন্দরী! রাখালিয়াদের পক্ষে যোগ্য নাচ হল এই হল্লীসক। বলরাম বললেন—ওরে বাজা বাজা, ওরে দামক, ওরে মেঘনাদ, বাদ্যি বাজা, বাদ্যি বাজা। নাচ আরম্ভ হল।

বুড়ো গয়লা আর থাকতে পারল না, সে বললে—আপনারা সব নাচছেন, আমি বুড়ো আমি কি করি ? দামোদর কৃষ্ণ বললেন—কেন, তুমি নাচ দেখ। শেষ পর্যন্ত সেও আর লোভ সম্বরণ করতে পারল না, সেও নাচতে শুরু করে দিল বিকট তালে ধুলো উড়িয়ে।[৩২]

এই তো স্বাভাবিক, পাড়ার যত ছেলেমেয়ে এবং বুড়ো সবাই জ্যোৎস্নারাতের নেশায় নাচতে এসেছে। পরের যুগের পুরাণকর্তারা রাসক্ষেত্রে কৃষ্ণ ছাড়া দ্বিতীয় কোন পুরুষের প্রবেশ অনুমোদন করেননি। বিরাট এক মুক্ত উপভোগের রাজ্যে শত শত সুন্দরী যুবতীদের সঙ্গে কৃষ্ণকে একেবারে একা ছেড়ে দিয়েছেন পুরাণকর্তারা। দৃষ্টিভঙ্গি এবং বর্ণনার ক্ষেত্রে হরিবংশের বর্ণনা যতটুকু বিশ্বাসযোগ্য, ব্রহ্ম কিংবা বিষ্ণুপুরাণই ততটা নয়, কেননা আতিশয্য এসে গেছে বর্ণনায়। আর ভাগবত পুরাণকার কৃষ্ণলীলার প্রত্যেক ঘটনার সঙ্গে এমন মধুর কবিত্ব মিশিয়েছেন যা রাস-পঞ্চাধ্যায়ে এসে একেবারে চরমে উঠেছে—সে কবিত্ব সাধারণ মানুষ, সচ্চরিত্র এবং দুশ্চরিত্র সকলকেই এমন এক রসলোকে পৌঁছে দেয়, যেখানে ঘটনা কিংবা তথ্য সম্বন্ধে বিশ্বাস কিংবা অবিশ্বাসের প্রশ্ন আসে না।

পুনরুক্তি করছি। হরিবংশে যেখানে ইন্দ্রযজ্ঞ স্তম্ভিত হল এবং ইন্দ্র এসে স্তুতিবাদ আরম্ভ করলেন, তখন গোপেরা সব কৃষ্ণকে বলল—আপনি মানুষ নন, দেবতা। কৃষ্ণ বললেন—আপনারা আমাকে বিরাট পরাক্রমী পুরুষটি মনে করে দূরে সরিয়ে রাখবেন না। আসলে আমি আপনাদের একজন, আপনাদের বন্ধু—মন্যন্তে মাং যথা সর্বে ভবন্তো ভীমবিক্রমম্। তথাহং নাবমন্তব্যঃ স্বজাতীয়ো'স্মি বান্ধবঃ। কৃষ্ণের এই সহজ ভাবটা হরিবংশে সত্যিই তবু খানিকটা আছে, যা অন্য পুরাণে নেই। হরিবংশে দেখি, যে শারদ পূর্ণিমা নিশিতে ব্রজগোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের রাসক্রীড়া হয়েছিল, সে রাত্রিতেও ব্রজের পথঘাটের অঙ্গরাগ ছিল করীষ, মানে গোবরের ছড়া। বিষ্ণুপুরাণে কিংবা ভাগবতে বৃন্দাবনের রাস্তাঘাট কিন্তু ঝকঝক করছে। পরিবেশটা যেমন পরিচ্ছন্ন, তেমনি একটু কৃত্রিমও বটে, এবং এর বেশির ভাগটাই কবিদের পরিসর।

আর একটা কথা উল্লেখ না করে পারছি না। সেটা হল, যে যতই বলুন না কেন যে, ভাসের বালচরিত নাটকখানি হরিবংশের পটভূমিকায় রচিত, নাটকটি আদ্যন্ত নিপুণভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে এ নাটকের উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে লোকস্তরে প্রচলিত কথা পরম্পরা থেকে, যাকে আমরা ইংরেজিতে oral tradition বলি। নাটকের প্রায় প্রথম থেকেই একটা প্রধান চরিত্র সেই বুড়ো

গয়লা। কৃষ্ণজীবনের অনেক কাহিনীই এখানে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই বুড়ো গয়লার মুখে এবং প্রায় সব কাহিনীই সে এমনভাবে 'রিপোর্ট' করছে যেন সে, এসব কাহিনী লোকমুখে বারবার শুনেছে। নাট্যরীতি অনুযায়ী, যে নাট্যরীতি অন্তত কালিদাসের থেকেও ভাসের ভাল জানা ছিল, একটি চরিত্রের মুখে একঘণ্টা ধরে বকবকানি বক্তৃতা রুচিসম্মত হয় না। অথচ সেই সূক্ষ্ম নাট্যবোধের বিরুদ্ধ কাজটিই ভাস করেছেন—এই বৃদ্ধ গয়লার মুখে অনেকক্ষণ ধরে একের পর উক্তি বসিয়ে। সেই উক্তিগুলি কিরকম—না, এক মাস বয়সেই নন্দগোপের ছেলে এই করেছেন, দশ মাস বয়সেই আবার এই করেছে, এইরকম করে শকটভঞ্জন, পূতনাবধ থেকে আরম্ভ করে গোপাল কৃষ্ণের সমস্ত বীরত্ব গাথাই সংবাদের মত পরিবেশিত হয়েছে এই বুড়ো গয়লার জবানিতে। গয়লা-বুড়ো আরেকটা দামী কথা বলেছে, যখন সে দুষ্টু কৃষ্ণের বালচাপল্যের প্রসঙ্গে দামবন্ধনের কথা বলেছে। সমস্ত গোপমাতারা উত্যক্ত হয়ে যশোদার কাছে যখন কৃষ্ণের নামে নালিশ জানাল, তখন মা তাঁকে দড়ি দিয়ে উলূখলে বেঁধে রেখে শাস্তি দিলেন। কৃষ্ণ উলূখল সমেত গিয়ে পড়লেন জোড়া-অর্জুন গাছের ওপর। এরা দুজনেই ছিল দানো, কৃষ্ণের চাপে দুজনেই মারা গেল।

ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ কিংবা ভাগবতপুরাণ—সবাই সমস্বরে বলেছে—এই যমলার্জুন আসলে হল কুবেরের দুই ছেলে নলকূবর আর মণিগ্রীব। কামমোহিত এই দুই কুবেরপুত্র নারদের শাপে বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল। ভাসের, বালচরিতে গয়লা-বুড়োর সংবাদে আমরা এসব পূর্বজন্মের কথা কিছুই জানতে পারি না, এবং তাতে বুঝি যমলার্জুন-ভঙ্গ নিয়ে সবচেয়ে পুরানো ধারণাটিই—যেমন যেমন লোকমুখে চলেছে, তেমনটিই বসানো আছে বুড়ো গয়লার মুখে। এই শাপ-টাপের কথা হরিবংশেও কিছু নেই, বরঞ্চ সে আর একটি গূঢ় কথা বলেছে, যেটা আজকের মিথলজিস্টদের কাছে খুবই প্রয়োজনীয়। যখন দুটি বৃক্ষই ভূপাতিত হল, তখন অন্য গোপরমণীরা সব চিৎকার করে যশোদাকে ডেকে বললেন—শিগগির এস গো মা যশোদা, যে গাছ দুটোকে আমরা পুজো করতাম, যাদের কাছে মানসিক করতাম—যৌ তাবর্জুনৌ বৃক্ষৌ তু ব্রজে সত্যোপযাচনৌ—সেই গাছদুটো ভেঙে পড়ে গেছে, তবে তোমার ছেলেটি বেঁচে গেছে। এর পরেও দেখি গোপবৃদ্ধেরা বলাবলি করছে যে, গাছ দুটি ছিল দেবতার মন্দিরের মত—ঘোষস্যায়তনোপমৌ।[৩৩] আধুনিক পুরাণবেত্তারা বলেন প্রাচীন এবং আদিম বৃক্ষপূজা হঠিয়ে দিয়ে এইভাবেই কৃষ্ণপূজা চালু হয়েছিল, যেমনটি হয়েছিল ইন্দ্রপূজার পরিবর্তে, কিংবা কালিয় নাগকে সমুদ্রে পাঠিয়ে নাগপূজার পরিবর্তে।

ভাস যে তাঁর নাটকের উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন একেবারে লোকস্তর থেকেই সেটা আরও বুঝি এইজন্যে যে, এই অর্জুন বৃক্ষ দুটির দিকে তাঁর একটুও নজর ছিল না। তাঁর বেশি চিন্তা ছিল—এই দুর্ঘটনার মাধ্যমে কৃষ্ণের দামোদর নামটি কি করে চালু হয়ে গেল, সেইটি। দাম মানে রজ্জু। উদরে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছিল বলেই তিনি দামোদর। বুড়ো গয়লা ভারী নাটকীয় কায়দায় বলেছে—যারা নাকি কৃষ্ণের নামে নালিশ করেছিল, তারাই এখন আদর করে ডাকতে আরম্ভ করল দামোদর বলে।[৩৪] কৃষ্ণের দামোদর নামটি ভারী পুরানো

এবং ভাসের নাটকের সমস্তটা জুড়েই এই দামোদরের ক্রিয়াকলাপ। এমনকি তৃতীয় অঙ্কে যখন তিনি গোপীসঙ্গে হল্লীসক নেচে বেড়াচ্ছেন তখনও তিনি 'ভর্ত্তৃ দামোদর'। হরিবংশেও কৃষ্ণ যখন গোপরমণীদের জ্যোৎস্নাভিসারে বনে নিয়ে গেলেন, তখনও তারা অব্যক্ত মধুর স্বরে যে নামে ধীরে ধীরে ডেকেছিল, তা হল দামোদর—নাম দামোদরেত্যেবং গোপকন্যাস্তদাব্রুবন্। মজা হল পরবর্তী পুরাণগুলোর মধ্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এক অতি পরিশীলিত নাগরিক বোধ কাজ করল। যে নামের মধ্যে যশোদার রজ্জুবন্ধনের দাগ রয়েছে, সেই নামটিকে পরবর্তী পুরাণকর্তারা আর প্রেমিক কৃষ্ণের সঙ্গে মেলাতে পারলেন না। পেটুক দামুর কথা তাঁরা জানতেন কিনা জানি না, তবে রাসরসিক কৃষ্ণকে দামোদর নামে ডাকতে তাঁদের কুণ্ঠা হয়েছে ; অথচ হরিবংশে এই দামোদর নামক লোকটির সঙ্গেই ব্রজরমণীরা সব কি সুখেই কাল কাটিয়েছেন—ব্রজং গতাঃ সুখং চেরুর্দামোদর-পরায়ণাঃ। এই দামোদরের সঙ্গে নাচতে গেলে গোপীদের প্রসাধন লাগে শুধু গোবরের গুঁড়ো, কিন্তু বিষ্ণু পুরাণে কিংবা ভাগবত পুরাণে কৃষ্ণের নামে যেমন মধুকরী কল্পনার ছোঁয়া, গোপীদের প্রসাধনেও তেমনি কুমকুম, চন্দনের ছড়াছড়ি—যতখানি আহিরিণী, তার থেকেও বেশি নাগরিকা।

প্রিনজ্ আর হেলার সাহেব বালচরিতের ওপর ভাল কিছু কাজ করেছেন। তাঁদের ধারণা ভাসের বালচরিতে বুড়ো গয়লার মুখে যে প্রাকৃতভাষা বসানো আছে তা হল আভীরীদের ভাষা, যাকে তাঁরা মাতৃভাষায় বলেছেন : **Hirten dialekt (herdsmen's dialect)**। ভাস এই ভাষা আবারও ব্যবহার করেছেন তাঁর পঞ্চরাত্র নাটকে এবং তাও গয়লাদের মুখেই।[৩৫] গবেষকেরা সন্দেহ করেন—ভাসের লেখা এই আভীরী ভাষা ভরতের নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত আভীরী ভাষার সমগোত্রীয় নয় তো ? আমরা এত কিছু বুঝি না, যা বুঝি, তা হল আভীরীদের মধ্যে ছেলে এবং মেয়েরা একসঙ্গে নাচাগানা করত মাঝে মাঝেই, এবং তাদের মধ্যে বিবাহিতা রমণীরাও থাকতেন। কৃষ্ণের বাল্যকালটা যেহেতু আভীর আর আহিরিণীদের সঙ্গেই কেটেছে তাই নিঃসন্দহে বলতে পারি, একটা ঐতিহাসিক নাচের সাক্ষী তিনি অবশ্যই ছিলেন এবং তাতে পরবধূরাও অংশ নিয়েছিল, যদিও ভাস স্পষ্টত স্বকণ্ঠে তা বলেননি। মনে রাখবেন, ভাসের নাটকে এই নাচের নাম হল্লীসক, যাকে একটা 'গ্রুপ-ডান্স' অবশ্যই বলা যেতে পারে : কিন্তু হরিবংশকার এই নাম ব্যবহার করেননি এবং তিনি কিন্তু রাস শব্দটিও ব্যবহার করেননি। রাস কথাটি প্রথম ব্যবহৃত হয়েছে ব্রহ্ম পুরাণে, বিষ্ণু পুরাণে এবং অন্যান্য পরবর্তী পুরাণগুলিতে তো বটেই। গবেষকেরা সন্দেহ করেন যে, পুরাণকারেরা তাঁদের সমসাময়িক সমাজ থেকে 'রাস' শব্দটি আহরণ করেছেন, যে রাস বলতে বিশেষ সুর, তাল, গান, কাব্য এবং নাচ—সবই একসঙ্গে বোঝায়।

হল্লীসক কিংবা রাস—এ সবের কূট-কাচালি থাক। কৃষ্ণ নেচেছিলেন—সে কথা সত্যি। কিন্তু নাট্যকার ভাস যে কথাটা স্বপ্নেও ভাবেননি এবং যে কথাটা পরবর্তী সমস্ত আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়াল, তা হল—কৃষ্ণের পরবধূবিলাস। আজ থেকে আড়াই/তিন হাজার বছর আগে কোন আভীরী সমাজে বিশেষ একটি আভীর যুবকের মোহন বাঁশির সুরে যদি আকুল হয়ে উঠে

থাকে পরবধূরা—জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্—তাতে দোষ কিছু দেখি না। যৌথনৃত্যেই বা দোষ কি ? হরিবংশকার বলেছেন—স্বামী, ভাই কিংবা বাবা-মা বাধা দেওয়া সত্ত্বেও গোপাঙ্গনারা রাত্রিতে কৃষ্ণের আসঙ্গ লোভে তাঁকেই খুঁজতে লাগলেন। হরিবংশে পরবধূর গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে এই একটিই শ্লোক, বিষ্ণু পুরাণেও তাই ; কিন্তু ভাগবত পুরাণে এসে কৃষ্ণকে প্রথমেই একেবারে দার্শনিক ভিত্তিতে স্থাপন করা হল, তারপরে পরবধূর লাম্পট্য দেখিয়ে, সে লাম্পট্যও প্রতিষ্ঠিত হল দার্শনিক ভিত্তিতে। তবু কিন্তু সব কিছুর ওপরেও বলব, এই ভাগবত পুরাণ না থাকলে আমরা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কতকগুলি কবিতা থেকে বঞ্চিত হতাম।

মহাভারতের রাজনৈতিক নেতা কৃষ্ণকে বেশ সহজেই যুক্তি-তথ্য দিয়ে প্রমাণ করা যায়, কিন্তু পুরাণ-কর্তাদের ইতিহাসাশ্রয়ী কল্পনালোকে তৈরি ভাবুক রসিক কৃষ্ণকে দেখতে হবে নতুন আলোকে। একটা কথা মনে রাখা দরকার, হালের গাথাতে যে প্রেমিক কৃষ্ণটিকে আমরা পাই নাট্যকার ভাসের সময়েই তিনি ঈশ্বরে পরিণত। এমনকি গুপ্তযুগের কবি কালিদাসও গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর যে কৃষ্ণকে চিনতেন, তাঁকেও তিনি এক করে দিয়েছেন বিষ্ণুর সঙ্গে—বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ।[৩৬] বলা বাহুল্য তিনি বৃন্দাবনের খবরও রাখতেন। মহাভারতকার নন্দ-যশোদার প্রাণারাম কৃষ্ণের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলেননি, কিন্তু রাখাল কৃষ্ণ কিংবা তাঁর আভীর মা-বাবা মথুরার পাথরে খোদাই হয়ে গেছেন খ্রীস্টোত্তর প্রথম কি দ্বিতীয় বছরেই। কাজেই মহাভারতের কৃষ্ণের পাশাপাশি আভীর কৃষ্ণের ঐতিহ্যও প্রচলিত ছিল খ্রীস্টপূর্বাব্দ থেকেই। আর ঈশ্বরত্ব যে কেমন করে আস্তে আস্তে মনুষ্যত্বকে গ্রাস করে তার প্রমাণ অন্তত ভারতবর্ষে দেবার প্রয়োজন নেই। পুরাণকর্তাদের সপ্রণাম অভিবাদ-স্তুতিতে, কবিদের মাঙ্গলিকে শ্রুতকীর্তি পুরুষ ঈশ্বর হয়ে যান। একটি প্রাচীন শ্লোকে দেখি যশোদা কৃষ্ণকে বলছেন—দেখ বাছা, রাত্রি অনেক হল, এবার ঘুমিয়ে পড়। কৃষ্ণ বললেন—আমার ঘুম আসছে না। যশোদা বললেন—তাহলে গপ্পো শোন, ঘুম আসবে। যশোদা গপ্পো বলতে আরম্ভ করলেন—পুরাকালে রঘুবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ রাম নামে এক রাজা ছিলেন। একথা শুনেই কৃষ্ণের মুখে এক অনির্বচনীয় হাসি ফুটে উঠল। কবি বলতে চাইলেন, কৃষ্ণের মনে তাঁর পূর্বেকার রাম অবতারের স্মৃতি জেগে উঠল বলেই তাঁর হাসিটি।[৩৭] এইরকম করেই ভগবত্তার প্রতিষ্ঠা হয়।

মহাভারতের বাসুদেব কৃষ্ণ যদি খ্রীস্টপূর্বাব্দেই ভগবান হয়ে গিয়ে থাকেন, তো গোপকিশোর কৃষ্ণও ভগবান হয়ে গেছেন খ্রীস্টপূর্বাব্দেই। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে আধুনিকমনা একজন ঐতিহাসিকের চোখ চৈতন্যদেবের ছিল। কেননা আজকাল যে Syncretism -এর কথা বলা হয়, তার সম্পূর্ণ বোধ সেই ষোড়শ শতাব্দীতেই চৈতন্যদেবের ছিল। তাঁর মুন্সিয়ানা হল, মহাভারত কিম্বা ইতিহাসের সেই ঐশ্বর্যাত্মক কৃষ্ণকে মাথার মধ্যে রেখেও তিনি মহিমান্বিত করেছেন গোপালক কৃষ্ণকে। তাঁর দৃষ্টিতে এই গোপবেশ কৃষ্ণই পরম তত্ত্ব, পরম ঈশ্বর। কিন্তু কৃষ্ণের ভগবৎ স্বরূপটি থাকতে হবে ভক্তের বুদ্ধিতে, মনে নয়। অর্থাৎ কিনা বৈষ্ণব ভক্ত তাঁর তত্ত্বগত বুদ্ধিতে তাঁকে পরম ঈশ্বর বলে

মানবেন, কিন্তু ভক্তের মনে থাকবে তাঁর মানুষ স্বরূপ, যেখানে তিনি বাঁধা পড়বেন ভক্তপ্রাণের টানে, যেখানে তিনি যাজ্ঞবল্ক্য কিংবা শ্বেতকেতুর জ্ঞানময় পরিনিষ্পন্ন বুদ্ধিতে শুধুমাত্র জ্যোতিঃস্বরূপ হয়ে ধরা দেন না, যাঁর কথা পাসক্যাল বলেছিলেন এইভাবে—**God of Abraham, Isac and Jacob, not of the philosophers and scholars** ।[৩৮]

ভগবান হিসেবে কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা হয়েছে দুভাবে—এক, মিথলজিস্টদের দৃষ্টিতে ঋগ্বৈদিক বিষ্ণুর মাধ্যমে আর দার্শনিকের দৃষ্টিতে জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মের মাধ্যমে। বিষ্ণুর মধ্যে যে ত্রাতার ভূমিকা ছিল, কৃষ্ণের অসুর-বিনাশী সত্তার সঙ্গে তা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে ; বস্তুত বিষ্ণুব্যতিরিক্ত একেবারে শুদ্ধ এবং পৃথক কৃষ্ণ-পূজা পদ্ধতি যেমন খুঁজে বার করা কঠিন, ঠিক তেমনই কঠিন কৃষ্ণব্যতিরিক্ত কোন বিষ্ণুপূজা পদ্ধতি খুঁজে বার করা। বিষ্ণু এবং কৃষ্ণ—একে অপরের ক্ষেত্রে এমন নির্বিরোধে ঢুকে পড়েছেন যে, তাঁদের একান্ত আপন জমিটিই মধুর পারস্পরিকতায় বেদখল হয়ে গেছে। কালিদাসকে তাই বলতে হয়েছে গোপ-বেশস্য বিষ্ণোঃ। বার্থ সাহেব আবার আরেক কাঠি ওপরে, তাঁর ধারণা ঋগ্বৈদিক বিষ্ণুর যে এত নাম-যশ, তা সম্ভব হয়েছে এই কৃষ্ণের জন্য।[৩৯] কৃষ্ণের সঙ্গে একাত্মতার আগে বেদের যুগে বিষ্ণুকে কে অত পুঁছত। হবেও বা। আমরা যেটুকু বুঝি মহাভারতের যুগের অনেক আগেই বাসুদেব কৃষ্ণের সঙ্গে বৈদিক বিষ্ণু এক হয়ে গেছেন। তাতে একটা বড় লাভ হয়েছে এই যে, বিষ্ণুর সংস্পর্শে এসে কৃষ্ণের যেমন দেবায়ন সম্ভব হয়েছে, তেমনি কৃষ্ণের সংস্পর্শে বিষ্ণুর মনুষ্যায়নও সহজ হয়ে গেছে। এই দেবায়ন আর মনুষ্যায়নের আন্তর প্রতিক্রিয়ায় কৃষ্ণ হয়ে উঠেছেন অবতারবাদের কেন্দ্রবিন্দু। তিনি শুধু অবতার নন, অবতারী। জয়দেবের দশাবতার স্তোত্রের মধ্যে তাই অবতার হিসেবে কৃষ্ণের নাম পাওয়া যায় না, কেননা "কেশব ধৃত দশবিধরূপ", কৃষ্ণই দশটি অবতাররূপে আবির্ভূত, তিনিই তাঁদের কর্তা—জয়দেবের ভাষায়—দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তস্মৈ নমঃ।

একটা কথা অবশ্য ঠিক, কৃষ্ণকে আজকে যে চেহারায় আমরা পাই, সে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে পুরাণকারদের অবদান এবং সেই কৃষ্ণকেই নতুন করে চিনিয়ে দিয়েছেন চৈতন্যদেব। সকলেই জানেন বৈদিক যুগে দেবতা অনেক। যখন একের স্তব করা হচ্ছে, তখন মনে হবে তিনিই যেন সব, রবীন্দ্রনাথের অতিবাদী ভঙ্গিতে বলা যায়—

থাকো হৃদয় পদ্মটিতে
এক দেবতা আমার চিতে—
চাইনে তোমায় খবর দিতে
আরো আছেন তিরিশ কোটি।

কিন্তু তিরিশ-কোটি দেবতার সঙ্গে লুকোচুরি খেলে কদিন চলে! ঋষিদের মনেও কেমন যেন এক নৈরাশ্যবোধ কাজ করতে থাকল, তাঁরা ভাবলেন—কার পূজা করব, এত তেল-ঘি পুড়িয়ে কি ফল—কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেমঃ ? এইরকম এক নৈর্ব্যক্তিক অনুভূতি থেকেই বৈদিক কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব কমে গেল। হবির্ধূম, মেঘমন্দ্র মন্ত্রোচ্চারণ, শত-সহস্র যজ্ঞ-প্রক্রিয়ার আড়ম্বর আস্তে আস্তে জায়গা করে

দিল উপনিষদের ; উদয় হলেন ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষিরা জ্ঞান, যোগ আর ধ্যানের সূক্ষ্ম পথে। কিন্তু জ্ঞান আর ধ্যানের সূক্ষ্মতা, নিষ্কাম কর্ম আর চিত্তশুদ্ধি—এসব সাধারণ্যে চলে না। ঋষি যখন বলবেন, অস্তমিতে আদিত্যে, চন্দ্রমসি অস্তমিতে, যিনি থাকেন তিনি সেই জ্যোতিষ্মান পুরুষ, সাধারণে তখন বলবেন—সেই পুরুষটির চেহারা বল, জ্যোতিঃস্বরূপকে আমরা বুঝতে পারি না। ঠিক এই সুযোগটিরই সদ্ব্যবহার করেছেন পুরাণকর্তারা। কৃষ্ণ লীলাপুরুষোত্তম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন, পর ব্রহ্ম, পুরাণ পুরুষ—সব তিনিই।

তবু এরই মধ্যে চৈতন্যের মর্মকথাটিই বলা হল না—সেটি হল পরবধূলম্পট হিসেবেই কৃষ্ণের তাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠা। চৈতন্য পরিকর রাধাভাবে বলেছেন—কোন এক সুচতুর শঠচূড়ামণি, গোপবধূর লম্পট আমাদের জোর করে তাঁর ভৃত্যে পরিণত করেছেন—কেনাপি শঠেন বয়ং হঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের তত্ত্বদৃষ্টিতে এই পরবধূনায়কই সমস্ত লীলারসের আধার। তিনি যেহেতু রস আস্বাদনের জন্যই ভূমিতে অবতীর্ণ, তাই পৃথিবীর যা চরম রস—পরবধূবিলাস, সেটিই তিনি করে দেখিয়েছেন। যদিও বৈষ্ণব সুজনের মতে এই ব্রজরমণীরা কিন্তু কেউই আসলে পরবধূ নন, এঁরা গোলোক বৈকুণ্ঠে সবাই কৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা, শুধু কৃষ্ণকে লীলারস আস্বাদন করানোর জন্যই পরকীয়ার মত ব্যবহার করছেন মাত্র—জীব গোস্বামীর ভাষায়—পরমস্বীয়া অপি পরকীয়ায়মানা ব্রজদেব্যঃ।[৪০]

এসব তত্ত্বকথার মধ্যে আর একটুও যাব না, আমরা জানি পরকীয়া রসের মাদকতা যাই থাকুক এবং তার তত্ত্বগত প্রতিষ্ঠাও যাই হোক না কেন, কৃষ্ণ যে রসিকপুরুষ এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। সারা জীবন ধরেই তাঁর এই রসিকতা পরিব্যাপ্ত। জে এল ম্যাসন সাহেবের মাথায় আবার ফ্রয়েডের পোকা থাকার দরুন তিনি কৃষ্ণের যৌনচরিত্রের এক নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি একটি প্রাচীন শ্লোক খুঁজে বার করেছেন তাতে লেখা আছে—কৃষ্ণ যখন একেবারেই শিশু তখন মায়ের বয়সী কোন ব্রজযুবতী শিশু কৃষ্ণের ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে চুমো খাচ্ছিলেন, তাঁর কণ্ঠ লেগে ছিল কৃষ্ণের কণ্ঠে—অধরমধরে কণ্ঠে কণ্ঠং—আর চটুল দৃষ্টিতে তিনি তাকাচ্ছিলেন চপল শিশুর চোখের দিকে। শিশু কৃষ্ণ যখন কান্না জুড়ে দিলেন, তখন তিনি তাঁকে লুকোলেন বুকের মধ্যে। এতে কৃষ্ণের মনে জেগে উঠল অমৃত পুলক, বুঝি তার অধরে হাসির ঝিলিক খেলে গেল একটু, কেননা তিনি যেন তখন ভালবাসার রসে অবশ—নিভৃতপুলকঃ স্মেরঃ পায়াৎ স্মরালসবিগ্রহঃ। ম্যাসন বলেছেন—শিশু অবস্থা থেকেই এই ব্রজরমণীদের অতিরিক্ত আদর ভালবাসায় কৃষ্ণের এক ধরনের যৌন বিকার ঘটেছে যা পরবর্তীকালে পরিস্ফুট হয়েছে তাঁর অতি সম্ভোগে এবং রমণীবিলাসে।[৪১] এত সব যৌন-বিকারের কথা হয়তো আমরা ম্যাসন সাহেবের মত করে বুঝি না, তবে এটা বুঝি কৃষ্ণকে অনেক মেয়েরাই ভালবাসত, সে যেমন ব্রজেও, সে তেমনি দ্বারকাতেও। ভাগবত পুরাণে 'ভ্রমরগীত' বলে একটা অধ্যায় আছে। তখন কৃষ্ণ মথুরায়, আর উদ্ধবকে তিনি দূত করে পাঠিয়েছেন গোপীদের সংবাদ নিয়ে আসার জন্য। গোপীরা উদ্ধবদূতকে দেখেই তাকে ফুলে-ফুলে-মধু-খাওয়া কৃষ্ণ-মধুকরের বন্ধু মনে করে যথেষ্ট গালাগালি দিল।

কিন্তু তাঁদের আসল শঙ্কা যেটা, সেটা কিন্তু ধরা পড়েছে একেবারের ভ্রমরগীতের শেষে। তাঁদের ধারণা—বৃন্দাবনের সহজ সরল আহিরিণীর প্রেম কৃষ্ণকে যথেষ্ট সুখ দিতে পারেনি। কিন্তু মথুরা যে শহর, সেখানকার নাগরিকাদের বৈদগ্ধ্য-বিলাস নিশ্চয়ই তাঁকে একেবারে নেশায় বুঁদ করে ফেলেছে। এমন অবস্থায় সেই অর্ধশায়িত কৃষ্ণ তাঁর অগুরুগন্ধি হাতখানি মাথার তলায় ঠেকা দিয়ে একবারও কি এই ব্রজের দাসীদের কথা মনে করেন—ক্বচিদপি স কথা নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে/ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্ধ্ন্যধাস্যৎ কদা নু।[৪২]

সত্যিই কৃষ্ণ মনে রাখেননি। মথুরার নাগরিকারা তো আছেনই, দ্বারকায় আছেন সেইসব বিদগ্ধা মহিলারা, যাদের একটার পর একটা কৃষ্ণ বিয়ে করে এনেছেন। কৃষ্ণ যখন তাঁর ছোটবেলার আভীরপল্লী ছেড়ে মথুরায় এসেছিলেন কিংবা দ্বারকায় প্রায় রাজা হয়েই বসেছিলেন, সেদিন তিনি ধরতে পারেননি নগরবাসিনী নাগরিকার স্বভাব কি? কংসের আদেশে অক্রুর যেদিন কৃষ্ণকে নিতে এসেছিল, সেদিন বিরহ-নক্ষত্রের মিটমিটে আলোতেই গোপাল বালিকারা কৃষ্ণের ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলেন। কৃষ্ণ বোধহয় মিথ্যে কোন আশ্বাস দিয়েছিলেন ব্রজগোপীদের; কিন্তু তাঁরা ঠিক ধরেছিলেন। তাঁরা পরস্পরে নিজেরা নিজেরাই বললেন—মথুরায় একবার গেলে পরে আর কি কৃষ্ণের পক্ষে ফিরে আসা সম্ভব! মথুরা-নাগরীদের কথার মধু এমনই যে সেই বিলাসরসের ছলায় কৃষ্ণ নিশ্চয়ই ভুলে যাবেন আমাদের মত গ্রাম্যগোপীদের—নাগরস্ত্রীকলালাপমধু শ্রোত্রেণ পাস্যতি। চিত্তমস্য কথং ভুয়ো গ্রাম্যগোপীষু যাস্যতি।[৪৩] তার মধ্যে নাগরীদের হাব, ভাব, কটাক্ষ—এই সবের শৃঙ্খলে একবার বাঁধা পড়লে কোন যুক্তিতে তিনি আবার ব্রজে ফিরে আসবেন—কয়া যুক্ত্যা সমেষ্যতি। সত্যিই তো যুক্তি ছিল না, আপাতদৃষ্টিতে সত্যিই যুক্তি ছিল না। কিন্তু নাগরীদের রসালাপ ভাবস্মিত কটাক্ষের সঙ্গে যে অবিশ্বাসিনী স্বৈরিণীর বিষশ্বাস মেশানো ছিল তা কৃষ্ণ নিশ্চয়ই তাঁর জীবৎকালেই বুঝতে পেরেছিলেন। সেদিন অবশ্যই তাঁর পুরানো আভীরপল্লীর সরলা গোপকিশোরীদের কথা মনে পড়ছিল। মনে পড়ছিল—এক রমণী অন্য এক গোপরমণীকে বলেছিল—সখি, তোমার বুদ্ধি অতি সরল, কেননা কঠিন হৃদয় সেই পুরুষটিকেই তুমি মনপ্রাণ সঁপে বসে আছ। কৃষ্ণের আবার মনে পড়ছিল—সৎ পরামর্শ দেওয়া সেই হিতৈষিণীর মুখের ওপর ঝামড়ে চিৎকার করে উঠেছিল সেই কুলবালিকা গোপনারী। সে বলেছিল—বোল না সখী অমন করে বোল না। শ্যামসুন্দর আমার স্বেচ্ছাচারী পুরুষ। তিনি যদি হাজার বছরের ঔদাসীন্য নিয়ে আমাকে অবহেলাও করেন—কামং শ্যামলসুন্দরো ময়ি সখি স্বৈরী সহস্র সমাঃ, তবু কোনদিন ভুল করেও যেন আমার মন সেই প্রাণের প্রাণ প্রাণারাম কৃষ্ণের সপ্রণয় দাস্য পরিত্যাগ না করে—চেতো জন্মনি জন্মনি প্রণয়িতা দাস্যং ন মে হাস্যতি।

কৃষ্ণ রসিক পুরুষ, মনে মনে তিনি জানতেন মথুরানাগরীদের চেয়ে ব্রজের আহিরিণীরা শতগুণে ভাল। মথুরায় কিছুদিন থাকার পরেই তাই উদ্ধবকে তিনি বলেছিলেন—একবার ব্রজে যাও—গচ্ছোদ্ধব ব্রজং সৌম্য। সেখানে গিয়ে তুমি দেখবে এখনো আমার ফেরার পথ চেয়ে বসে আছে ব্রজের গোপিনীরা। ফেরার

আশা—সেই আশাই শুধু তাদের প্রাণধারণ করতে শিখিয়েছে—আশাবন্ধেঃ সখি নবনবৈঃ কুর্বতী প্রাণবন্ধম্। ব্রজগোপীদের কাছ থেকে অনেক দূরে বসে কৃষ্ণ একবারের জন্যও অন্তত বুঝেছিলেন—ব্রজগোপীরাই তাঁর জীবনের চরম প্রাপ্তি—তাঁরাই তাঁর প্রাণ—বল্লব্যো মে মদাত্মিকাঃ।[৪৪]

৩

কৃষ্ণজীবনের এই অধ্যায়টাকে এখন আমাদের ছেড়ে দিতে হবে, কেননা সময় এসেছে আরও গভীর ঐতিহাসিকতায় মন দেবার। কৃষ্ণ যখন এই ধরাধামে এসেছিলেন তখন তাঁর কালের সমস্ত রীতিনীতি, লোক-ব্যবহার এমনকি ধর্মেরও মাথায় চেপে বসেছিলেন। পুরানো অনেক কিছুই তাঁর আমলে উঠে গেছে, যা কিছুই আবার ঘটেছে বা হয়েছে নতুন করে—তা তাঁর মত করেই ঘটেছে বা হয়েছে। মিথলজিস্টরা যেমন বলবেন, কৃষ্ণপূজা চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন সমাজের অনেক অন্ধপূজাই উৎখাত হয়ে পড়েছিল। তার মধ্যে বৃক্ষপূজা যেমন একটি, কালিয়দমনের পরে নাগপূজাও তেমনি একটি। যেটা বলা হয়নি এবং যেটা অত্যন্ত জরুরী সেটা হল ইন্দ্রপূজা বন্ধের বৃত্তান্ত। ইন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণের সংঘর্ষের মূলটা জানতে হলে আমাদের আরও একটু পেছন ফিরে তাকাতে হবে।

প্রথমেই আমবা প্রবেশ করব ঋগ্‌বেদের কালে। সেখানে দেখব দশ হাজার সৈন্য নিয়ে কোন একজন কৃষ্ণ অংশুমতী নদীর তীরে দাঁড়িয়ে দারুণ শব্দ করছেন—অংশুমতীম্ অতিষ্ঠদিয়ানঃ কৃষ্ণো দশভিঃ সহস্রৈঃ। অনেক পণ্ডিতই অংশুমতী নদীকে যমুনা বলে মনে করেন। কৃষ্ণ বোধহয় শব্দ করে যুদ্ধের আহ্বানই জানাচ্ছিলেন কাউকে। কেননা ঋগ্‌বেদে দেখি—এই শব্দ শুনেই ইন্দ্র এসে কৃষ্ণপক্ষের সৈন্যগুলিকে বধ করেন। ইন্দ্র নিজের মুখেই বলেছেন—দ্রুতগামী কৃষ্ণকে দেখতে পেলাম, সে অংশুমতী নদীর গূঢ়স্থানে বিস্তৃত প্রদেশে বিচরণ করছে এবং তার অবস্থিতি ঠিক সূর্যের মত—অপশ্যং বিষূণে চরন্তমুপহ্বরে নদ্যো অংশুমত্যাঃ। নভো ন কৃষ্ণমবতস্থিবাংসম্...।[১]

যদি প্রক্ষিপ্তবাদই মেনে নিই, তাহলে এই ঋক্‌টি প্রক্ষিপ্ত হয়ে থাকলেই আমাদের সুবিধা। কেননা ঋগ্‌বেদের মূলস্তরে কৃষ্ণের নামোল্লেখ অসম্ভব এবং এই ঋক্‌টি যদি পরবর্তীকালের সংযোজন হয়, তাহলে আমাদেরই অভীষ্টপূরণ হয়। ঋগ্‌বেদ খবর দিয়ে বলেছে, ইন্দ্র নাকি বৃহস্পতির সহায়তায় কৃষ্ণের আগুয়ান সৈন্যবাহিনীকে পর্যুদস্ত করেছিলেন। তবে সেই সৈন্যবাহিনী ছিল দেবহীন, মানে নিশ্চয়ই কৃষ্ণহীন—বিশো অদেবীরভ্যা চরন্তী বৃহস্পতিনা যুজেন্দ্রঃ সসাহে।

যুদ্ধের এই রীতি কৃষ্ণের সঙ্গে মেলে। কৃষ্ণের চরিত্র যেমন, তাতে বিপদ বুঝলেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাবার মানুষ তিনি নন। এখানে আরও লক্ষ করার বিষয় হল—কৃষ্ণের সঙ্গে সূর্যের তুলনা। মিথলজিস্টদের কাছে কৃষ্ণ সৌর দেবতা হিসেবেই পরিগণিত। বিশ্বের সমস্ত ধর্মেই সৌর দেবতাকুলের বিশেষ এক মর্যাদা আছে, কেননা সূর্য থেকেই বেশির ভাগ দেবতার উৎপত্তি। সেই দিক

থেকে সৌর মণ্ডলের মধ্যে কৃষ্ণের অন্তর্ভুক্তি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মিথলজিস্টদের ধারণা বৈদিক দেবতা বিষ্ণুর সঙ্গে কৃষ্ণের একাত্মতাই শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণকে সৌর দেবতাকুলের (Solar Gods) সভ্য করে তুলেছে। কিন্তু মজা হল, অনেকেই ওপরের ঋক্‌টিকে উল্লেখ করেছেন—আর্য জাতির প্রতিভূ ইন্দ্রের সঙ্গে অনার্য কৃষ্ণের সংঘর্ষ সূচনা করার জন্য। যে ঋক্‌মন্ত্র উল্লেখ করে পণ্ডিতেরা বলেছেন ইন্দ্র কৃষ্ণকে মেরে ফেলেছিলেন, সেই ঋক্‌মন্ত্রে ইন্দ্র কর্তৃক কৃষ্ণবধের কোন উল্লেখ নেই।[২] ১·১৩০·৮ সংখ্যা ঋক্‌মন্ত্রে দেখা যায়—আর্যজাতির রক্ষার জন্য, ব্রতরহিত আচারহীন ব্যক্তিদের শাসন করার জন্য ইন্দ্র আর্যেতর জাতির কৃষ্ণত্বক্ ভস্মীভূত করেছেন ; ভাবটা এই—তাঁদের ছাল ছাড়িয়ে দিয়েছেন—ত্বচং কৃষ্ণাম্ অরন্ধয়ৎ। এই ছাল ছাড়ানোর মানে তো মনে হয় তাদের অনার্য সত্তা নষ্ট করে আর্য করে তুলেছেন। কিন্তু এই ঋক্‌মন্ত্র থেকে ছাল ছাড়ানোর ব্যাপারটা মাথায় রেখে, ৮·৯৬·১৩—১৫ ঋক্‌মন্ত্রের ব্যাখ্যায় যদি বলি—ইন্দ্র কৃষ্ণ নামক এক অনার্য যোদ্ধাকে মেরে ফেলেছিলেন—তাহলে, বড়ই বিপদ হয়। হ্যাঁ, ইন্দ্র এবং কৃষ্ণের সংঘর্ষের কথাটা সত্যি বটে, তবে তার থেকেও বেশি লক্ষণীয় এই ঋকে কৃষ্ণের সঙ্গে সূর্যের তুলনা। অন্যত্র দেখেছি, যখনই কোন দেবতা সূর্যের মত বলে কুত্রাপি বেদে ব্রাহ্মণে উল্লিখিত হয়েছেন, তখনই তাঁকে যথাযোগ্য পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়ে সৌর দেবতার পংক্তিতে একটি আসন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে স্বয়ং ইন্দ্রের মুখেই যার উপমা শোনা যাচ্ছে, 'সূর্যের মত' কিংবা সৌর দেবকুলের শিরোমণি ইন্দ্রই যাঁকে বর্ণনা করছেন জ্যোতিষ্মান্ শরীর বলে—অধারয়ৎ তন্বং তিত্বিষাণঃ, সেই সূর্যবর্ণের কোন উল্লেখই তো গবেষকেরা করলেন না। শুধু এইটেই তাঁদের মনে হল যে, এ হচ্ছে আর্যীকরণের যুগসন্ধিতে আর্যের সঙ্গে অনার্যের সংঘর্ষ। আমাদের জিজ্ঞাসা—আর্যীকরণের যুগে আর্যদের সঙ্গে কি আর্যদেরও সংঘর্ষ বাধেনি, বেধেছে—কুরু-পাণ্ডবের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধই তার একটা বড় প্রমাণ। বৈদিক দেবতাদের মধ্যেও কি এক দেবতার সঙ্গে আরেক দেবতার সুসম্পর্ক ছিল ! আমাদের ধারণা কৃষ্ণকে সৌর-জাতে তুলবার জন্য বিষ্ণু পর্যন্ত যেতে হবে না, সূর্যবরণ কৃষ্ণ নিজেই তার প্রমাণ অথবা অনার্য হলেও কৃষ্ণের প্রভাব ছিল সূর্যের মতই।

মিথলজিস্টদের ধারণা, ঋগ্‌বেদের যুগে ইন্দ্রপূজার সঙ্গে কৃষ্ণপূজার একধরনের সংঘর্ষ ছিল এবং সে সংঘর্ষে প্রাথমিকভাবে ইন্দ্র জয়ী হলেও পরবর্তীকালে সেই অপমানের শোধ নিয়েছিলেন কৃষ্ণ। তিনি ইন্দ্রপূজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।[৩] ঋগ্‌বেদের হিসেব মত দশ হাজার সৈনিক তখনও কৃষ্ণের পেছনে ছিল কিনা জানি না, কিন্তু অনেক মানুষই যে তাঁর পেছনে ছিল তার প্রমাণ আছে হরিবংশে। ব্রজের গোয়ালারা সব বর্ষারম্ভে ইন্দ্রযজ্ঞ করার আয়োজন করেছিলেন। তখন কৃষ্ণ বললেন—এই উৎসবের প্রয়োজন কি ? পক্ককেশ এক গোপবৃদ্ধ এর উত্তরে বৃষ্টি আর কৃষির কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন কৃষ্ণকে। তিনি বললেন—ইন্দ্রই আমাদের সনাতন রক্ষক (পাঠক খেয়াল করবেন ঋগ্‌বেদের ধারণাও তাই)।[৪] এর পরে গোপবৃদ্ধ ছোট্টখাট্ট যে বক্তৃতাটি দিলেন, এক কথায় তাকে ঋগ্‌বৈদিক ইন্দ্রস্তুতির পৌরাণিক সংস্করণ বলা চলে। হরিবংশ জানাচ্ছে

'ইন্দ্রের সমস্ত প্রভাব জেনেও—প্রভাবজ্ঞোহপি শক্রস্য—কৃষ্ণ বললেন—যারা কৃষিজীবী, যাদের শস্য ফলানোর প্রয়োজন আছে, তারা ইন্দ্রযজ্ঞ করুক। আমরা হলুম গিয়ে গোয়ালা, গরুই আমাদের জীবন। যার কাছে অভীষ্ট ফল পাই, তাকে বাদ দিয়ে অন্যজনের পূজা করা তঞ্চকতা মাত্র। তার ওপরে যে পর্যন্ত কৃষি-জমি আছে সেই পর্যন্তই ব্রজের সীমা, সেই সীমার পরে বন, বনের পরে পাহাড় ; সেই পাহাড়ই আমাদের অবিচল আশ্রয়—বনান্তা গিরয়ঃ সর্বে সা চাস্মাকং গতির্ধ্রুবা। অতএব ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রযজ্ঞ করুন, হলযজ্ঞ করুন কৃষকেরা, আর গোয়ালারা করুক গিরিযজ্ঞ—গিরিযজ্ঞাস্তথা গোপা গিরিযজ্ঞঃ প্রবর্ত্ত্যতাম্। কৃষ্ণ আরও বললেন—যার যত গোধন আছে সব নিয়ে সুখস্থানে পাহাড়ের কাছে গাছের তলায় ধুমধাম করে গিরিযজ্ঞ হোক। পূজা হল এবং গিরিযজ্ঞের মাধ্যমে কৃষ্ণই সে পূজা গ্রহণ করলেন। ব্রজবাসীরাও পাহাড়ের চূড়ায় কৃষ্ণকেই অধিষ্ঠিত দেখে প্রধানত তাঁরই শরণাগত হলেন।[৫] ঠিক এইভাবেই ইন্দ্রপূজা লুপ্ত হয়ে গেল, ঠিক যেমনটি লুপ্ত হয়ে গেল নাগ-পূজাও। সে আরেক কাহিনী। ইন্দ্রের মত পূজা না পেলেও কালিয়-নাগের অধিকার অস্বীকার করার মত মানুষ তখন ব্রজে কেউ ছিল না। কৃষ্ণ কালিয়-নাগের মাথায় চড়ে নাচতে শুরু করে দিলেন। শেষে কিন্তু কালিয়ের সঙ্গে কেমন যেন একটা রফা হয়ে গেল। কৃষ্ণের কথায় কালিয় কিংবা নাগ-পূজকেরা ব্রজ ত্যাগ করেছে এবং কৃষ্ণও কালিয়কে অভয় দিয়েছেন যে তাঁর লোকেরা কালিয়কে বিরক্ত করবে না।[৬] ঠিক একই রকমের ঘটনা ঘটেছিল কৃষ্ণ আর ইন্দ্রের বেলাতেও।

কৃষ্ণের গিরিযজ্ঞ জলে ভাসিয়ে দেবার জন্য অনেক বৃষ্টি বর্ষণ করে, ব্রজবাসীদের শতেক পীড়া দিয়েও ইন্দ্র দেখলেন—কৃষ্ণ গোবর্ধন পাহাড়টি হাতে তুলে ধরে সবাইকে নিরাপদ আশ্রয়ে সুরক্ষিত রেখেছেন। শেষ পর্যন্ত আর্যস্বর্গ থেকে ইন্দ্র নেমে এলেন ভুঁয়ে—ভাবলেন এর দ্বারা দেবকার্য সাধিত হবে বুঝি। ঠিক এর পরেই ইন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণের কেমনধরা একটা রফা হয়ে গেল। ইন্দ্র যা বললেন, তার ভাবটা ঠিক এইরকম—বাপু হে! ঠিক আছে, ঠিক আছে। এতকাল ধরে শ্রাবণ-ভাদ্র আর আশ্বিন-কার্তিক—এই চার মাস আমার পূজা আরাধনার সময় নির্দিষ্ট ছিল। এখন থেকে দুমাস আমার, আর দুমাস তোমার ; অর্থাৎ কিনা বর্ষাকালটা আমার থাকল, শরৎকালটা পুরোই তোমার—এষামর্ধং প্রযচ্ছামি শরৎকালং তু পশ্চিমম্। তোমাকে লোকে ডাকবে গোবিন্দ বলে, যেহেতু তুমি হলে গিয়ে গরুদের ইন্দ্র, আর আমাকে তো সবাই মহেন্দ্র বলেই ডাকে—অহং কিলেন্দ্রো দেবানাং ত্বং গবাম্ ইন্দ্রতাংগতঃ। তাছাড়া আজকে বলে নয়, তোমার সঙ্গে আমার আত্মীয়তার ব্যাপারও আছে। সেই যে সেই বলি রাজার রাজত্বের সময়, যখন সে খুব বেশি বেড়ে গিয়েছিল তখন তুমি বামনরূপে আমার ছোট ভাই হয়ে জন্মেছিলে, তোমার নাম হয়েছিল উপেন্দ্র। তাহলে, তুমি হলে গিয়ে উপেন্দ্র আর আমি হলুম গিয়ে মহেন্দ্র—মহেন্দ্রং চাপ্যুপেন্দ্রঞ্চ মহয়ন্তি মহীতলে।[৭]

প্রাচীন এবং নবীনের এই সন্ধির সময়, প্রাচীন ইন্দ্র আরেকটা কথা মনে করে কৃষ্ণকে বললেন। সেটা হল—বংশ-সম্বন্ধে তোমার পিসি কুন্তীর একটি ছেলে আছে। তার নাম অর্জুন, আমারই অংশে তার জন্ম। সেই অর্জুনকে তুমি একটু

দেখে শুনে রেখ। শুধু তাকে রক্ষা করা নয় তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নিও—স তে রক্ষ্যশ্চ মান্যশ্চ সখ্যে চ বিনিযুজ্যতাম্।[৮]

ইন্দ্রের বিপুল বাগ্মিতার এই হল সার কথা। নিজে দেবেন্দ্রত্ব মহেন্দ্রত্বে কিছুই বিসর্জন দিতে চান না, অন্যদিকে উপেন্দ্রত্ব আর গরুদের ইন্দ্রত্ব লাভ করে কৃষ্ণ কতখানি খুশি হতে পারেন—তাও তিনি চিন্তা করলেন না। কৃষ্ণ মনে মনে হাসছিলেন কিনা, হরিবংশ তা জানায়নি। আপাতত ইন্দ্রকে না চটালেও তিনি কিন্তু বেশ মুরুব্বিয়ানার সুরে বললেন—জানি মশাই জানি, অর্জুনের জন্ম-কর্ম সব আমার জানা আছে। তার দুই দাদা যুধিষ্ঠির ভীমের কথাও আমার ভালমত জানা আছে। তার ছোট দুই ভাই নকুল সহদেব এমন কি কুন্তীর কানীন পুত্র সূর্যসম্ভব কর্ণের কথাও আমার জানা আছে। যুদ্ধকামী কৌরবদের সম্বন্ধেও আমার কাছে খবর আছে। আপনি এখন স্বর্গবাসীদের সুখের জন্য মানে মানে প্রস্থান করুন—তদ্‌গচ্ছ ত্রিদিবং শক্র সুখায় ত্রিদিবৌকসাম্। আমি থাকতে অর্জুনকে কেউ কিছু করতে পারবে না—নার্জুনস্য রিপুঃ কশ্চিন্ মমাগ্রে প্রভবিষ্যতি।[৯]

ইন্দ্র-কৃষ্ণের সংঘর্ষে আর্যজাতির প্রতিভূ ইন্দ্রের ওপর কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা কি করে হল—সেটা দেখানো আমার উদ্দেশ্য নয়। বরঞ্চ একজন ঐতিহাসিক পুরুষ হিসেবে কৃষ্ণ কি করে ক্রমে ক্রমে ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে একক প্রতিষ্ঠা পেলেন—সেটা দেখানোই আমার উদ্দেশ্য এবং সেই জন্যেই অর্জুনের প্রসঙ্গ অনিবার্য। পাঠক মনে রাখবেন, এ ব্যাপারে মহাভারত আমাদের যতখানি সুবিধে দেবে হরিবংশও ঠিক ততখানি।

প্রথম কথা, ইন্দ্র যখন কৃষ্ণের সঙ্গে মোটামুটি একটা সমঝোতায় এলেন তখনও কিন্তু কংসবধ হয়নি, কারণ কংসকে বধ করার জন্য ইন্দ্র সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন কৃষ্ণকে। আমরা বলব ইন্দ্রপূজা রোধ করে কালিয়-নাগকে দমন করে কৃষ্ণ আগে নিজের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত এবং শক্ত হয়ে দাঁড়াতে চেয়েছেন। কংসের চর বলে প্রচারিত পূতনা, ধেনুকাসুর, প্রলম্বাসুর ইত্যাদি অসুর নামধারী বিরোধী শক্তিগুলি উৎখাত হবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ-বলরামের যুদ্ধবীর্যও দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে পাণ্ডব কৌরবদের মনোমালিন্যের খবরও ভারতের রাজনৈতিক মহলে বহুল প্রচারিত হয়ে গেছিল। কেননা ইন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণের বাক্যালাপের সূত্র থেকে বুঝি, কৃষ্ণ বৃন্দাবনে বসেই এই মনোমালিন্যের খবর রাখেন। ভারতের রাজনৈতিক পটভূমিকায় কৃষ্ণকে দেখতে হলে এখান থেকেই আমাদের আরম্ভ করতে হবে।

কৃষ্ণ-জীবনের তথ্য সরবরাহের ব্যাপারে ভাসের বালচরিত নাটকটিকে যদি সবচেয়ে প্রাচীন ইস্তাহার বলে মনে করি, তাহলে খেয়াল করতে হবে যে, সেখানে কোন পুরাণের দৈববাণী হয়নি বসুদেবের কাছে। বসুদেব জানতেনও না যে শিশু কৃষ্ণকে নিয়ে তিনি কোথায় যাবেন। তিনি শুধু এইটুকু জানতেন যে বাচ্চাটিকে অত্যাচারী কংসের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। দেবকী জিজ্ঞেস করছেন—বাচ্চাটিকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন, আর্যপুত্র? বসুদেব বললেন—সত্যি কথা বলতে কি আমিও জানি না···সত্যং ব্রবিষি, অহমপি ন জানে।[১০] যাকগে, কপাল যেখানে নিয়ে যায় সেখানেই যাব। বসুদেব বেরোলেন, যমুনা পার হয়ে

নন্দগ্রামের সীমায় এসে পৌঁছোলেন। তাঁর বন্ধু নন্দগোপ যেহেতু এখানেই থাকে, তিনি চাইলেন সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে, পাছে অনর্থক কোন ঝামেলা হয়। একটি বটগাছের তলায় বসে কেবলই তাঁর মনে হতে থাকল—বাচ্চাটা যদি লোকহিতের জন্য, কংসবধের জন্যই বৃষ্ণিকুলে জন্ম নিয়ে থাকে, তবে এই ঘোষপল্লী থেকে কেউ নিশ্চয়ই আসবে। এলও, নন্দগোপ এসে বৃষ্ণিকুলের পরিত্রাতাকে জন্মের মত আশ্রয় দিলেন।[১১]

এইরকম করে বাচ্চা বাঁচানোর গপ্পো তো আমরা সেদিনের রাজকাহিনীতেও শুনেছি এবং তার মধ্যে তো সত্যতাও কিছু আছে। কাজেই বসুদেব বার বার নন্দকে বলে দিলেন বাচ্চাটিকে মানুষ করার ব্যাপারে যেন কোন ত্রুটি না হয়, কেননা বাচ্চাটিকে বাঁচানো মানে কংসের হাত থেকে সমস্ত যাদবকুলকে বাঁচানো। এই যে যাদব-বৃষ্ণিকুল বাঁচানোর দায়, এই দায় থেকেই উত্তর পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কৃষ্ণের অভ্যুদয় এবং প্রতিষ্ঠা। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি সংবাদপত্রের শিরোনামের মত একটি খবর দিয়ে বলেছেন—অসাধু র্মাতুলে কৃষ্ণঃ—অর্থাৎ কৃষ্ণ তাঁর মামার সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেছেন, যার শেষ হয়েছে মৃত্যুতে। স্বীকার করতেই হবে যে শুধু কৃষ্ণ নয়, তাঁর শত্রু-মিত্র অনেকেই তখনকার রাজনৈতিক পটে ঐতিহাসিক চরিত্র।

কৃষ্ণের জন্মের সময়েই কংস অত্যাচারী রাজা বলে চারিদিকে সমস্বরে স্বীকৃত—ভোজবংশের কুলাঙ্গার—ভোজানাং কুলপাংসনঃ। নিজের বাবা উগ্রসেনকে তিনি বন্দী করে রেখেছেন কারাগারে। জনসাধারণকে তিনি বলে বেড়ান যে, উগ্রসেন নাকি তাঁর বাবাই নয়। তাঁর বাবা হলেন দানবরাজ দ্রুমিল, যিনি উগ্রসেনের পত্নীর গর্ভে কংসের জন্ম দিয়েছেন।[১২] অন্যায়ভাবে বলপ্রয়োগেই যার জন্ম, সেই বলই হল কংসের আদর্শ, সুপ্রসিদ্ধ ভোজবংশে সে আদর্শ চলে না। সেকালের সুবিধে ছিল, অন্যের ঔরসে পুত্র জন্মালেও, পালক পিতারা সেই পুত্রকে স্বীকার করে নিতেন—সে আপন বংশ মর্যাদা রক্ষার জন্যেই হোক কিংবা মুখর জগতের মুখ বন্ধ করার জন্য। যেমন ধর্ম, বায়ু অথবা ইন্দ্রের পুত্র হলেও যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন পাণ্ডুরই পুত্র। কিন্তু এইরকম একটা সুযোগেই কংস ভোজবংশের মানুষ হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। তবে তিনি যে প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি হিসেবে পশ্চিম ভারতের রাজনীতিতে পাকা আসন করে নিয়েছিলেন, সে কিন্তু তাঁর নিজের ক্ষমতায়।

কৃষ্ণ এবং কংস দুজনের কথাই যখন উঠল, তখন এঁদের পূর্বকথা এবং বংশ-পরিচয়ও একটু সেরে নিতে হবে। কেননা পরবর্তী সময়ে দেখা যাবে, তখনকার ভারতবর্ষীয় রাজনীতির খেলায় যাঁরা কৃষ্ণের হাতেই হতাহত, তাঁরা অনেকেই কৃষ্ণের রক্তের সম্বন্ধে আপনজন, আত্মীয়। পাঠকের জানা আছে ভগবদ্‌গীতার প্রথম অধ্যায়ে অর্জুন কৃষ্ণের কাছে ভেউ ভেউ করে কেঁদেছেন। তিনি কেমন করে আপন ভাই-বেরাদর, আত্মীয় স্বজনকে মারবেন—এই চিন্তায় তিনি আকুলিত—স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব। কৃষ্ণ তখন সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন ধর্মযুদ্ধ করতেই হবে। এর পরে তো কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগ আরও কত যোগ উপদেশ করে অর্জুনকে কৃষ্ণ বলেছেন—যুদ্ধ তোমাকে করতেই হবে—তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব—কারণ

তাতেই ধর্ম, তাতেই যশ। ভগবদ্‌গীতার অসংখ্য দার্শনিক উপদেশ স্মরণে রেখেও পাঠককে জনান্তিকে জানাতে পারি যে, যিনি এত জোরের সঙ্গে অর্জুনকে আত্মীয়-স্বজন বধে উৎসাহ দিয়েছিলেন, সেই স্বজন বধে তাঁর নিজেরই হাত ছিল পাকা। কাজেই কৃষ্ণের আপন আত্মীয়-স্বজনের বংশ পরিচয় একটু দিতেই হবে।

একটু বেশি আগের কথা বললে অসুবিধে হবে কিনা জানি না, তবে মহারাজ যযাতির কথা নিশ্চয় সবার মনে আছে। সেই যযাতি, যাকে কচের সঙ্গে কাটাকাটি হবার পর বিয়ে করেছিলেন দেবযানী ; সেই যযাতি, যিনি দেবযানীর অজান্তে তাঁরই দাসী শর্মিষ্ঠার গর্ভে পুত্রোৎপাদন করেছিলেন। এই যযাতির বড় ছেলে হলেন যদু, যাঁর নামে যদুবংশ।যযাতির দ্বিতীয় ছেলে ক্রোষ্টু এবং ক্রোষ্টুর নাতি হলেন বৃষ্ণি, অন্ধক এবং দেবমীঢ়ুষ। যদুর সূত্রে কৃষ্ণ যেমন যাদব, তেমনি বৃষ্ণির সূত্রে তিনি বৃষ্ণি। বৃষ্ণির দুই ছেলে শফল্ক এবং চিত্রক। শফল্কের ছেলে অক্রুর কৃষ্ণের সমসাময়িক এবং তিনি কংসের সভায় গণ্যমান্য ব্যক্তি, সম্পর্কে কৃষ্ণের ভাইও বটে। কেননা বৃষ্ণি-অন্ধকের বৈমাত্রেয় ভাই দেবমীঢ়ুষের ছেলে হলেন শূর এবং স্বয়ং বসুদেব এই শূরেরই ছেলে। কৃষ্ণ বসুদেবের ছেলে হলেও শূরের নামে শৌরি বলেও পরিচিত। বসুদেবের আপন বোন হলেন পৃথা, যাঁর সঙ্গে পাণ্ডুর বিয়ে হয়েছিল। কাজেই পাণ্ডবেরা হলেন কৃষ্ণের আপন পিসতুতো ভাই। অন্য দিকে বসুদেবের আরেক আপন বোনের সূত্রে চেদিরাজ শিশুপালও কৃষ্ণের আপন পিসতুতো ভাই, পাণ্ডবদের দিকে তিনি অবশ্য মাসতুতো ভাই। বৃষ্ণি এবং দেবমীঢ়ুষের কথা বলেছি, অন্ধকের পুত্র-পরিবারের কথা বলিনি। এই অন্ধকের চার ছেলের মধ্যে একজনের নাম কুকুর। তিনি এতই বিখ্যাত যে, তাঁর বংশ কুকুরবংশ বলেও পরিচিত। এই অন্ধক-কুকুর বংশেরই অধস্তন পুরুষ হলেন আহুক, যাঁর ছেলে কংস-পিতা উগ্রসেন। কংসের ঊর্ধ্বতন এক পুরুষ ভোজ কিংবা মহাভোজ নামেও পরিচিত, যাঁর জন্য কংস ভোজ বংশীয় বলেও পরিচিত। আহুকের অবশ্য দুই ছেলে—দেবক এবং উগ্রসেন। দেবকের ছিল সাত মেয়ে এবং তাঁদের সবারই একসঙ্গে বিয়ে হয়েছিল বসুদেবের সঙ্গে। সেই সাতজনের একজন দেবকীর ছেলে হলেন কৃষ্ণ। বংশ-পরিচয় যতটুকু দিয়েছি, তা যথেষ্ট। আর একটা কথা না বললে নয়। তা হল, যযাতির যে ছেলেটি পিতার জরা গ্রহণ করেছিল তিনি হলেন পুরু। সেই পুরুবংশের অধস্তন এক পুরুষ হলেন বিখ্যাত কুরু। মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা কুরুর নামেই বংশ পরিচয় দিতে গর্বিত বোধ করতেন এবং সেই জন্যেই তাঁরা কৌরব। এই অর্থে পাণ্ডবেরাও কৌরব। মূল ধারা থেকে বেরিয়ে গিয়ে পাণ্ডুপুত্রেরা যে পাণ্ডব নামে পরিচিত হতে চাইছিলেন তাতে বুঝি পাণ্ডুর সময় থেকেই তাঁদের ভ্রাতৃবিরোধ দানা বেধে উঠছিল। কৌরবেরা সব মারা গেলে পাণ্ডবেরা কিন্তু আবার কৌরব নামেই তাঁদের বংশ পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন।

এবারে আবার কৃষ্ণ-কথায় ফিরে আসি। কংস যে এত পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছিলেন, তার অন্যতম কারণ ছিলেন মগধরাজ জরাসন্ধ। জরাসন্ধ তাঁর নিজের দুই মেয়েকে কংসের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারতে তাঁর আপন প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। প্রধানত এই জরাসন্ধের বলে বলীয়ান হয়েই কংস যা ইচ্ছে তাই করে যাচ্ছিলেন।

হরিবংশের বর্ণনাতে স্পষ্ট বোঝা যায়—কংসের দৌরাত্ম্য এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা পর্যন্ত তাঁকে আর সইতে পারছিল না। কৃষ্ণের হাতে যখন কংস-চরেরা অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছে তখন স্ববিনাশের ভয়ে কংস নিজেই সভাস্থলে সবাইকে ডেকে এনে বলছেন—আমার কোন সুযোগ্য মন্ত্রী নেই, ভাল গুপ্তচরের অভাবে আমি চোখ থাকতেও অন্ধ—অনমাত্যস্য শূন্যস্য চারান্ধস্য মমৈব তু। আমি যে এখনো সিংহাসনে বসে আছি, সে শুধু আমার নিজের ক্ষমতার জোরে। মাতা-পিতা তো আমাকে ত্যাগই করেছেন, এমন কি আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব—তারাও আমাকে দ্বেষ করে—মাতাপিতৃভ্যাং সন্ত্যক্তঃ স্থাপিতঃ স্বেন তেজসা। উভাভ্যামপি বিদ্বিষ্টো বান্ধবৈশ্চ বিশেষতঃ ॥[১৩]

কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে বৃষ্ণিদের ব্যাপারে বৃষ্ণিসংঘের কথাটি উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ বৃষ্ণিবংশীয়েরা একটি সংঘ বা ইংরেজীতে যাকে corporation বলি তারই মাধ্যমে তাদের রাজত্ব চালাত।[১৪] কংস অবশ্যই সংঘমুখ্য ছিলেন। কৌটিল্যের এই তথ্যের নিরিখে আমার ধারণা হয়, যদু-ক্রোষ্টুর বংশ যেহেতু অত্যন্ত বড় হয়ে গেছিল তাই অন্ধক-কুকুর, ভোজ, বৃষ্ণি এদের সবারই পৃথক পৃথক সংঘ ছিল। কিন্তু কংসের আমলে এরা সবাই কংসের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েই আপন আপন সংঘের কাজ চালাতেন। আমি একথা বললাম এইজন্য যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কৃষ্ণের সমসাময়িক বংশজেরা একে অন্যের বিরুদ্ধে লাগতে কসুর করতেন না এবং লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তাদের একজন হয়তো বৃষ্ণি বংশের, অন্যজন অন্ধক বংশের কিংবা অন্যজন হয়তো সাত্বত বংশের মানুষ। এদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ সময়ে অসময়ে প্রকট হলেও, কারও পক্ষেই কংসকে অতিক্রম করা সহজ ছিল না। কিন্তু অত্যাচারের একটা সীমা থাকে, যে সীমা অতিক্রম করলে পারস্পরিক বিবাদ ভুলে সবাই এক হয়ে যায় এবং সেই বিশেষ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। কংসের ব্যাপারেও বোধ হয় তাই হয়েছিল।

কংস যেদিন প্রকাশ্য রাজসভায় বসুদেবকে অপমান করলেন, সেদিন তিনি বলেছিলেন—যদুবংশের লোকেদের মধ্যে তুমি হলে মুখ্য আর তোমার এই চরিত্র—যদূনাং যূথমুখ্যস্য যস্য তে বৃত্তমীদৃশম্ ? কংসের কথায় বোঝা যায় কৃষ্ণপিতা বসুদেব যদুদের সংঘমুখ্য ছিলেন এবং অনেকেই তাঁর অনুগামী ছিল। তাঁরা বসুদেবকে যথেষ্ট সম্মান করতেন, কারণ কংসের মতে বসুদেবকে নাকি তাঁরা গুরুর মত দেখেন—যদূনাং প্রথমো গুরুঃ। গুর্বর্থং পূজতঃ সদ্ভি র্মহদ্ভির্ধর্মবুদ্ধিভিঃ। বসুদেব এমন কিছু করেছেন যাতে সমস্ত যাদবদের ওপরেই কংসের ঘেন্না ধরে গেছে—বাচ্যাশ্চ যাদবঃ কৃতাঃ। আমাদের জিজ্ঞাসা হয় বসুদেব কি করেছিলেন ? ধর্মের পরম্পরায় আমাদের কাছে কৃষ্ণকাহিনী যেভাবে পৌঁছেছে তাতে তো আমরা বসুদেবকে নির্দোষ এক অত্যাচারিত পিতা বলেই জানি। কিন্তু হরিবংশে দেখি কংস বসুদেবকে বলছেন—তুমি এমন বৃথা আশা করো না বসুদেব, তুমি ভেব না—আমি মরলে তোমার ছেলে এই মথুরায় রাজা হবে। কংস মরলে কংসের ছেলেই রাজা হবে মথুরায়—হতে কংসে মম সুতো মথুরাং পালয়িষ্যতি। এসব কথা থেকে সন্দেহ হয় মথুরায় সিংহাসনের অধিকার নিয়ে বসুদেবেরও কিছু পরিকল্পনা ছিল হয়তো। আরও একটা জিনিসও লক্ষ্য

করার মত। কংস বার বার বসুদেবকে বললেন—তুমি হচ্ছ কাকের মত। একজনের মাথায় বসে কাক যেমন তারই চোখ খুবলে নেবার চেষ্টা করে, তেমনি তুমি আমারই খাচ্ছ, আমারই পরছ আর আমারই মূলোচ্ছেদ করছ—ছিনত্তি মম মূলানি ভুঙ্‌ক্তে চ মম পার্শ্বতঃ। অবশ্য এ ব্যাপারে কংসপিতা উগ্রসেনেরও কিছু দায়িত্ব আছে। তিনি তাঁর ভাইয়ের সাত মেয়ের এক জামাই বসুদেবকে হয়তো কিছু প্রশ্রয়ও দিয়ে থাকবেন। কংস বললেন—এখানেই তুমি জন্মেছ, এখানেই বড় হয়েছ এবং আমার বাবাই তোমাকে বড় করেছেন—ইহ ত্বং জাতসংবৃদ্ধো মম পিত্রা বিবর্ধিতঃ।[১৫] কিন্তু কংস যতই সাময়িক পিতৃগর্ব দেখান না কেন, নানা বিষয়েই তিনি পিতাকে ব্যথিত করেছিলেন এবং পিতার অন্তরে কংস ছিলেন গভীর ক্ষতেরই মত। উগ্রসেনের পক্ষে ভোলা সম্ভব ছিল না যে কংস আসলে দানবরাজ দ্রুমিলের ছেলে। উগ্রসেনেরই রূপ-ধরা দ্রুমিলের বলাৎকারে কংসের জন্মদাত্রী মাতাও কংসকে সহজ মনে মেনে নিতে পারেননি, তার প্রমাণ আছে কংসেরই আহৃত বক্তব্যে। পিতামাতার দ্বারা বিদ্বিষ্ট কংসেরও অভিমান বেড়ে উঠছিল দিনে দিনে, তিনি তখন প্রকাশ্যে দ্রুমিলের পরিচয়েই গর্বিত হতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া হল আরেক ধরনের।

হরিবংশে দেখি—যে সভায় কংস বসুদেবকে নিন্দা করলেন এবং যে নিন্দায় আমরা শুধু কংসপক্ষের বক্তব্য শুনেছি, সেই নিন্দার প্রকাশ্য প্রতিবাদ হল কংসের রাজসভার মধ্যেই, এবং বসুদেব নিন্দার প্রথম প্রতিক্রিয়াতেই অন্ধকবংশের প্রধান বললেন—তুমি যদি যাদবদের কেউ না হও—অযাদবো যদি ভবান্, তাহলে তোমাকে কেউ জোর করে যাদব করতে পারবে না। তুমি ভোজবংশীয় হও কিংবা যাদব, তুমি কংসই হও, বা অন্য যে কেউ—তোমার মাথাটি তোমার সঙ্গেই আছে। আমাদের রাগটা তোমার থেকেও বেশি হয় তোমার বাবার ওপর, যে নিজের থেকে বিলক্ষণ, দুর্জাতীয় তোমার মত এক পুত্রের জন্ম দিয়েছে। তুমি যাদের শাসক সেই বৃষ্ণিবংশীয়েরা আর প্রশংসার যোগ্য নয়—অশ্লাঘ্যা বৃষ্ণয়ঃ পুত্র যেষাং ত্বম্ অনুশাসিতা।[১৬]

পাঠক খেয়াল করুন যিনি কংসের কথার প্রতিবাদ করছেন তিনি অন্ধকবংশীয়, যাঁর পক্ষ হয়ে প্রতিবাদ করছেন সেই বসুদেব যদুমুখ্য বলে পরিচিত। কংসকে এখন কেউ ভোজবংশীয় বলেও মনে করতে পারছে না, যাদব বলেও নয় এবং কংস যাদের শাসনকর্তা সেই বৃষ্ণিবংশীয় পুরুষেরা কংসের জন্যই দুর্নামগ্রস্ত। বৃদ্ধ অন্ধক কৃষ্ণ-বলরামের জাতির কথা উল্লেখ করে বললেন কৃষ্ণও যাদব, বলরামও যাদব, অথচ তাদের সঙ্গে তুমিই শত্রুতা আরম্ভ করেছ প্রথম—জাত্যা হি যাদবঃ কৃষ্ণঃ স চ সঙ্কর্ষণো যুবা। ত্বং চাপি বিধৃতস্তাভ্যাং জাতবৈরেণ চেতসা॥ এসব কথায় বেশ বোঝা যাচ্ছে কংসের জ্ঞাতিকুলের মধ্যে অনেক সংঘমুখ্যই কংসকে পছন্দ করছিল না, প্রধানত যাদের বলে কংস বলীয়ান, সেই বৃষ্ণি-ভোজেরাও তার অত্যাচারে ছিল জর্জরিত এবং তাতে করে কংসের পিতৃকুল সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠছিল।

বৃষ্ণি, অন্ধক, ভোজ—এই সব জাতির শক্তিমান পুরুষেরা ছিলেন কংসের স্বজন এবং প্রজা কিন্তু কংসের স্বচ্ছন্দচারিতায় এঁদের মধ্যে অনেকেই কৃষ্ণপক্ষে যোগ দিয়েছিলেন—শেষাশ্চ মে পরিত্যক্তা যাদবাঃ কৃষ্ণপক্ষিণঃ।[১৭]

মহাভারতের সভাপর্বে কৃষ্ণ নিজেই যুধিষ্ঠিরকে বলছেন যে, ভোজজাতির বৃদ্ধপুরুষদের অনুরোধেই তিনি কংসকে বধ করেছেন। কংসের দ্বারা পীড়িত হয়ে ভোজকুলের ছোট ছোট সামন্ত রাজারা এবং অভিজ্ঞ পুরুষেরাও জ্ঞাতি-বন্ধুদের বাঁচাবার জন্যই কৃষ্ণকে কংসের বিরুদ্ধে যেতে বলেন—ভোজরাজন্যবৃদ্ধৈশ্চ পীড্যমানৈ র্দুরাত্মনা। জ্ঞাতিত্রাণমভীপ্সদ্ভিরস্মৎসম্ভাবনা কৃতা ॥[১৮] হরিবংশে আগেই দেখেছি, কংস যখন উন্মুক্ত সভাস্থলে কৃষ্ণপিতা বসুদেবের নিন্দা করছিলেন তখন অন্ধক-গোষ্ঠীর এক জাঁদরেল পুরুষ (শ্রেষ্ঠঃ সমাজে) সেই মুক্তসভাতেই কংসকে অতি কঠিন ভাষায় তিরস্কার করেন এবং এই নিন্দার প্রতিবাদ করেন। সন্দেহ করি, বসুদেব যে কংসের কারাগার থেকে এক রাত্তিরের মধ্যেই কৃষ্ণকে বৃন্দাবনে পাচার করে দিতে পেরেছিলেন তার পেছনে অন্য সাধারণ মানুষেরও মদত ছিল। বসুদেব নিজেও যে তলায় তলায় কংসের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন না, তাও জোর করে বলা যায় না। কেননা, কংস যখন অক্রূরকে ব্রজে পাঠালেন ধনুর্যজ্ঞের ছলে কৃষ্ণকে মথুরায় দিয়ে আসতে, তখন তিনি অক্রূরকে বলছেন—দেখ বাপু, তুমি যদি বসুদেবের কাছ থেকে কোন কান-ভাঙানি না খেয়ে থাক, তবে তুমি আমার এই প্রিয়কার্য সাধন কর—যদি বা নোপজপ্তোহসি বসুদেবেন সুব্রত। অক্রূর কুরু মে প্রীতিমেতাং পরমদুর্লভাম্ ॥[১৯] স্বয়ং কংসের পিতা উগ্রসেন, যিনি প্রকাশ্যেই কংসের বিরোধী ছিলেন, তিনিও হয়তো কিছু মদত পেয়ে থাকবেন অন্যান্য ভোজরাজন্য বৃদ্ধদের কাছে। কংস মারা যাবার পর বৃদ্ধ বয়সে উগ্রসেনের পুনরায় রাজপদে অভিষেক আমাদের মনে সন্দেহজনক প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। উগ্রসেনকে রাজা করার ব্যাপারে কৃষ্ণ স্বয়ংই ছিলেন অতিরিক্ত আগ্রহী। এবং এই রাজ্যাভিষেকের পূর্বে দু-একটি ঘটনা এই সন্দেহকে আরও ঘনীভূত করে। কংস মারা যাবার পর কংসের দুঃখিনী মাতা অত্যন্ত বিলাপ সহকারে লঙ্কেশ্বর রাবণের একটি উক্তি স্মরণ করেছিলেন। রাবণ নাকি বলেছিলেন—যে আমি দেবতাদেরও মেরে ফেলতে পারি, তারও আপন বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে ভয় অনিবার্য। কংসের রাজপদের ক্ষেত্রেও তাঁর জ্ঞাতিগুষ্টিরাই ছিল লুব্ধ, তাই জ্ঞাতিগুষ্টিদের হাতেই তাকে মরতে হল—তথৈব জ্ঞাতিলুব্ধস্য মম পুত্রস্য ধীমতঃ। জ্ঞাতিভ্যো ভয়মুৎপন্নং শরীরান্তকরং মহৎ ॥[২০]

দ্বিতীয়তঃ কংসের মা যখন কাঁদতে কাঁদতে উগ্রসেনকে সমদুঃখিত করার চেষ্টা করলেন তখন উগ্রসেনও যেন একেবারে গলেই গেলেন। তাঁর এমন শ্মশান-বৈরাগ্য উপস্থিত হল যে তিনি কংসের চিতাগ্নি স্থাপনের পর সপরিবারে বনেই চলে যেতে চাইলেন—সম্নুষোহহং সভার্যশ্চ চরিষ্যামি মৃগৈঃ সহ। শত্রুপক্ষ হলেও কৃষ্ণ যেন কংসের অন্তিম সংস্কারের ব্যবস্থা করেন—এই ছিল উগ্রসেনের কামনা। হরিবংশ কিন্তু জানাচ্ছে উগ্রসেনের এই বৈরাগ্য এবং কংসপ্রীতি দেখে কৃষ্ণ অত্যন্ত বিস্মিত হলেন—এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য কৃষ্ণঃ পরমবিস্মিতঃ।[২১] অর্থাৎ উগ্রসেনের পূর্বকথার সঙ্গে পরের ব্যবহারটি যেন মেলে না। এর পর কংসের প্রেতকার্য হয়ে গেলেই উগ্রসেন রাজা হন।

উল্লিখিত দুটি ঘটনাই প্রমাণ করে যে পিতা হলেও উগ্রসেন একেবারে নিষ্কাম ঘৃতশুদ্ধ ছিলেন না। 'ভোজরাজন্যবৃদ্ধ'দের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরও কিছু অভিসন্ধি

ছিল। আবার, যে অক্রূরকে কংস পাঠালেন কৃষ্ণ-বলরামকে মথুরায় নিয়ে আসবার জন্য, সেই অক্রূরকেও কৃষ্ণ স্বপক্ষে জিতে নিলেন এক অদ্ভুত উপায়ে। লক্ষণীয় এই যে, অক্রূর কংস-সভার এক বিশ্বস্ত মন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণের অনুরক্ত ছিলেন এবং এটিও একটি সন্দেহজনক কথা। ভাগবত পুরাণে দেওয়া ধারণা অনুযায়ী অক্রূর যখন কৃষ্ণকে মথুরায় নিতে এলেন, কৃষ্ণ তখন বার বছরের কিশোর। তবে তিনি যে সেই সময় একেবারে নটবরটি ছিলেন, তা আমরা মনে করি না। সেই সংকটময় মুহূর্তে যে বুদ্ধির পরিচয় তিনি দিয়েছেন, তাতে বেশ বোঝা যায় তখনকার রাজনীতি তিনি কতটা বুঝতেন। মনে রাখতে হবে কংসের আহ্বানে—উঠল বাই তো কটক যাই—এই নীতিতে কৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গেই কংসের দরবারে ছোটেননি। অক্রূরের মধ্যে অল্প হলেও যে বিভীষণবৃত্তি ছিল, তার সম্পূর্ণ সুযোগ কৃষ্ণ গ্রহণ করেছেন। অধিকন্তু অক্রূরের দিক থেকে তাঁর প্রতি যে অনুরক্তিটুকু ছিল তা কৃষ্ণ আরও বাড়িয়ে তুললেন অক্রূরের সঙ্গে একটি মেয়ের বিয়ে দিয়ে। এমন একটি মেয়ের সঙ্গে তিনি অক্রূরের বিয়ে দিলেন, যাতে অক্রূর মনে মনে কৃতজ্ঞ হয়ে রইলেন কৃষ্ণের কাছে।

মহাভারতের সভাপর্বে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলছেন—কংস বড় বেড়ে উঠেছিল। ভোজরাজন্যবৃদ্ধেরা জ্ঞাতিত্রাণের ইচ্ছায় যখন বার বার আমাকে এই ব্যাপারে উত্ত্যক্ত কবতে লাগলেন তখন আমি অক্রূরের সঙ্গে আহুকের মেয়ে সুতনুর বিয়ে দিয়ে দিলাম এবং বলরামের সহায়তায় কংসকে হত্যা করলাম।[২২]

মজা হল, আহুক উগ্রসেনের বাবা, কংসের পিতামহ। আর কৃষ্ণমাতা দেবকীর সম্বন্ধে আহুক হলেন কৃষ্ণের প্রমাতামহ। কাজেই কৃষ্ণের পক্ষে মাতামহীর সমান কোন কন্যার সঙ্গে অক্রূরের বিয়ে ঠিক করার ব্যাপারটা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। মহাভারতে যাকে আহুকের মেয়ে বলা হয়েছে সে আসলে আহুকের ঘরের মেয়ে, অন্তত মহাভারতের আশয় তাই।[২৩] দেখা যাক হরিবংশ এ ব্যাপারে কি বলে?

হরিবংশ দু-জায়গায় জানিয়েছে অক্রূরের বিয়ে হয়েছিল উগ্রসেনের মেয়ের সঙ্গে। হরিবংশের বৃষ্ণিবংশ বর্ণনায় দেখি অক্রূর উগ্রসেনা সুগাত্রির গর্ভে প্রসেন ও উপদেব নামে দুটি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন—অক্রূরেণোগ্রসেনায়াং সুগাত্র্যাং কুরুনন্দন। আবার স্যমন্তক মণি প্রসঙ্গে এই মেয়েটির নাম না করে হরিবংশ বলেছে অক্রূর উগ্রসেনীর গর্ভে প্রসেন এবং উপদেব নামে দুটি পুত্র উৎপাদন করেন—অক্রূরেণোগ্রসেন্যাং তু সুতৌ দ্বৌ কুরুনন্দন। হরিবংশের সুগাত্রি আর মহাভারতের সুতনু—এই দুই নামের অর্থে কোন ভেদ নেই। শ্রীজীব ন্যায়তীর্থমশাই তাঁর হরিবংশের বঙ্গানুবাদে সুগাত্রি নামটির অর্থ করে 'সুন্দরাঙ্গী' করে দিয়েছেন; কিন্তু তিনি যদি তাঁর আপন হাতের বিষ্ণুপুরাণের সংস্করণটি খেয়াল করতেন তাহলে দেখতেন—সেখানে পরিষ্কার লেখা আছে—উগ্রসেনের কংস সুনামা ইত্যাদি ন'টি ছেলে আর তাঁর মেয়ে হল পাঁচটি—কংসা, কংসবতী, সুতনু, রাষ্ট্রপালী এবং কঙ্কী। এঁরাই হলেন 'উগ্রসেনতনুজাঃ'।

যাকে হরিবংশ বলেছে উগ্রসেনা বা উগ্রসেনী সুগাত্রি, তাকেই বিষ্ণুপুরাণ বলেছে—সুতনু উগ্রসেনতনুজা; কাজেই মহাভারতের সুতনু আহুকের মেয়ে

নয়, উগ্রসেনেরই মেয়ে। অর্থাৎ কংসের আপন বোন। কৃষ্ণমাতা দেবকী কিন্তু কংসের জ্যাঠতুতো বোন। দেবকীরা সাত বোন হলেন কংসের জ্যাঠা দেবকের মেয়ে। এঁদের সবাইকেই বিয়ে করেছিলেন কৃষ্ণপিতা বসুদেব। আগেই বলেছি, বসুদেব এবং উগ্রসেন—এই দুজনেরই হয়তো কংসের বিরুদ্ধে কোন দুরভিসন্ধি ছিল। তাই উগ্রসেনের মেয়ে, অর্থাৎ কংসের আপন বোনের সঙ্গে অক্রূরের বিয়ে হওয়ায় অক্রূরের মনে নিঃসন্দেহে এমন এক আভিজাত্যের বোধ তৈরি করেছিল, যা উল্টো দিক দিয়ে কংসের পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছিল নিঃসন্দেহে। এঁদের সঙ্গে অন্ধক, ভোজ, যাদব এবং বৃষ্ণিদের প্রধান পুরুষেরা অনেকেই কংসের বিপক্ষে চলে যাওয়ায় বন্ধুহীন কংসকে শুধুমাত্র মুষ্টির আঘাতেই ধরাশায়ী করতে পেরেছিলেন কৃষ্ণ।

একদিকে কংসবধ যেমন কৃষ্ণকে তাঁর পশ্চিমী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একক প্রতিষ্ঠা দিল তেমনি অন্যদিকে তিনি সশঙ্কিত হয়ে উঠলেন কংসের অন্য শুভানুধ্যায়ীদের সম্বন্ধে। যাঁরা রাজনৈতিক দিক থেকে কংসের পক্ষে ছিলেন, তাঁরাই তখন হয়ে উঠলেন কৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী। ঠিক এই সময় থেকেই কৃষ্ণ পাণ্ডবদের সঙ্গে গভীরভাবে যোগাযোগ করবার চেষ্টা আরম্ভ করেন। বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে দ্রৌপদীর সঙ্গে পাণ্ডবদের বিয়ে হবার আগেই কৃষ্ণের সঙ্গে রুক্মিণী এবং সত্যভামার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। হরিবংশ জানিয়েছে, স্যমন্তক মণির স্বত্ব নিয়ে কৃষ্ণের নিজের ঘরে যে গণ্ডগোল সৃষ্টি হয়েছিল তার জেরেই সত্যভামার বাবা সত্রাজিৎ মারা যান। সত্রাজিৎ মারা যাবার সময় কৃষ্ণ দ্বারকায় ছিলেন না। তিনি পাণ্ডবদের জতুগৃহে দগ্ধ হবার সংবাদ পেয়ে ছুটে গেছিলেন বারণাবতে। পিতৃবিয়োগে শোকাকুলা সত্যভামা একাই বারণাবতে গিয়েছিলেন, কৃষ্ণকে পিতার মৃত্যুসংবাদ জানাতে।[২৪] কিন্তু এ প্রসঙ্গ অন্য। কৃষ্ণ যদিও মৃত বলে আখ্যাত পাণ্ডবদের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করলেন, কিন্তু বাস্তবিক, তিনি এ খবর বিশ্বাস করেননি। তিনি সাত্যকিকে রেখে এলেন পাণ্ডবদের ভস্মীভূত দেহগুলি খুঁজে বার করবার জন্য, কেননা পাণ্ডবেরা সত্যিই মারা গেছেন না বেঁচে আছেন—এ খবর তাঁর কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কেন তার কারণটা বলি।[২৫]

সমস্ত পুরাণগুলির প্রমাণে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, কংসের মৃত্যুর পর গোটা ভারতবর্ষ রাজনৈতিক দিক দিয়ে দুই ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। কংস ছিলেন মগধরাজ জরাসন্ধের জামাই। মহাভারত খবর দিয়েছে, জরাসন্ধের দুইকন্যা অস্তি এবং প্রাপ্তি কংসের মৃত্যুর পর সোজা বাপের বাড়ি চলে আসেন এবং পিতা জরাসন্ধকে বলেন এই মৃত্যুর শোধ নিতে—পতিঘ্নং মে জহীতি। মহাভারতের তুলনায় হরিবংশের খবরটি রাজনৈতিক দিক থেকে আরও গুরুত্বপূর্ণ। হরিবংশ বলেছে, কংস কৃষ্ণের হাতে মারা পড়বার পর, শুধুমাত্র কৃষ্ণের জন্যই সমস্ত বৃষ্ণিকুলের সঙ্গে জরাসন্ধের শত্রুতা হয়ে গেল চিরকালের। জামাতা ত্বভবত্তস্য কংসস্তস্মিন্ হতে যুধি। কৃষ্ণার্থং বৈরমভবদ্ জরাসন্ধস্য বৃষ্ণিভিঃ। দ্বিধাবিভক্ত এই রাজকুলের একদিকে থাকলেন প্রবল পরাক্রমী জরাসন্ধ, অন্যদিকে ছিলেন কৃষ্ণ, যাঁর প্রধান ভরসা ছিল যাদব, অন্ধক এবং ভোজবীরেরা।

পাঠক মনে রাখবেন, কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের পরে ভারতের রাজনৈতিক

ক্ষেত্রে যদি উত্তর ভারতের প্রধান্য ঘটে থাকে, তো এই যুদ্ধের পূর্বে সর্বত্রই ছিল প্রায় পূর্ব ভারতের প্রধান্য। মগধের রাজা জরাসন্ধ ছিলেন তখনকার ভারতের হাড়-কাঁপানো রাজা। জামাই কংসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তিনি কৃষ্ণ-বলরামের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুইপক্ষ মিলে যত অক্ষৌহিণী সেন্য যুদ্ধ করেছে, জরাসন্ধ তার থেকেও বেশি সৈন্য নিয়ে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। উত্তর ভারতের রাজনৈতিক আকাশে নতুন কৃষ্ণ-নক্ষত্রটিকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য যে মিত্রশক্তির অভ্যুদয় ঘটেছিল তার প্রথমে ছিলেন শিশুপাল যিনি মোটামুটি মধ্যপ্রদেশ অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। মধ্যপ্রদেশের পূর্বেই ছিলেন করুষদেশের রাজা দন্তবক্র। ওদিকে ছিলেন কলিঙ্গের রাজা, প্রাগজ্যোতিষপুর, মানে আসামের রাজা, আর ছিলেন বাংলাদেশের রাজা পৌণ্ড্রক বাসুদেব। শেষোক্ত জনের বীরত্ব বা ক্ষমতা এমনই ছিল যে তিনি নিজেকে দ্বিতীয় বাসুদেব বলেই পরিচয় দিতেন। এছাড়া ছিলেন স্বয়ং কৃষ্ণের ভাবী শ্বশুর এবং শ্যালক—ভীষ্মক এবং রুক্মী। আর ছিলেন কৌরবেরা, যাঁরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তখনও শিশু। হরিবংশে অতি অবহেলায়, সবার শেষে জরাসন্ধের দলের পুচ্ছভাগে কৌরবদের নাম করা হয়েছে। জরাসন্ধ তাঁর বাহিনী নিয়ে মথুরা অভিযানে চললেন, প্রচুর যুদ্ধও হল। শেষে সম্মুখ যুদ্ধে কৃষ্ণ-বলরামের হাতে জরাসন্ধকে মার খাইয়ে হরিবংশকার এক অদ্ভুত বিমলানন্দ লাভ করেছেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণের ভগবত্তায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখেও আমি হলফ করে বলতে পারি—যাঁর কূটনৈতিক চালে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ মানুষ নিজের ছায়ার সঙ্গে পর্যন্ত লুকোচুরি খেলে, তিনি কিনা বোকার মত জরাসন্ধের এই বিপুল বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করবেন—এ আমি বিশ্বাসই করি না। তিনি সোজা পালিয়েছিলেন, সেই যে অংশুমতীর তীরে ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময় ঋগ্বেদের এক কৃষ্ণ যেমন পালিয়েছিল, সেই রকমই তিনি পালিয়েছিলেন। হরিবংশের এই খবর যে আমি বিশ্বাস করি না, তার কারণও আছে, জরাসন্ধের বাহিনীকে তিনি কিরকম ভয় পেতেন—সে কথা সেইখানেই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

পাঠক যদি একবার পাণ্ডবদের আহ্বানে স্বয়ং কৃষ্ণের সঙ্গেই মহাভারতের সভাপর্বে প্রবেশ করেন, তাহলে দেখবেন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের হঠাৎ চক্রবর্তী রাজা হওয়ার বাসনা জেগেছে। সরল মানুষ, তাতে প্রচুর মোসাহেব সামন্তের উৎসাহ-বাদে স্ফীত হয়ে তিনি ঠিক করলেন, রাজসূয়টা সেরে ফেলাই ভাল। ঠিক এই সময়ে কৃষ্ণ বাসুদেব এলেন পাণ্ডবদের সভায়। তিনি একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে বললেন—দেখুন দাদা যুধিষ্ঠির, আপনি রাজসূয় যজ্ঞ করবেন, এ অতি উত্তম কথা। কিন্তু তার আগে কতকগুলো ব্যাপার একটু খতিয়ে দেখা দরকার। সবার আগে ধরুন জরাসন্ধের কথা, যিনি তাঁর আপন বলবীর্যে সমস্ত রাজকুলকে দাবিয়ে রেখে তাঁদের মাথার ওপর দাঁড়িয়ে আছেন—স্থিতো মূর্ধ্নি নরেন্দ্রানাম্ ওজসাক্রম্য সর্বশঃ। আপনি জানবেন—সমস্ত রাজমণ্ডল তাঁরই পেছনে। হ্যাঁ, কিছুদিন হল আমরা কংসকে মেরে ফেলেছি বটে, তবে তার পরেই যখন জরাসন্ধ যুদ্ধোদ্যম শুরু করল, তখনই আমরা মন্ত্রীদের সঙ্গে বসে ঠিক করলাম যে, আমরা যদি আমাদের সমস্ত শাণিত অস্ত্র দিয়ে অবিশ্রান্তভাবে তিনশো বছর ধরেও জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধ করি, তবু আমরা তার সঙ্গে এঁটে

উঠতে পারব না—অনারমন্তো নিঘ্নন্তো মহাস্ত্রৈঃ শত্রুঘাতিভিঃ। ন হন্যামো বয়ং তস্য ত্রিভির্বর্ষশতৈর্ বলম্।[২৬]

প্রাঠক খেয়াল করবেন জরাসন্ধ যুদ্ধোদ্যত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু মথুরার মন্ত্রিসভায় এই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়েছিল—ভয়ে তু সমতিক্রান্তে—মানে কংসের ভয় চলে গেলে, জরাসন্ধে সমুদ্যতে—অর্থাৎ জরাসন্ধ যুদ্ধোদ্যত হলে—মন্ত্রোহয়ং মন্ত্রিতো রাজন্ কুলৈরষ্টাদশাবরৈঃ—আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। তার মানে হরিবংশের জবান এখানে ঠিক নয়। মহাভারতের সভাপর্বে কৃষ্ণ আরও বললেন—মহারাজ, শুধু কংস কেন, জরাসন্ধের ডান হাত-বাঁহাত হংস এবং ডিম্ভক নামে দুই শক্তিশালী রাজাকেও আমরা হত্যা করেছি। হংস-ডিম্ভকের মৃত্যুর পর যেটুকু সময় জরাসন্ধ বিমর্ষ হয়েছিল, সেই ফাঁকে জরাসন্ধের হানা থেকে বাঁচবার জন্য আমরা নিজেদের দেশস্থ ধন-সম্পত্তি ভাগাভাগি করে ছেলেপুলে নিয়ে আরও পশ্চিমে কুশস্থলীতে পালিয়ে গেছি—পৃথকত্বেন মহারাজ সংক্ষিপ্য মহতীং শ্রিয়ম্। পলায়ামো ভয়াৎ তস্য স্বসুতজ্ঞাতিবান্ধবাঃ ॥[২৭]

এইটেই কথা—এইটুকু বুদ্ধি কৃষ্ণের ছিল। গোঁয়ার-গোবিন্দের মত সামনাসামনি যুদ্ধ করে বীরদর্পে আত্মাহুতি দেবার লোক তিনি নন। কাজেই আবারও বলি হরিবংশের বয়ানটি বিচারসহ নয়। হ্যাঁ, জরাসন্ধ মাঝে মাঝেই তাঁর রাজ্যে হানা দিতেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণও তাঁর সঙ্গে খুব যুদ্ধ করতেন, একথা—ধোপে টেঁকে না। বরঞ্চ ভুয়োদর্শী ঝুনো রাজনৈতিক নেতার মত তিনি একটু একটু করে এগোচ্ছিলেন। ধর্মীয় কারণে কিংবা কৃষ্ণের ঐশ্বরিক মাহাত্ম্যবোধে হরিবংশকার জরাসন্ধকে কৃষ্ণের হাতে মার খাইয়ে হারিয়ে দিলেও সত্যকে একেবারে অস্বীকার করেননি। মনে রাখা দরকার কংসকে মারার জন্য কৃষ্ণকে বেশি বেগ পেতে হয়নি, কেননা যাদব, বৃষ্ণি, ভোজ—যাদের তিনি রাজা ছিলেন, তারা তলায় তলায় কৃষ্ণের সঙ্গে হাত মেলানোর ফলে রাজা হিসেবে তিনি মরেই ছিলেন। কিন্তু কংস মারা যাবার পরে জরাসন্ধ যেদিন তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে মথুরা আক্রমণ করলেন সেদিন বলরামকে বলেছেন—এই জরাসন্ধই হল আমাদের যুদ্ধ কৌশলের কষ্টিপাথর এবং আমাদের যোদ্ধা-জীবনের প্রথম অতিথিও এই জরাসন্ধ—আবয়ো র্যুদ্ধনিকষঃ প্রথমঃ সমরাতিথিঃ।[২৮] জরাসন্ধের কষ্টিপাথরে যাদব-বৃষ্ণির ক্ষমতা নঞর্থকভাবেই যাচাই হয়েছিল। তার প্রমাণ হল জরাসন্ধ একবার চলে যাওয়ার পর যখন আবার মথুরা অভিযানে ফিরে এলেন তখন জরাসন্ধের ভয়ে ভীত যাদবেরা এক জরুরী সভা ডাকলেন। বিকদ্রু বলে এক রাজনীতিকুশল ব্যক্তি যদুবংশের পূর্ব ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে শেষে বললেন—জরাসন্ধ সমস্ত রাজমণ্ডলের মাথায় বসে আছেন, তার যে অসংখ্য সৈন্যবাহিনী এবং সমর-সম্ভার, সে অনুপাতে আমাদের সমর সম্ভার নগণ্য—অপ্রমেয়বলশ্চৈব বয়ঞ্চ কৃশসাধনাঃ। তার ওপরে এই মথুরাপুরীর যা অবস্থা তাতে শত্রুসৈন্যের একদিনের অবরোধও এর সহ্য করবার ক্ষমতা নেই। না আছে খাদ্য, না আছে আগুন জ্বালাবার ইন্ধন, না আছে দুর্গ। এই মথুরার চারদিকে যে জলপরিখা আছে তার সংস্কার হয়নি বহুদিন, নগরের দ্বাররক্ষার ব্যবস্থাও নেই, চারদিকে যে প্রাচীর তাও পাকা করা দরকার।

মহারাজ কংস এসব দিকে নজরও দেয়নি, তার সৈন্যেরা শুধু ভোগ করে গেছে।[২৯]

কথাগুলি খুব যুক্তিযুক্ত। কংস জরাসন্ধের ছত্রছায়ায় রাজত্ব করে যাচ্ছিলেন, তার ওপরে তিনি জরাসন্ধের জামাই। মথুরার চারদিকে কালযবন ইত্যাদি যেসব রাজারা ছিলেন তাঁরা সবাই ছিলেন জরাসন্ধের বশংবদ। কাজেই কংসকে পুরী রক্ষার জন্য আলাদা করে কিছু চিন্তা করতে হয়নি। বিকদ্রু বললেন—কংস মারা গেছে, এ রাজ্যের এখন নবোদয়কাল, কাজেই শত্রুপক্ষের একদিনের অবরোধও এর সহ্য করবার ক্ষমতা নেই—পুরী প্রত্যগ্ররোধেব ন রোধং বিসহিষ্যতি। আমরা জানি জরাসন্ধ মথুরা অবরোধই করেছিলেন এবং বিকদ্রুর সত্য বর্ণনার নিরিখে বেশ বুঝতে পারি সে অবরোধ সহ্য করবার ক্ষমতা মথুরাপুরীর ছিল না। ঠিক এই কারণে জরাসন্ধ যতবার যুদ্ধ করতে এসেছেন, কৃষ্ণ-বলরামের সৈন্যকে তার সামনা-সামনিই যুদ্ধ করতে হয়েছে, অন্য উপায় ছিল না। এর ফল যা হয়েছে সেটা রাজনৈতিক দিক থেকে যথেষ্ট প্রণিধানযোগ্য। বিকদ্রু বললেন—আমাদের সৈন্যেরা বহু যুদ্ধের সম্মুখীন হওয়ায় সমস্ত মনোবল হারিয়ে ফেলেছে—বলং সংমর্দভগ্নঞ্চ কৃষ্যমানং পরেণ হ। এ রাজ্যের সঙ্গে সমস্ত জনগণও মারা পড়বে। তার ফল হবে সাংঘাতিক। কংসপক্ষীয় যেসব যাদবদের বিরোধিতার মুখে এই রাজ্য আমরা জয় করেছিলাম, তারা এখন বিভেদ সৃষ্টি করবে অর্থাৎ তারা বলবে—আমরা তো কংসের রাজত্বেই ভাল ছিলাম, এ আবার কি নতুন উৎপাত আরম্ভ হল। অন্যান্য রাজারাও জরাসন্ধের ভয়ে আমাদের সঙ্গে বঞ্চনা করবে। কাজেই যদি আরও একবার মথুরাপুরী অবরুদ্ধ হয় তাহলে জনগণ বলবে কৃষ্ণপক্ষীয় যাদবদের বিরোধেই আমরা মরলাম—যাদবানাং বিরোধেন বিনষ্টাঃ স্মেতি কেশব।[৩০]

এ সমস্তই রাজনীতির কথা, এবং কৃষ্ণ এর একটা কথাও অবহেলা করেননি। কৃষ্ণ বললেন—শত্রু যদি বলবান্ হয় তবে তার কাছাকাছি থাকা মোটেই উচিত নয়, অন্তত বুদ্ধিমান লোক তা থাকবে না—বরঞ্চ পালিয়ে থাকাই বাঞ্ছনীয়—বলিনঃ সন্নিকৃষ্টে তু ন স্থেয়ং পণ্ডিতেন বৈ। অপক্রমেদ্ধি কালজ্ঞঃ।...। কাজেই আমি শক্তিমান হলেও অসমর্থ মানুষের মত আপাতত পালিয়েই যাব—এবং পালিয়ে যাব জীবন বাঁচানোর জন্যে—জীবিতার্থং গমিষ্যামি শক্তিমানপ্যশক্তবৎ।[৩১]

আমরা আগেই বলেছি কৃষ্ণ পালিয়েছিলেন। হরিবংশ কৃষ্ণকে আগে একটু জিতিয়ে দিলেও পরে তাঁকে দক্ষিণ ভারতের দিকে লুকিয়ে থাকার জায়গা করে দিয়েছে। কৃষ্ণ বলেছিলেন—দরকার হলে পালাতে হবে বৈকি, কিন্তু সমর্থ হলেই যুদ্ধ করতে হবে—অপক্রমেদ্ধি কালজ্ঞঃ সমর্থো যুদ্ধমুদ্‌বহেৎ। কিন্তু এই সামর্থ্য কৃষ্ণের একদিনে আসেনি, তিনি একটু একটু করে এগোচ্ছিলেন আপন লক্ষ্যে।

সবাই জানেন দ্রুপদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কের পর থেকেই পাণ্ডবদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটছিল। কৃষ্ণও সেই সময় থেকে পাণ্ডবদের সঙ্গে উঠতে বসতে যোগাযোগ রেখে যাচ্ছিলেন, কেননা পাণ্ডব-কৌরবের ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব তখন বেশ জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। স্বয়ং কুরুরাজ দুর্যোধন কিন্তু ছিলেন জরাসন্ধের

পক্ষে। পাণ্ডবদের সঙ্গে যোগাযোগটা কৃষ্ণ আরও বাড়িয়ে তুললেন আরও একটি ছোট্ট কাজ করে। তিনি অর্জুনের সঙ্গে নিজের বোন সুভদ্রার বিয়ে দিয়ে দিলেন। এই বিয়েটা তিনি দিয়েছিলেন সমস্ত যাদব-বৃষ্ণিদের মতের বিরুদ্ধে, এমনকি দাদা বলরাম পর্যন্ত এই ঘটনায় ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুনকে 'দুর্বুদ্ধিঃ কুলপাংসনঃ' বলে গালাগালি দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরে কৃষ্ণ যখন সব বুঝিয়ে বললেন, তখন সবাই শান্ত হলেন। কৃষ্ণের রাজনৈতিক চাতুরি যে কতখানি তা বোঝা গেল, যখন এই বিয়ের ফলে যাদব, বৃষ্ণি, অন্ধক, ভোজেদের সঙ্গে পাণ্ডবদের একটা সম্পূর্ণ যোগাযোগ প্রকট হয়ে উঠল। ঠিক এই বিয়ের পরে বৃষ্ণি-ভোজবংশীয়দের সমস্ত গুষ্টিকেই দেখি কৃষ্ণ-বলরামের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের সভায় যেতে—বৃষ্ণ্যন্ধকৈস্তথা ভোজৈঃ সমেতঃ পুরুষোত্তমঃ। সুভদ্রার বিয়েতে যে যৌতুকগুলি বৃষ্ণি-অন্ধকদের তরফ থেকে যুধিষ্ঠিরের খাণ্ডবপ্রস্থে পৌঁছেছিল, তাকে এখনকার ভাষায় রীতিমত 'আর্মস-এইড' বলা যেতে পারে। সমগ্র এক অধ্যায় জুড়ে বৃষ্ণি-অন্ধক, ভোজ-যাদবদের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের প্রীতি-প্রতিগ্রহ এতবার ধ্বনিত হয়েছে যে তাতে বেশ বোঝা যায়—এ ছিল এক যৌথচুক্তির আসর, সুভদ্রার বিবাহকালের ইমন-ভূপালী সেখানে ডুবে গেছে বৃষ্ণি-অন্ধক আর পাণ্ডবদের যৌথ-মিত্রতার আকুল শব্দে।[৩২]

যে দ্রুপদের মেয়ের সঙ্গে পাণ্ডবদের বিয়ে হল, কৃষ্ণ লক্ষ্য করে থাকবেন, সেই দ্রুপদ এক সময়ে জরাসন্ধের মথুরা অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। হরিবংশ বলেছে—পাঞ্চালাধিপতিশ্চৈব দ্রুপদশ্চ মহারথঃ। আবার এই দ্রুপদের সঙ্গে কৌরবদের একসময় মনোমালিন্য হয়েছিল, তাঁর রাজ্যেরও খানিকটা ক্ষতি হয়েছিল তাতে। যখন এ ঘটনা ঘটেছিল তখনও পাণ্ডবেরা স্বনামে ধন্য হননি। দ্রোণাচার্যের গুরুদক্ষিণা দেবার তাগিদে কৌরব-পাণ্ডবেরা একযোগে দ্রুপদের রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন এবং দ্রুপদ সে অপমান মনে রেখেছিলেন কৌরবদের নামেই। কাজেই পাণ্ডবদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত যখন তাঁর মেয়ের বিয়ে হল, কৃষ্ণের পক্ষে সেটা ছিল বড়ই স্বস্তিকর। পাণ্ডবদের সঙ্গে কৃষ্ণের হৃদ্যতা ছিল আগে থেকেই, এবং দ্রৌপদীর সঙ্গে বিয়ের সুবাদে দ্রুপদ যে এবার জরাসন্ধ এবং কৌরব পক্ষের বিরোধী গোষ্ঠীতে থাকবেন এতে আর আশ্চর্য কি ? সুভদ্রার সঙ্গে মুখ্য পাণ্ডব অর্জুনের বিয়ের পর কৃষ্ণ যথেষ্ট খেয়াল রেখেছিলেন যাতে দ্রৌপদী কোনমতেই চটে না যান। দ্রৌপদীর বিয়ের পর পরই সুভদ্রার সঙ্গে অর্জুনের বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর সুভদ্রাকে সঙ্গে নিয়ে দ্রৌপদীর সামনে তাঁর দাঁড়াবার সাহস বা রুচি কোনটাই ছিল না। দ্রৌপদী প্রথম আঘাতে অভিমানভরে অর্জুনকে বলেছিলেন—তুমি চলে যাও সেইখানে, যেখানে আছেন সেই সাত্বত-বৃষ্ণিদের মেয়ে। অর্জুন অনেক বোঝালেন, অনেক সান্ত্বনা দিলেন, শেষে সুভদ্রাকে দ্রৌপদীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন একেবারে নববধূর আড়ম্বরহীন গোপবালিকার বেশে—পার্থঃ প্রস্থাপয়ামাস কৃত্বা গোপালিকাবপুঃ।[৩৩] সুভদ্রা দ্রৌপদীর কাছে এসে বললে—আমি আপনার দাসীমাত্র। খুশী হলেন দ্রৌপদী। কিন্তু এ বুদ্ধি কার ? আমরা খুব ভালভাবে জানি—এ বুদ্ধি কৃষ্ণের। শৈশব এবং প্রথম যৌবনের স্মৃতিজড়িত গোপবালিকার বেশ যে কত সাদামাটা, সে যে পঞ্চস্বামী গর্বিতা দ্রৌপদীর কাছে নম্রতার সম্পূর্ণ আভাস দেবে—এ জিনিস

কৃষ্ণের জানা ছিল। তাই কৃষ্ণ যেমন সুভদ্রার বিয়ে দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক আখের গুছিয়ে ছিলেন, দ্রৌপদী তুষ্ট থাকায় দ্রুপদের দিকটাও তাঁকে একধরনের রাজনৈতিক সুবিধেই দিয়েছিল।

আর একটি কাজ করে কৃষ্ণ তাঁর আপন লক্ষ্যে আরও একটু এগোতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাতে যন্ত্রণা আরও বেড়েছে। এই কাজটি হল রুক্মিণীকে বিয়ে করা, যদিও এই ঘটনা ঘটেছে পাণ্ডবদের সঙ্গে যোগাযোগের আগেই। রুক্মিণী ছিলেন বিদর্ভের রাজা ভীষ্মকের মেয়ে। শিশুপালের রাজ্য চেদির ঠিক দক্ষিণ দিকেই ভীষ্মকের রাজ্য। ভীষ্মকের ছেলে রুক্মী একটু গোঁয়ার গোছের মানুষ, একটু ক্রোধীও বটে। বাবা বেঁচে থাকা সত্ত্বেও যেমন দুর্যোধনের প্রতাপ বেড়ে গিয়েছিল, ভীষ্মক বেঁচে থাকতেই তেমনি রুক্মীর প্রভাব বেড়ে গিয়েছিল। রুক্মিণীর বিয়ে মানে, এক বিরাট রাজনৈতিক খেলা। কংসের মৃত্যুকে অবলম্বন করে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে যে রাজনৈতিক বিভাগ এসেছিল, রুক্মিণীর বিবাহকে কেন্দ্র করে সেই বিভাগটি যেন পরীক্ষিত হল। কৃষ্ণের ওপর জরাসন্ধের সম্মিলিত বাহিনীর অভিযান আসলে কিন্তু উত্তর-পশ্চিম ভারতের ওপর পূর্ব-মধ্য ভারতের রাজনৈতিক আধিপত্য পুনঃ স্থাপনের প্রয়াস।

আমি যে মাঝে মাঝে পূর্ব ভারত এবং উত্তর ভারতের দ্বন্দ্বের কথাটা তুলছি তার একটা সুনির্দিষ্ট কারণ আছে। একথা তো নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে কৃষ্ণের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই একটা বিরাট পরিবর্তন এসেছে। মহাভারতের কবির পূর্ব প্রতিজ্ঞা ছিল, তিনি আর্য ভূখণ্ডে দুই বিবদমান আর্যগোষ্ঠীর দ্বন্দ্বের মাধ্যমে মহত্তর পক্ষের ক্রমিক প্রতিষ্ঠা দেখাবেন। কিন্তু তার জন্য তাঁর প্রধান প্রয়োজন ছিল অতিসমৃদ্ধ এবং পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির অবক্ষয় দেখানো। মহাভারতের রাজসূয় পর্ব (যার ফলে যুধিষ্ঠির একবার কিছুদিনের জন্য রাজা হবার সুযোগ পেয়েছিলেন) এবং ভারত যুদ্ধ—এই দুটিই প্রধানত রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ইতিহাস। কিন্তু মহাভারতে যেহেতু কৌরব-পাণ্ডবদের কথাই প্রধান, তাই যেকোন প্রসঙ্গেই তাঁদের কথা এসেছে। কিন্তু এরই মধ্যে পূর্বতন প্রতিষ্ঠিত রাজমণ্ডলের শক্তি এবং ক্ষমতাবৈচিত্র্য যে কতখানি সেদিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করতে মহাভারতের কবি ভোলেননি। রাজসূয় পর্বে যুধিষ্ঠিরের সামনে কৃষ্ণের বক্তৃতাটি তো এ বিষয়ে প্রথম প্রকাশ্য অধিবেশন। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখবেন, তারও আগের দু-একটি পর্যায়ে মহাভারতের কবি সেইসব রাজশক্তির কথা উল্লেখ করেছেন অত্যন্ত নিপুণভাবে—যে সব রাজারা একান্তই জরাসন্ধের বন্ধু এবং দোসর। একথা ঠিক যে, উত্তর ভারতে কাশ্মীর থেকে আরম্ভ করে গান্ধার, কেকয়, মদ্র, কুরু, কাশী, কোশল—এ সমস্ত দেশের রাজারাই জরাসন্ধের কথায় উঠতেন বসতেন, কিন্তু এরা ছিলেন প্রধানত জরাসন্ধের ভয়ভীত। জরাসন্ধের আসল শক্তি ছিল পূর্ব এবং মধ্য ভারত, যেসব দেশের রাজারা ছিলেন জরাসন্ধের সুখদুঃখের সমমর্মী। সমমর্মিতার কথা পরে আসবে, রাজনৈতিক আখের গুছোনোর ব্যাপারে সমসাময়িক বিবাহগুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম। রুক্মিণীর বিবাহ-বিবরণ একান্তই হরিবংশনির্ভর। এই বিবাহ প্রসঙ্গে রুক্মিণীর স্বয়ংবরে যেসব রাজাদের আমরা জরাসন্ধ-পক্ষে মিলিত হতে দেখব, তাদের

আরও কোন পূর্বসম্মেলনী মহাভারতে দেখা যায় কিনা তার একটা চেষ্টা আমাদের করতেই হবে।

পাঠক চলে আসুন দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায়। লক্ষ্যবেধের ঠিক পূর্বে দ্রৌপদীর ভাই ধৃষ্টদ্যুম্ন সভায় সমাগত রাজবৃন্দের নামগুলি পড়ে পড়ে শোনাচ্ছিলেন। মহাভারতের কেন্দ্রবিন্দু এবং প্রধান প্রতিনায়ক যেহেতু দুর্যোধন, তাই তাঁর কথাই প্রথমে এল, এল তার সাঙ্গোপাঙ্গের কথাও। ধৃষ্টদ্যুম্ন বিরাট রাজার সপুত্র আগমন সংবাদ দিলেন এবং আরও কয়েকজন অবান্তর নৃপতির নামকরণের পরেই ধৃষ্টদ্যুম্ন যাঁদের নাম কীর্তন করলেন তাঁরা হলেন বঙ্গদেশের রাজা এবং যুবরাজ—সমুদ্রসেন পুত্রশ্চ চন্দ্রসেনঃ প্রতাপবান্। তখনকার বঙ্গকে এখনকার বঙ্গের সঙ্গে মেলালে চলবে না। তখনকার বঙ্গ মানে অখণ্ড বাংলার নদ-নদী সঙ্কুল নীচের দিকটা, উত্তর-পূর্বে যার সীমা প্রায় ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত। ভীম যখন রাজসূয় যজ্ঞের কাজ সারতে পূর্ব দিক জয় করতে গেছিলেন, সেখানে মহাভারতকার লিখেছেন—বঙ্গরাজের রাজ্য আক্রমণ করে তিনি প্রথমে সমুদ্রসেনকে জয় করলেন তারপর চন্দ্রসেনকে আক্রমণ করলেন—সমুদ্রসেনং নির্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবম্। কাজেই ধৃষ্টদ্যুম্ন আপাতত কোন দেশের নাম না করলেও বেশ বুঝি এঁরা বঙ্গদেশের রাজা-মহারাজা। ধৃষ্টদ্যুম্নের লিস্টিতে তারপরেই নাম এল জলসন্ধ এবং তার পুত্র দণ্ড এবং বিদণ্ডের। (অন্যমতে দণ্ডধার)। এরা 'মাগধ' কিন্তু ঠিক জরাসন্ধের মগধজাত নয়, মনে হয় মগধের ঠিক আশপাশের লোক, তবে রাজা বটেই। এদের পরেই যাঁর নাম শোনাতে হল তিনি বিখ্যাত পৌণ্ড্রক বাসুদেব—পুণ্ড্রবর্ধনের রাজা।

মহাভারতের আমলে বঙ্গ, সুহ্ম, তাম্রলিপ্ত, অঙ্গ (যার খানিকটা আজও রাঢ়ভূমিতে সংলগ্ন) হরিকেল (সিলেট অঞ্চল) এবং পুণ্ড্রবর্ধন—এই সব দেশই ছিল আলাদা। এদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিধর রাজা ছিলেন পৌণ্ড্রক বাসুদেব, যিনি কৃষ্ণের সমান ক্ষমতাশালী বলে নিজেকে মনে করতেন। তাঁর উপাধিও ছিল বাসুদেব। রাজসূয় যজ্ঞের আগে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে লম্বা-চওড়া যে বক্তৃতাটি দেন, তাতে পূর্ব ভারতীয় কতকগুলি রাজার নাম করে তাঁদের অসামান্য ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সতর্ক করে দেন কৃষ্ণ। এই রাজাদের মধ্যে অন্যতম হলেন পৌণ্ড্রক বাসুদেব, যিনি বঙ্গ-পুণ্ড্র-কিরাতেষু রাজা বলসমন্বিতঃ। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় এবার পৌণ্ড্রক বাসুদেবের নাম পেশ করলেন, উল্লেখ করলেন আসামের রাজা নরকাসুরের প্রতিনিধি এবং ছেলে ভগদত্তের কথাও। তারপর এক নিঃশ্বাসে—'কলিঙ্গ স্তাম্রলিপ্তশ্চ পত্তনাধিপতি'র প্রসঙ্গ তুলেই বৃষ্ণিবীর এবং অন্যান্যদের কথায় এলেন। একেবারে সবার শেষে যাদের নাম দিয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নের 'রাজনামকীর্তন' শেষ হল তাঁরা হলেন শিশুপালশ্চ বিক্রান্তো জরাসন্ধস্তথৈব চ।[৩৪]

ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে দ্রৌপদীর বিবাহসভায় যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের এক বৃহদংশে ছিলেন পূর্ব এবং মধ্যভারতের রাজারা। আবার যখন লক্ষ্যভেদ হচ্ছে সেখানেও দেখা যাবে, একটি বাক্যে যেমন কর্ণ, দুর্যোধন, শাল্ব, শল্য, অশ্বত্থামার নাম করা হচ্ছে, তেমনি 'কলিঙ্গ বঙ্গাধিপপাণ্ড্য পৌণ্ড্রাবিদেহরাজো যবনাধিপশ্চ—এইসব অনার্য রাজাদেরও নামপরের মুহূর্তেই

করতে হচ্ছে। লক্ষ্যবেধের অনুষ্ঠানে দ্রৌপদী কর্ণকে বরণ করার ব্যাপারে অনীহা দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে যিনি আসন ছেড়ে ধনুঃস্পর্শ করলেন তিনি চেদিরাজ শিশুপাল, তারপরেই জরাসন্ধ। হ্যাঁ অর্জুনই শেষ পর্যন্ত ধনুর্বেধে সফল হলেন, কিন্তু মহাভারতকারকে সেইসব নরপতির নাম আগে করতে হয়েছে যাঁরা শুধু পূর্বতন নন, যাঁরা তখনকার প্রতিষ্ঠিত রাজকুলের প্রধান।[৩৫] ধনুক তুলতে গিয়ে যখনই তাঁদের জানু বেঁকে পড়েছে মাটিতে, মহাভারতকার তখনই বুঝিয়েছেন এঁদের সময় হয়ে গেছে শেষ করবার। অন্য দিকে অর্জুনের সফলতায় পরিষ্কার হয়ে গেছে নবোদিত পাণ্ডবদের বৃদ্ধির আভাস। আগেই হরিবংশের বিকদ্রুর বক্তৃতায় উল্লেখ করেছি কংসের মৃত্যুর পর নবোদিত মথুরার রাজশক্তি 'যদুমুখ্য'দের কথা। নবোদিত প্রধান হিসেবে কৃষ্ণের সঙ্গে আরেক নবোদিত শক্তি পাণ্ডবদের 'আঁতাত' লক্ষ্য করার মত। যাক সে কথা, কেননা আরও লক্ষণীয় বিষয় হল দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় পূর্বমধ্য ভারতের যে রাজশক্তিগুলিকে একত্রিত দেখেছি দ্রৌপদী-বিবাহের আরও অনেক আগে রুক্মিণী স্বয়ংবরে সেই রাজপুরুষদেরই দেখেছি একেবারে যোদ্ধার বেশে। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরের সময়ে কৃষ্ণ যেহেতু আরও প্রতিষ্ঠিত তাই দেখছি ধনুর্বেধে ব্যর্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জরাসন্ধ সভা ছেড়ে আপন রাজ্যে চলে গেছেন—তত উত্থায় রাজা স স্বরাষ্ট্রাণ্যভিজগ্মিবান্। রুক্মিণীর বিয়ের সময় কিন্তু তা হয়নি।

কংসের মৃত্যুর পর জরাসন্ধ কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযান করেছিলেন, সেই অভিযানে যেসব বিক্রান্তনরপতির নাম হরিবংশকার করেছিলেন, সেই সমস্ত নরপতিকেই আবার দেখা যাবে রুক্মিণীর স্বয়ংবর অভিযানে সামিল হতে। হরিবংশের বয়ান মত রুক্মিণীর বিয়ের আগে জরাসন্ধ রীতিমত একটি সভা ডেকে রাজাদের একত্রিত করার চেষ্টা করলেন—নৃপান্ উদ্‌যোজয়ামাস। এই সভার প্রথম 'অ্যাজেন্ডা' ছিল—শিশুপালের সঙ্গে রুক্মিণীর বিয়ে। এই বিয়ের ঘটকালি করে তিনি নিজে ভীষ্মকের কাছে শিশুপালের জন্য প্রস্তাব দেন এবং এই প্রস্তাব সমর্থন করেন বাংলাদেশের রাজা মহাবলী পৌণ্ড্রক বাসুদেব—অনুজ্ঞাতশ্চ পৌণ্ড্রেণ বাসুদেবেন ধীমতা। জরাসন্ধ সভার দ্বিতীয় 'অ্যাজেন্ডা' নিশ্চয়ই ছিল—যুদ্ধের 'স্ট্র্যাটিজি' ঠিক করা, যা কার্যক্ষেত্রেই প্রমাণিত। কৃষ্ণ নিজে যেহেতু রুক্মিণীকে হরণ করার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন, তাই তাঁর দিক থেকে যুদ্ধের ভার পড়েছিল বলরাম এবং সাত্যকির ওপর, অন্যান্য বৃষ্ণি-অন্ধক-ভোজবীরেরা তো ছিলেনই।

মনে রাখতে হবে, বিয়ের আসরে এসে যুদ্ধ ভাল জমে না। হরিবংশকার তাঁর সাধ্যমত—ইনি এঁকে পাঁচটা বাণ মারলেন, উনি ওঁকে আটটি নারাচের আঘাত করলেন—এইরকম করে একটা যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন বটে, কিন্তু মহাভারতে রাজসূয় পর্বাধ্যায়ে কৃষ্ণ বারবার করে যুধিষ্ঠিরকে শুধু জরাসন্ধের ভয়ই দেখিয়েছেন এবং সে ভয় স্বীকার করতে তাঁর একটুও লজ্জা হয়নি। পরিশেষে, কৃষ্ণ দুঃখ করে যে কথাটি বলেছেন তার ভাবটি এইরকম—বড় আশা করে ভীষ্মকের মেয়ে রুক্মিণীকে বিয়ে করেছিলুম দাদা! ভেবেছিলুম তাতে করে অন্তত জরাসন্ধপক্ষীয় একটি মহাশত্রু আমার পক্ষে আসবে, কিন্তু তা আর হল না, দাদা। কৃষ্ণ আরও বললেন—ভীষ্মক আমার আত্মীয়, আমরা সবসময় তাঁর প্রিয়

সাধন করার চেষ্টা করি এবং বিনীতভাবে তার অনুগতও থাকি—প্রিয়ান্যাচরতঃ প্রহ্বান্ সদা সম্বন্ধিনস্ততঃ। কিন্তু তবু তিনি মগধের রাজা জরাসন্ধেরই ভক্ত—স ভক্তঃ মাগধং রাজা ভীষ্মকঃ পরবীরহা। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা তাঁর ভজনা করলেও তিনি আমাদের ভজনা করেন না। বরঞ্চ আমরা যা চাই না, তাই তিনি করে বেড়ান—ভজতো ন ভজত্যস্মান্ অপ্রিয়েষু ব্যবস্থিতঃ। জরাসন্ধের কীর্তি-কলাপে তিনি এতই মুগ্ধ যে তিনি নিজের কুল, বল, মান সব জলাঞ্জলি দিয়ে জরাসন্ধেরই শরণ নিয়েছেন—ন কুলং ন বলং রাজন্ অভ্যজানাৎ তথাত্মনঃ। পশ্যমানো যশো দীপ্তং জরাসন্ধমুপস্থিতঃ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, রুক্মিণীকে বিয়ে করার ফলে ভীষ্মক তো কৃষ্ণের হাতের মুঠোয় এলেনই না বরঞ্চ ভীষ্মকের বাগ্‌দত্তা রুক্মিণীকে বিয়ে না করতে পেরে শিশুপাল এবং তৎপক্ষীয় সমস্ত রাজারাই দ্বিগুণ ক্ষেপে রইলেন। এ দুঃখ মরবার আগে পর্যন্ত ভুলতে পারেননি শিশুপাল। মহাভারতের রাজসূয় যজ্ঞের সমাপ্তিতে শিশুপাল এমনভাবেই কৃষ্ণকে তিরস্কার করেছেন, যাতে পরিষ্কার মনে হবে রুক্মিণী ছিলেন তাঁরই জন্য নির্ধারিত বধূটি। একে এই অপমান, তার ওপরে কৃষ্ণেরই সঙ্গে রুক্মিণীর বিয়ের মত নুনের ছিটে—এ সব কিছুই ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা বাড়িয়েই তুলল, কমাল না।

পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞের আগে কৃষ্ণের মুখে জরাসন্ধ সম্বন্ধে একাধিকবার যে ভীতি এবং উৎকণ্ঠা ধ্বনিত হয়েছে, তা যে একেবারেই অমূলক নয়—তার প্রমাণ পাণ্ডবদের রাজসূয় পর্যন্ত কৃষ্ণ যা কিছুই করেছেন, তার মূল লক্ষ্য ছিল জরাসন্ধের শক্তি কমানো। পাণ্ডবদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগও মূলত জরাসন্ধের কারণেই। রাজসূয়ের আগে যুধিষ্ঠিরের কাছে যে বক্তৃতাটি কৃষ্ণ দেন, তাতে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, মধ্য-পূর্ব ভারতের যৌথ সমরসজ্জার বিরুদ্ধে যদি কোন ফল পেতে হয় তাহলে জরাসন্ধকে সরাতে হবে আগে। তাঁর অতিমিত সুসার বক্তৃতার মধ্যে কৃষ্ণ দেখিয়েছেন তাঁর মূল লক্ষ্যে পৌঁছোতে আর কতটুকু বাকি, কি কি কাজ তিনি এর মধ্যেই করেছেন এবং কোন কোন কাজে তিনি পাণ্ডবদের মদত চান। কৃষ্ণ জানিয়েছেন, হংস-ডিম্ভক নামে যে দুই বিখ্যাত নরপতি জরাসন্ধের মিত্রপক্ষে ছিলেন তাঁদের একজন মারা পড়েন বলরামের হাতে, অন্যজন তাঁরই শোকে 'সুইসাইড' করেন। এই দুজনের মৃত্যুর খবর শুনে জরাসন্ধ শূন্যমনে আপন পুরীতে প্রবেশ করেন—পুরং শূন্যেন মনসা প্রযযৌ। কৃষ্ণ ভেবেছিলেন এইভাবে আর দু-চারটি শক্তিশালী নরপতিকে যদি জরাসন্ধের কক্ষচ্যুত করা যায় তাহলে জরাসন্ধ আরও শক্তিহীন হয়ে পড়বে এবং তাঁর মনোবলও ভেঙে যাবে। ঠিক এই জন্যেই তিনি প্রাগজ্যোতিষপুর মানে আসামে অভিযান চালান। প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজা তখন ছিলেন নরক এবং এরই প্রত্যন্ত দেশের রাজা ছিলেন মুরু। মহাভারত এবং পুরাণে মুরু 'দৈত্য' বলে পরিচিত, নরক 'অসুর' বলে। তাঁদের এই 'দৈত্য' এবং 'অসুর' উপাধি হয়তো শুধুমাত্র অনার্য অধ্যুষিত প্রত্যন্ত পূর্ব ভারতের রাজা বলেই এবং হয়তো বা শক্তিমত্তার উপাধিও বটে। নরক জরাসন্ধের মিত্রপক্ষে ছিলেন বহুকাল ধরেই এবং তিনি এত শক্তিশালী ছিলেন যে আর্যদের ধনসম্পত্তি লুঠতরাজ করতেন মাঝে মাঝেই, আর্যদের সুন্দরী সুন্দরী রমণীরাও এই লুঠের আওতা থেকে বাদ

যেত না। হরিবংশে এবং বিষ্ণুপুরাণে দেখি শতাধিক ষোল হাজার রমণী নরকাসুরের অন্তঃপুরে মণিপর্বতের গুহায় লুকানো ছিল এবং এঁদের বেশির ভাগই ছিল দেব-রমণী। এ ছাড়াও বরুণদেবের বিখ্যাত ছাতাটি, খোদ দেবমাতা অদিতির মকর-মার্কা কানপাশা দুটি এ সবই নরকাসুরের লুণ্ঠিত সামগ্রীর কিছু কিছু। কৃষ্ণ যে নরকাসুর এবং মুরুকে মেরে ফেলেছিলেন, তাতে জরাসন্ধের শক্তিহীনতা ছাড়াও, তার উপরি পাওনা হয়েছিল নরকাসুরের লুণ্ঠিত সামগ্রীগুলি। পাঠক মনে রাখবেন—জরাসন্ধের ভয়ে ভীত কৃষ্ণ তখন সদ্য সদ্য দ্বারকাপুরী নির্মাণ করিয়েছেন। একটুও বাড়িয়ে বলা হবে না, যদি বলি—শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী দ্বারকার অর্ধেক সাজ-সজ্জাই পূর্বভারতের দৌলতে, এমনকি তাঁর ষোল হাজার মহিষীর সবগুলিই প্রায় আমাদের পাড়ার। সেকালে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ, পুণ্ড্রবর্ধন, সুক্ষ্ম, মগধ এবং কামরূপ এদের একটির সঙ্গে আরেকটি যেমন ঐতিহাসিক মিল ছিল তেমনি মিল ছিল সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক ভাবনায়। পুণ্ড্রবর্ধনের রাজা পৌণ্ড্রক বাসুদেবের রাজ্যসীমা ছিল উত্তরবঙ্গের প্রান্তে করতোয়া পর্যন্ত। ঠিক তার পাশেই কামরূপ রাজত্ব করতেন তাঁরই অভিন্নহৃদয় বন্ধু নরকাসুর (নরক রাজার অসুর উপাধিটি উত্তর ভারতীয়দের বরে)। আসামে আসবার পর কৃষ্ণের প্রথম কাজ যদি হয়ে থাকে নরকাসুরকে বধ করা, তাহলে তাঁর দ্বিতীয় কাজই ছিল নরকাসুরের সংগৃহীত সমস্ত বহুমূল্য সামগ্রী দ্বারকায় নিয়ে যাওয়া। পরাজিত রাজার সমস্ত ধন-সম্পদ বিজেতা রাজা লুণ্ঠন করেন, এই নিয়ম। কিন্তু লুণ্ঠনের এত সামগ্রী, এত বৈচিত্র্যের কথা বোধ হয় আর কোথাও নেই, যতখানি পাওয়া যায় আমাদের এই প্রতিবেশীর রাজ্য লুণ্ঠনে। হরিবংশের জবানীতে দেখি, নরকাসুরের কোষরক্ষকেরা সব কিছু, এমনকি অন্তঃপুরের রমণীদের পর্যন্ত হতশ্রী করে সমস্ত রত্ন কৃষ্ণের সামনে বিছিয়ে দিয়ে বলেছিল—যা আপনার অভিরুচি, তাবতীঃ প্রাপয়িষ্যামো বৃষ্ণ্যন্ধকনিবেশনে—সব পাঠিয়ে দেব দ্বারকায়। প্রথমদিকে শ্রীকৃষ্ণ, অনেক জিনিসই যেন 'ডুপ্লিকেট' হয়ে যাচ্ছে, এমন একটি ভাব দেখিয়ে রত্নগুলি পরীক্ষা করতে লাগলেন—পরিগৃহ্য পরীক্ষ্য চ। পরিশেষে সর্বম্ আহরয়ামাস দানবৈ র্দ্বারকাং পুরীম্। দ্বারকাপুরী তখন কেবল তৈরি হয়েছে, কাজেই নরকাসুরের ধনরত্নে আপন রাজধানীর অন্তঃসজ্জার পরিকল্পনাটি মনে মনে ছকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ঢুকলেন মণিপর্বতে। এই পর্বতেই নাকি নরকাসুর লুকিয়ে রেখেছিলেন ষোল হাজার রমণী-মণি, যাদের তিনি ধরে এনেছিলেন দেবতা আর গন্ধর্বদের কাছ থেকে (উত্তরভারত থেকে নয়তো?) কৃষ্ণ তাঁদের বিয়ে করার জন্য সম্পূর্ণ পর্বতটি ধরে উঠিয়ে নিলেন গরুড়বাহনে। কৃষ্ণের সঙ্গে পরে বিয়ে হবে বলে হরিবংশকার এই রমণীদের—দেব-গন্ধর্ব কন্যা, ব্রত-উপবাসে তন্বঙ্গী তথা কুমারী করে রেখেছেন এবং প্রতিবেশী রাজার চরিত্র রক্ষার্থে আমরাও তাই বিশ্বাস করতে ভালবাসি।

এইসব রমণী চরিত্রের কথা পরে আসবে। এমন কি দ্বারকার সাজসজ্জার কথাও থাক। নরকাসুরের পরে এবং রাজসূয় যজ্ঞের আগে কৃষ্ণ আর যাকে নিকেশ করলেন, তিনি হলেন কালযবন। আমরা এর কথা একবার আগে বলেছি। বলেছি যে, আমাদের সন্দেহ হয়—যদুকুলের ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ গর্গের

(গার্গ্যের) ঔরসে গোপালিকার গর্ভে জাত কালযবন কৃষ্ণের জ্ঞাতিগুষ্ঠিরই কেউ হবেন। জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গর্গ তাকে সঁপে দেন অপুত্রক এক যবন রাজার হাতে। কালযবন তাই যবনদেশেরই অধিপতি। ইনি কোন দেশের রাজা ছিলেন বলা কঠিন, তবে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম প্রত্যন্ত দেশগুলিতে যবনদের আধিপত্য ছিল, এ কথা ঐতিহাসিকেরাও স্বীকার করেন।[৩৬] সেই দৃষ্টিতে কালযবন ওইরকম কোন দেশের রাজা ছিলেন হয়তো। কিন্তু যে দেশেরই রাজা তিনি হোন না কেন, তিনি মহারাজ জরাসন্ধের বিক্রম-মুগ্ধ ছিলেন। হরিবংশ কিংবা বিষ্ণুপুরাণ থেকে বেশ বোঝা যায় জরাসন্ধের সঙ্গে কালযবনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল না, জরাসন্ধের সম্মিলিত বাহিনীতেও তাকে দেখা যায়নি।

যে সময়টা জরাসন্ধ বারবার মথুরা আক্রমণ করেও কৃষ্ণকে প্রতিহত করতে পারছিলেন না, সেই সময়েই যখন রুক্মিণী স্বয়ংবরের কথা উঠল তখন সমবেত বিবাহ-সভায় অনেকেই কৃষ্ণের শক্তিমত্তার কথা ভেবে যুদ্ধ-বিগ্রহের বিপক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। স্বয়ং জরাসন্ধও তার বশংবদ রাজমণ্ডলীকে পরীক্ষা করার জন্যই হোক কিংবা অন্য কোন কারণে বিবাহ-সভায় যুদ্ধের সম্ভাবনা তিনি পছন্দ করলেন না, উপরন্তু কৃষ্ণের সম্বন্ধে একটু ভয়ও দেখালেন। আসল কথা রুক্মিণী পিতা ভীষ্মক হয়তো কৃষ্ণের সঙ্গে আপোষে রাজি ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর ছেলে রুক্মীকে কোনমতেই স্বমতে আনতে পারছিলেন না। প্রধানত এই রুক্মীর কৃষ্ণ-বিরোধিতার সুযোগেই সৌভপতি শাল্ব, জরাসন্ধের কাছে প্রস্তাব করে বসলেন যে, যবন রাজা কালযবনকে দিয়ে কৃষ্ণকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া দরকার।[৩৭] শাল্ব ছিলেন দ্বারকার কাছাকাছি আনর্ত্তদেশের রাজা এবং জরাসন্ধের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু তিনি কালযবনের কথা তুললে পরে জরাসন্ধ যে খুব সন্তুষ্ট হলেন, তা মোটেই নয়। তিনি নিজে যে কৃষ্ণকে যথেষ্ট শিক্ষা দিতে পারেননি—এ অপমান তো সবসময়ই তাঁকে দগ্ধ করছিল, তার ওপরে শাল্বের মুখে কালযবনের প্রতিভার কথা শুনে তিনি বড়ই বিমনা বোধ করলেন—বভূব বিমনা রাজন্। হরিবংশকার পূর্বে একটি যুদ্ধক্ষেত্রে আকাশবাণী ঘোষণা করেছিলেন যে, কৃষ্ণের হাতে জরাসন্ধের মৃত্যু হবে। শাল্বের কালযাবনিক প্রস্তাবের পর সেই আকাশবাণী স্মরণ করেই নাকি তিনি বিমনা হলেন—এটি হরিবংশের মত। কিন্তু এর পরেই জরাসন্ধের বক্তব্য শুনলে বেশ বোঝা যায় যে, তাঁকে কেউ করুণা করছে—এ তিনি সহ্যই করতে পারছেন না। তিনি বললেন—আগে কোন রাজা অন্য রাজার হাতে মার খেলে আমার শরণাপন্ন হত এবং আমার সাহায্যেই তারা আবার তাদের হৃত রাজ্য, বন্দী সেনাবাহিনী—সব ফিরে পেত—

মাং সমাশ্রিত্য পূর্বস্মিন্ নৃপা নৃপভয়ার্দ্দিতাঃ।
প্রাপ্নুবন্তি হৃতং রাজ্যং সভৃত্য বলবাহনম্ ॥

আর আজকে! আজকে সেই সব রাজারাই, যাদের এককালে আমি সাহায্য করেছি—সেই সব রাজারাই আমাকে অন্যের আশ্রয় নেবার জন্য পাঠাচ্ছে—ছেনাল মেয়েছেলে যেমন নিজের স্বামীর ওপর রাগ করে অন্য পুরুষের ঘরে যায়, আপনারা তো তাই করছেন—কন্যেব স্বপতিদ্বেষাদন্যং রতিপরায়ণাঃ। আমি কি কৃষ্ণের ভয়ে আমার চেয়ে বেশি বলশালী রাজার

আশ্রয় নিতে যাচ্ছি না ? নিশ্চয়ই আমি একেবারে নিরুপায়, নইলে আমার মত লোককে অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়—নূনং যোগবিহীনো'হং কারয়িষ্যে পরাশ্রয়ম্—এর থেকে আমার মরা ভাল। আমি কিছুতেই আমার উদ্ধারের জন্য অন্য কাউকে সাধতে যাব না—ন চান্যং সংশ্রয়ে নৃপাঃ। কৃষ্ণ হোক, বলরাম হোক কিংবা যে কেউ, আমার গায়ে যে হাত তুলবে তার সঙ্গে আমিই সামনাসামনি যুদ্ধ করব—কৃষ্ণো বা বলদেবো বা যো বাসৌ বা নরাধিপঃ। হন্তারং প্রতিযোৎস্যামি.... ।[৩৮]

বেশ বুঝি, কালযবনের সঙ্গে জরাসন্ধের নিজস্ব যোগাযোগ ছিল না, কেননা প্রধানত পূর্বমধ্য ভারতের রাজারাই তাঁর হাত শক্ত করেছিলেন। উত্তর পশ্চিমের রাজারা তাঁর বিক্রম-মুগ্ধ ছিলেন, বশংবদও ছিলেন কিংবা ভীতও ছিলেন কিন্তু তাঁরা তার মনের কথা বুঝতেন না, যেমনটি বুঝতেন পৌণ্ড্রক বাসুদেব কিংবা শিশুপাল। কিন্তু তখনকার রাজনীতির ক্ষেত্রে যেহেতু কংস মারা গেছে এবং কৃষ্ণের অভ্যুত্থান ঘটেছে, সেখানে তার পশ্চিমী বন্ধু শাল্বের কথা শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে হল। রাজারা অনেক বিনয় করে জরাসন্ধকে বোঝালেন যে, শাল্বই কালযবনের কাছে দূত হয়ে যাবেন এবং যা বলার তিনিই বলবেন, জরাসন্ধকে কিছুই ভাবতে হবে না।

আসলে শাল্বের সঙ্গেই কালযবনের বেশি যোগাযোগ ছিল, কিন্তু সে যুগে জরাসন্ধকে কেউ চিনত না বা ভয় পেত না—এটা ছিল অসম্ভব। কাজেই সেদিক দিয়ে শাল্বের সুবিধেই হয়ে গেল, কারণ তিনি পশ্চিমের মানুষ আর কালযবন উত্তর পশ্চিমের। জরাসন্ধও শেষ পর্যন্ত শাল্বকে বললেন—তিনি যেন এমন নীতি প্রয়োগ করেন যাতে যবনরাজ কৃষ্ণকে আক্রমণ করেন এবং কৃষ্ণকে জয় করেন—যবনেন্দ্রঃ যথা যাতি যথা কৃষ্ণং বিজেষ্যতি। জরাসন্ধ যেহেতু শিশুপালকেই ভীষ্মককন্যা রুক্মিণীর সঙ্গে বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তাই তাঁরা চাইলেন রুক্মিণীর স্বয়ংবরের আগেই যাতে কৃষ্ণকে এই ধরাধাম থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়। সম্মুখ যুদ্ধের ইচ্ছে থাকলেও মথুরাবাসীদের সঙ্গে কালযবনের চিরন্তন শত্রুতা স্মরণ করে জরাসন্ধ আপাতত তাঁর পরাক্রমমুগ্ধ কালযবনের সাহায্যই বেছে নিলেন। শাল্ব জরাসন্ধের বার্তা নিয়ে কালযবনের কাছে পৌঁছোলেন। যবন রাজা, যিনি সেকালের আর্যনৃপতির অনেক দুর্লভ গুণও অতিক্রম করেছিলেন বলে হরিবংশ বলেছে, তিনি শাল্বের সঙ্গে রীতিমত 'হ্যান্ডসেক' করে—স হস্তালিঙ্গনং কৃত্বা, সিংহাসনে বসিয়ে বললেন—ইন্দ্রকে আশ্রয় করে যেমন দেবতারা নিরুদ্বেগ, জরাসন্ধকে আশ্রয় করে আমরাও তেমনি। সেই মহারাজ জরাসন্ধের পক্ষে কোন্ কাজটি এমন অসাধ্য হল, যে তিনি আমার মত লোকের কাছে আপনাকে পাঠিয়েছেন—কিমসাধ্যং ভবেদস্য যেনাসি প্রেষিতো ময়ি। শাল্ব বললেন এবং কালযবনকে একেবারে মাথায় তুলে দিয়েই জরাসন্ধের বার্তা শোনালেন। কাজও হল। জরাসন্ধ তাঁর সাহায্য চাইছেন, এতেই কালযবন এত সম্মানিত বোধ করলেন যে তিনি সেই দিনই কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করলেন।

কালযবন ছিলেন যবন রাজা এবং স্বভাবতই আর্যদের সঙ্গে তাঁর ভাল বনত না। কৃষ্ণ তাঁকে মেরে ফেলেন এক অভিনব কৌশলে। মজা হল, কালযবন

কিংবা জরাসন্ধ—এঁদের কারও বিরুদ্ধে কৃষ্ণ সম্মুখ যুদ্ধে সেনাবাহিনী নিয়ে লড়বার সাহস করেননি। হরিবংশের বয়ান অনুযায়ী কৃষ্ণ একসময় কালযবনকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন। একটি ভয়ঙ্কর কেউটে সাপ কলসীর মধ্যে পুরে দূতের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কালযবনের কাছে। তাঁর ইঙ্গিত ছিল—কেউটে সাপের সমান বাসুদেব কৃষ্ণের পেছনে লাগবার চেষ্টা কর না—কালসর্পসমঃ কৃষ্ণ ইত্যুক্ত্বা ভরতর্ষভ। কালযবন সব বুঝলেন এবং এও বুঝলেন—এই ফিকিরে যাদবরা তাঁকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে—যাদবৈঃ ত্রাসনং কৃতম্। উত্তরে তিনি করলেন কি—শতসহস্র বন্য পিঁপড়ে সেই কলসীর মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। সেই পিঁপড়েগুলি যখন জ্যান্ত কালসাপটিকে একটু একটু করে খেয়ে কতগুলি গুঁড়োর মত বস্তু অবশিষ্ট রাখল—ভক্ষ্যমানঃ কিলাঙ্গেষু—তখন সেই কলসীর মুখ আবার বন্ধ করে কালযবন কৃষ্ণের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বুঝিয়ে দিলেন—তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনীর জোরে কৃষ্ণের মত কেউটে সাপ গুঁড়ো হয়ে যাবে।[৩৯]

কৃষ্ণের মনে আবার ভয় ধরল, তিনি বুঝলেন তাঁর কৌশল ব্যর্থ হয়েছে—যোগং বিহতম্। মহাভারতে দেখি, তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলছেন যে, তিনি জরাসন্ধের ভয়ে কুশস্থলীতে পালিয়েছিলেন। দু-চার কথার পরে তিনি আবার বলছেন—এখন আমি দ্বারকায় পালিয়ে গেছি জরাসন্ধের ভয়ে—বয়ঞ্চৈব মহারাজ জরাসন্ধভয়াত্ তদা। মথুরাং সম্পরিত্যজ্য গতা দ্বারাবতীং পুরীম্। হরিবংশে কিন্তু দেখছি—যখন কৃষ্ণের কেউটে সাপের চাল ব্যর্থ হল এবং যখন তিনি বুঝলেন যে কালযবন পিঁপড়ে দিয়ে সাপ খাইয়ে তাঁর অশেষ সৈন্যবাহিনীর ইঙ্গিত করেছেন, তখনই কৃষ্ণ মথুরা ত্যাগ করে দ্বারকায় পালালেন—উৎসৃজ্য মথুরামাশু দ্বারকামভিজগ্মিবান্। দ্বারকায় সমস্ত যাদবদের রেখে এসে তিনি একা ফিরে এলেন মথুরায় এবং কৌশলে কালযবনকে বধ করলেন। হতে পারে মুখ্যত জরাসন্ধের ভয়েই তিনি দ্বারকায় পালিয়েছিলেন কিন্তু কালযবনের সৈন্যবাহিনীর ভয় তাঁর এই পলায়ন ত্বরান্বিত করেছিল।

তাহলে হংস-ডিম্ভক গেল, মুরু-নরক গেল, কালযবনও গেল। এদের সবাইকে শেষ করে জরাসন্ধ বধের জন্য তিনি পাণ্ডবদের মদত চাইতে এসেছেন। কেননা এইটেই জরাসন্ধ বধের প্রকৃষ্ট সময়—পতিতৌ হংস ডিম্ভকৌ কংসশ্চ সগণো হতঃ। জরাসন্ধস্য নিধনে কালোহয়ং সমুপাগতঃ। আমার ধারণা হংস-ডিম্ভক কিংবা মুরু-নরক—এঁরা যতখানি জরাসন্ধের বন্ধু ছিলেন, তার থেকেও বেশি কংসের বন্ধু ছিলেন। কাজেই এঁদের বধ করে তিনি কংসবন্ধুদের জরাসন্ধের দল ভারী করার সুযোগ নষ্ট করছিলেন। কালযবনের সঙ্গে যুদ্ধে যাবার আগে কৃষ্ণ যাদবদের বলেছিলেন—জরাসন্ধ আমাদের কোনদিন ক্ষমা করেননি এবং তিনি সদলবলে বৃষ্ণি রাজমণ্ডলের কষ্ট বাড়িয়ে তুলেছেন। কংসবধের ফলে অনেকেই আমাদের দল ত্যাগ করে জরাসন্ধকে আশ্রয় করেছে—কেচিৎ কংসবধাচ্চাপি বিরক্তাস্তদ্‌গতা নৃপাঃ।[৪০] অতএব জরাসন্ধই এখন প্রধান লক্ষ্য। মহাভারতে কৃষ্ণের বক্তৃতাটির ওপর টীকা করতে গিয়ে নীলকণ্ঠ বলেছেন—সব রাজাকে জয় করেই তবে না রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। আর সব রাজাই যেহেতু এদিক-ওদিক করে জরাসন্ধকেই আশ্রয় করে আছে,

অতএব পালের গোদাটিকে, মানে জরাসন্ধকে মারলেই সব রাজাকে জয় করা হবে—রাজজয়শ্চ প্রধান-মল্ল-নির্বহন-ন্যায়েন জরাসন্ধবধেনৈব জীয়তে। হলও তাই। কিন্তু একটি রণভেরীর শব্দও শোনা গেল না, শোনা গেল না শত-সৈন্যের পায়ে চলা কিল-কিলা শব্দ। সন্ধ্যার আলো-আঁধারে স্নাতক-বেশী তিনটি ব্রাহ্মণ সোজাপথে নগরদ্বার দিয়ে না ঢুকে চৈত্যক পর্বতের শৃঙ্গ ভেঙে সেখান দিয়ে ঢুকলেন জরাসন্ধের বাড়ির মধ্যে। তারপরের কাহিনী সবারই জানা। রাজা হিসেবে জরাসন্ধের সেই মর্যাদাবোধ এবং সমতাবোধ ছিল, যার জন্য দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তিনি কৃষ্ণ কিংবা অর্জুনের মত একটি লোককে বেছে নেননি এবং জরাসন্ধের এই মূল্যবোধ কৃষ্ণের আগে থেকেই জানা ছিল। জরাসন্ধ ভীমের হাতে প্রায় অন্যায়ভাবেই মারা পড়লেন এবং পূর্ব এবং মধ্য ভারতের মিত্রশক্তির যৌথ পতন ঘটল, মগধের রাজবাড়িতে ইন্দ্রপতনের সঙ্গে সঙ্গেই। রাজসূয় যজ্ঞ বিনা বাধায় সম্পন্ন হল। কৃষ্ণ শুধু বুদ্ধির জোরেই জিতে গেলেন এবং এ রাজসূয় যজ্ঞে পাণ্ডবদের নয়, কৃষ্ণেরই জিত হল।

রাজনীতির মধ্যেও সাধারণের মনস্তত্ত্ব বুঝতে হয় এবং সে মনস্তত্ত্ব কৃষ্ণের বুদ্ধিতে পাণ্ডবেরাও যে বুঝতে পেরেছিলেন তার পরিচয় আছে রাজসূয় যজ্ঞের দিগ্‌বিজয় অভিযানের 'স্ট্র্যাটিজি'তে। উল্লেখ্য, রাজসূয় দিগ্‌বিজয়ে পূর্ব দিক্‌টি জয় করতে পাঠানো হয়েছিল সেই ভীমকেই, যে ভীম জরাসন্ধ-বধের জন্য সারা ভারতবর্ষে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। তাছাড়া পূর্বদিকের রাজারা, যাঁদের মধ্যে শিশুপাল, পৌণ্ড্রক বাসুদেবের মত সাংঘাতিক সাংঘাতিক যুদ্ধবীরেরা ছিলেন, তাঁরা যে ভীমকে ভালবেসে চুমো খেয়ে পূজোপহার বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তা নয়, আপাতত তাঁদের মনোবল ভেঙে গিয়েছিল, জরাসন্ধ মৃত্যুবরণ করেছিলেন বলে।

রাজসূয় যজ্ঞের সময় থেকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ পর্যন্ত সময় হল চোদ্দ বছর—বার বছর পাণ্ডবদের বনবাস, এক বছর অজ্ঞাতবাস এবং এক বছর সন্ধিপ্রস্তাবের উতোরচাপান। কংস, হংস-ডিম্ভক, মুরু-নরক এবং অবশেষে জরাসন্ধ—এঁরা মারা যাবার ফলে যেমন রাজসূয় যজ্ঞে পাণ্ডবদের রাজনৈতিক সম্ভাবনা বেড়ে গিয়েছিল, তেমনি উত্তর রাজসূয়পর্বে একজন উত্তর ভারতীয় রাজা হিসেবে কুরুরাজ দুর্যোধনের সম্ভাবনাও বেড়ে গিয়েছিল। এর সবচেয়ে বড় কারণ জরাসন্ধ তখন নেই এবং চেদিরাজ শিশুপালও মারা গেলেন রাজসূয়ের সমাপ্তি অনুষ্ঠানেই। চেদিরাজ শিশুপাল জরাসন্ধের পোষ্য-পুত্রের মত ছিলেন—জরাসন্ধস্তু সুতবদ্ দদর্শৈনং জুগোপ চ।[৪১] জরাসন্ধের মৃত্যু তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারলেন না। যার জন্য রাজসূয় যজ্ঞের সভাস্থলেই তিনি কৃষ্ণকে এলোপাথাড়ি গালাগালি দিতে থাকলেন, মা-বাপ-বৌ তোলাও বাদ গেল না। সদ্য দিগ্‌বিজয়ী পাণ্ডবেরা তখনও সভাতেই আছেন এবং কৃষ্ণের ব্যাপারে কোন নিন্দাও তাঁরা সহ্য করছিলেন না, তাই কৃষ্ণ নিজেই আক্রমণ করলেন শিশুপালকে এবং শিশুপাল বেঘোরে প্রাণ দিলেন। কিন্তু তাতে লাভ কি হল ? পাণ্ডবরা আর কদিন ? পাশাখেলা-টেলার দৃষ্টান্ত ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বোঝানো সম্ভব নয়, তবে এটা জানি—যিনি পাণ্ডবদের যশ অতি সহজে ম্লান করে দিলেন, সেই দুর্যোধন কিন্তু এককালে জরাসন্ধেরই অনুগামী ছিলেন এবং একথা আমরা

আগেই উল্লেখ করেছি। কাজেই জরাসন্ধ মরিয়াও প্রমাণ করিল যে সে মরে নাই, যদিও এতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব ভারতের নেতৃত্বটি হাত বদল হয়ে চলে গেল উত্তর ভারতের হাতে। জরাসন্ধ, শিশুপালের অকাল অন্তর্ধানে একেবারে যাকে বলে, মাটি ফুঁড়ে গজিয়ে উঠলেন দুর্যোধন। কৃষ্ণপক্ষীয় পাণ্ডবেরা একবারমাত্র রাজসূয় যজ্ঞে ঝলসে উঠতেই তাদের বনবাস দিতে দেরি হয়নি দুর্যোধনের, এবং তার কারণ একটাই—ততদিনে জরাসন্ধের মিত্রপক্ষকে সম্পূর্ণ হাতে পেয়ে গেছেন দুর্যোধন। খেয়াল করে দেখবেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্রবর্ধন, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর—এই সব দেশের রাজারাই কিন্তু যোগ দিয়েছিলেন দুর্যোধনের পক্ষে। কিন্তু মজা হল, এসব দেশেও যাঁরা প্রবল পরাক্রমী দুর্দম রাজা ছিলেন—যেমন ধরুন পৌণ্ড্রক বাসুদেব, তাঁকে কিন্তু কৃষ্ণই হত্যা করেছেন এবং তা অবশ্যই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে। না হলে তিনি যে ধরনের এবং যে মর্যাদার মানুষ, তাতে ভারতযুদ্ধে তাঁর নাম অন্তত একবারের তরেও শোনা যেত।

আগেই বলেছি, জরাসন্ধের জামাই কংস যখন কৃষ্ণের হাতে মারা যান তখন জরাসন্ধের বাহিনী মথুরা আক্রমণ করলে বঙ্গ-পুণ্ড্রবর্ধনের রাজারা বন্ধুত্বের খাতিরে জরাসন্ধের অ্যালায়েড্ আর্মিতে যোগদান করেছিলেন। অনেক বিশেষণহীন রাজার মধ্যে হরিবংশ পৌণ্ড্র বাসুদেবকে বড় সম্মান দিয়ে উল্লেখ করেছে—পৌণ্ড্রকো বলিনাং বরঃ—বলবানদের মধ্যে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ। মনে রাখা দরকার তখনকার দিনের হস্তিনাপুর এখনকার দিল্লির মত ; কিন্তু তখনকার মগধ এখনকার মগধের মত হস্তিনাপুরের ধামাধরা ছিল না। বরঞ্চ আর্য সমাজের প্রধান প্রতিভূ কুরুবীর দুর্যোধনও জরাসন্ধের সম্মিলিত বাহিনীতে যোগ দিয়ে সম্মানিত বোধ করেছিলেন। হরিবংশের লিস্টিতে হাজারো রাজনামের গড্ড'লিকাপ্রবাহে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদের ক্ষীণধারাটি যেমন করে মিশেছে, তাতে স্পষ্ট বুঝি, দুর্যোধনের আহা মরি কোন মর্যাদা ছিল না এবং পাণ্ডবদের কোন নামই তখন শোনা যায় না। জরাসন্ধের পৌনঃপুনিক আক্রমণে মথুরাপুরী যখন বিধ্বস্ত হয়ে গেছে এবং কৃষ্ণ যখন দ্বারকার আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছেন ঠিক তখুনি জরাসন্ধ শিশুপালের সঙ্গে বিদর্ভরাজ, ভীষ্মকের মেয়ে রুক্মিণীর বিয়ে ঠিক করে তিনি নিজেই বরকর্তার মত সবাইকে সংবাদ পাঠালেন। জরাসন্ধ যখন বর নিয়ে বিদর্ভের বিবাহ-বাসরে পৌঁছেছেন তখনও বোধহয় তাঁর সংশয় ছিল—কাজটা ঠিক হল তো ? ঠিক এই সময়ে জরাসন্ধের দোলাচল মনের স্থিরতা নিয়ে আসলেন সেই বাঙালী রাজা পৌণ্ড্র বাসুদেব। হরিবংশ চলছে—অনুজ্ঞাতশ্চ পৌণ্ড্রেণ বাসুদেবেন—ধীমতা —পুণ্ড্রবর্ধনের রাজা বুদ্ধিমান বাসুদেব জরাসন্ধের এই কাজ সম্পূর্ণ সমর্থন করলেন। সমর্থনের ব্যাপারে অন্য কোন রাজার নাম যেহেতু এখানে আসেনি তাতে বুঝি বাংলার এই রাজা কত শক্তিশালী ছিলেন এবং একমাত্র তাঁরই অনুমোদন কত জরুরী ছিল জরাসন্ধের পক্ষে। হরিবংশ অবশ্য মহাভারতের মত না মেনে, বলেছেন তখনকার বঙ্গ ছিল জরাসন্ধেরই অধিকারে—অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গানাম্ ঈশ্বরঃ স মহাবলঃ। মহাভারত কিন্তু বলেছে পৌণ্ড্রক ছিলেন—বঙ্গ, পুণ্ড্র এবং কিরাত দেশের রাজা—বঙ্গপুণ্ড্রকিরাতেষু রাজা বলসমন্বিতঃ। পৌণ্ড্রকো বাসুদেবেতি যো'সৌ

লোকে'ভিবিশ্রুতঃ ॥ অবশ্য বঙ্গের রাজা জরাসন্ধই হোন আর পৌণ্ড্রক বাসুদেবই হোন, সমগ্র উত্তর তথা পশ্চিম ভারত এঁদের দুজনকেই যমের মত ভয় পেত। এগারো অধ্যায় জুড়ে হরিবংশের বর্ণনা পড়ে বারবার মনে হয়েছে 'বাসুদেব' নামটি ছিল সেকালের এক অতি সম্মানীয় উপাধি। বহুযুদ্ধ এবং বহুবুদ্ধির নায়ক কৃষ্ণ যেমন এই উপাধি গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি তিনি বেঁচে থাকতে নগণ্য বাংলার পুণ্ড্ররাজা এই 'বাসুদেব' উপাধিতেই ভূষিত হবেন, এ তাঁর সহ্য হয়নি। অন্যদিকে দ্বারকার সেই মদমত্তগোপাল 'বাসুদেব' নাম ধারণ করায় কৃষ্ণের সমতুল্য শঙ্খ-চক্র-ধনু-গদা সবই পৌণ্ড্রক তৈরি করেছিলেন।

দুই শক্তিশালী প্রতিবেশী—মগধের জরাসন্ধ এবং প্রাগ্ জ্যোতিষপুরের নরকাসুর মারা যাওয়ায় সাময়িকভাবে বাংলার রাজা পৌণ্ড্রক বাসুদেবের পক্ষে যুদ্ধ করার কোন মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। কিন্তু বন্ধুহানির প্রতিশোধ নিতে তিনি নিজেই এক সময় লাখো সৈন্য নিয়ে ছুটলেন দ্বারকায়। কৃষ্ণ জানতেন পৌণ্ড্রকের পক্ষে স্থির থাকা সম্ভব নয় এবং তিনি এই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিলেন। বৃষ্ণি-যাদবদের আপন দুর্গে গিয়ে দূর-প্রবাসী এই বাঙালী রাজার পক্ষে যুদ্ধ জয় করা হয়তো সম্ভব হয়নি কিন্তু জরাসন্ধ নরকাসুরের মত দুর্দম প্রতিবেশীকে পাশে না পেয়েও যে ক্ষমতা তিনি দেখিয়েছেন, তার প্রশংসা আমার থেকেও স্বয়ং কৃষ্ণই করেছেন বেশি। প্রতিশোধ স্পৃহায় রাতের অন্ধকারে যখন তিনি দ্বারকা আক্রমণ করলেন কৃষ্ণ তখন সেখানে ছিলেন না। দিশেহারা দ্বারকাবাসীদের সঙ্গে যদুকুল চূড়ামণি সাত্যকি যখন প্রায় মরতে বসেছেন, তখন কৃষ্ণ এসে পৌঁছোলেন পেছন থেকে। হরিবংশ যতই বলুন কৃষ্ণ গরুড় বাহনে 'এয়ার-ড্রপ্ট্' হয়েছিলেন, আমরা জানি আক্রমণ হয়েছিল সাঁড়াশির মত। হরিবংশে কৃষ্ণই যেহেতু শেষ কথা, অতএব পৌণ্ড্রক বধ। কিন্তু এই পৌণ্ড্রক বাসুদেবই বোধহয় একমাত্র ব্যক্তি, যাঁকে কৃষ্ণ মনে মনে পূজা করেছেন—মনসা সম্পূজ্য যদুনন্দনঃ। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যাঁকে কৃষ্ণ সামনাসামনি প্রশংসা করে বলেছেন—'অহো বীর্যম্ অহো ধৈর্যমস্য পৌণ্ড্রস্য দুঃসহম্।' পৌণ্ড্রের মৃত্যুর পর পৃথিবীতে বাসুদেব থাকলেন একজনই—তিনি উত্তর ভারতের সেই কৃষ্ণ বাসুদেব। মনে রাখা দরকার পৌণ্ড্রক বাসুদেবকে হত্যা করতে হয়েছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগেই এবং তা অবশ্যই পাণ্ডবদের জয়ের পথ সুগম করতে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বাংলা, উড়িষ্যা এবং আসাম—এরা সবাই কিন্তু দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করেছে এবং তা করেছে কৃষ্ণপক্ষে পাণ্ডব চন্দ্রের উদয় সহ্য করতে না পেরে। দুর্যোধন যেহেতু পূর্বভারতীয় সম্মিলিত বাহিনীর এককালের অংশীদার, তাই পূর্বভারতীয় রাজারা তাদের পুরানো এক আর্যবন্ধুকে সমর্থন করেছে ক্রম প্রতিষ্ঠীয়মান অন্যতর আর্যনৃপতির ধ্বংসের জন্য। অবশ্য কৃষ্ণের সঙ্গে বদ্ধ-শত্রুতাও দুর্যোধনের পক্ষে যোগ দেওয়ার অন্যতম কারণ।

পাঠকমশাই! এসব কথা আমার স্বকপোলের কল্পনা নয়। কৃষ্ণের রাজনৈতিক জীবনের পূর্বাপর বিচার করে কেউ দেখেন না; দেখলেও হরিবংশ-পুরাণগুলিকে কেউ ধর্তব্যের মধ্যে গণনা করেন না। কিন্তু 'হরিবংশ ঠাকুর' অথবা পুরাণকর্তাদের বিবরণ যদি খোদ মহাভারতের সঙ্গে মিলে যায় তবে তার সত্যতা অস্বীকার করবেন কি করে? মহাভারতের দ্রোণপর্বটি একবার

সত্যান্বেষীর দৃষ্টিতে বুঝতে হবে। দ্রোণপর্বে যখন ভীমের ছেলে ঘটোৎকচ কর্ণের হাতে মারা গেলেন, তখন পাণ্ডবেরা, বিশেষত ভীম এবং অর্জুন অত্যন্ত শোকাহত হলেন। সেই শোকাচ্ছন্ন রণভূমিতে কৃষ্ণ কিন্তু নির্বিকার। অবশ্য বিকার একধরনের ছিল সেটি আনন্দের বিকার। ঘটোৎকচের মৃত্যুতে তিনি ধেই ধেই করে নাচতে লাগলেন ; ঝড়ের তোড়ে গাছ যেমন আকাশে-ভূঁয়ে লুটোপুটি খায়, কৃষ্ণ তেমন করেই নাচতে লাগলেন—ননর্ত্ত হর্ষসংবীতো বাতোদ্ধূত ইব দ্রুমঃ। এ রকম বেহায়া নৃত্য দেখে অর্জুন পর্যন্ত তাঁকে অস্থানে আনন্দ করার হেতু জিজ্ঞাসা করে বসলেন। উত্তর পাওয়া গেল। কৃষ্ণ অবশ্য যুক্তি দেখিয়েই বললেন যে, কর্ণের কবচ-কুণ্ডল ইন্দ্র হরণ করেছেন ঠিকই কিন্তু তাতে পশ্চাত্তপ্ত ইন্দ্র তাঁকে একখানি সর্বনাশা বাণ দিয়েছেন। একাঘ্নী বাণ, যা দিয়ে পাণ্ডবদের একজনের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কর্ণের নজর যেহেতু সব সময়ই অর্জুনের ওপর, তাই অর্জুনের রক্ষা বিষয়ে তৎপর পার্থসারথি বড় চিন্তায় ছিলেন। ঘটোৎকচের ভয়ংকর আক্রমণ রোধ করবার জন্য কর্ণ অর্জুনের জন্য নির্দিষ্ট বাসবদত্ত একাঘ্নী বাণটি ছাড়লেন এবং ঘটোৎকচকে মেরেও ফেললেন। কৃষ্ণ তখন পুলকিত হয়ে অর্জুনকে বললেন—যাক বাঁচা গেল, ইন্দ্রের দেওয়া অমোঘ বাণখানি থেকে তুমি বাঁচলে। তারপর যে কথাটি কৃষ্ণ স্বীকার করলেন, তা থেকেই হরিবংশ এবং পুরাণ বিবরণের সত্যতা যাচাই হয়ে যাবে। কৃষ্ণ বললেন—এরকম অনেক কাজই আমি করেছি অর্জুন—এই যে জরাসন্ধ শিশুপাল, নিষাদরাজ একলব্য (ইনি পর্বতবাসী নিষাদদের রাজা, দ্রোণের সেই আঙুল-কাটা শিষ্য। ইনি পৌণ্ড্রক বাসুদেবের সঙ্গে দ্বারকা পর্যন্ত আসেন কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। বলরামের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে একলব্য দ্বীপে আশ্রয় নেন। তাঁর মত যুদ্ধবীরের পক্ষে এই ছিল মৃত্যু) এদের সবাইকে একজন একজন করে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগেই আমি বুদ্ধি করে মেরেছি—কিন্তু কেন? মেরেছি তোমার ভালোর জন্যে—জরাসন্ধশ্চেদিরাজো মহাত্মা মহাবাহুশ্চৈকলব্যো নিষাদঃ। একৈকশো নিহতাঃ সর্ব এতে যোগৈস্তৈস্তৈস্ত্বদ্ধিতার্থং ময়ৈব ॥

এই একেকজনের (একৈকশঃ) মধ্যে শুধু জরাসন্ধ, শিশুপাল নন, নরকাসুর, পৌণ্ড্রক বাসুদেব সবাই আছেন। অর্জুন বললেন—এর মধ্যে আবার তোমার কি বুদ্ধি কাজ করছে, আমার ভালোই বা কি? কৃষ্ণ বললেন—বাপুহে জরাসন্ধ শিশুপালেরা যদি আগেই মারা না পড়ত, তাহলে এখন তার পরিণাম দাঁড়াত ভয়ংকর—যদি ন স্যুর্হতাঃ পূর্বমিদানীং স্যুর্ভয়ংকরাঃ। দুর্যোধন অবশ্যই এই সব রথী মহারথীদের যুদ্ধে বরণ করতেন এবং জরাসন্ধ শিশুপালেরা যেহেতু চিরকালই আমাদের ওপর খ্যাপা, তাই তাঁরাও কৌরবদেরই পক্ষ নিতেন—দুর্যোধনস্তান্ অবশ্যং বৃণুয়াদ্রথসত্তমান্। তে'স্মাসু নিত্যবিদ্বিষ্টাঃ সংশ্রয়েয়ুশ্চ কৌরবান্ ॥ আর এরা সবাই এক জায়গায় হলে তার ফল কি জান? সমস্ত পৃথিবীটাকেই এঁরা জয় করে নিতে পারতেন এবং কৌরবদের রক্ষা করতেন ঠিক দেবতাদের মত। ঠিক এইখানেই আমি বুদ্ধি খাটিয়েছি, কারণ বুদ্ধি ছাড়া এদের কাউকেই যুদ্ধে জেতা সম্ভব নয়—অজয্যা হি বিনা যোগৈঃ।

জরাসন্ধের মিত্ররাজাদের মধ্যে শাল্ব, দন্তবক্র, দ্বিবিদ (যিনি নরকাসুরের বন্ধু বলে পরিচিত)—এঁরা সবাই কৃষ্ণের হাতে কিংবা বলরামের হাতে মারা পড়েছেন

এবং তা অবশ্যই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে। কৃষ্ণের 'স্ট্র্যাটিজি'টা তাই লক্ষ করার মত। পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞের পূর্ব পর্যন্ত কৃষ্ণের 'ব্ল্যাকলিস্টে' যদি জরাসন্ধ পর্যন্ত রাজারা স্থান পেয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর অন্য অনুগত বন্ধুরাও নিহত হয়েছেন ভারত-যুদ্ধের আগে এবং তাতে পাণ্ডবদেরই আখেরে লাভ হয়েছে। এমনকি ভারতযুদ্ধের মূল দায়িত্বও কৃষ্ণের ওপরেই চেপে গেছে। মহাভারতের যানসন্ধি পর্বে দেখা যাবে পাণ্ডবদের সমরসজ্জায় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছেন। এই সময় দুর্যোধন এসে তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন—ন ভেতব্যং মহারাজ—ভয় পাবেন না, জয় আমাদের হবেই। দুর্যোধন আরও বললেন—মহারাজ ! আমি যখন শুনলাম, পররাষ্ট্রের ভয়-ধরানো সৈন্যবাহিনী নিয়ে স্বয়ং কৃষ্ণ, কেকয় ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি রাজারা ইন্দ্রপ্রস্থের কাছেই বনবাসী পাণ্ডবদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন, তখনই আমি জ্ঞাতি-নিধনের ভয়ে ভীষ্ম, দ্রোণ—এঁদের কাছে গিয়ে বললাম—যখন বাসুদেব কৃষ্ণ আমাদের উচ্ছেদে উৎসুক হয়েছেন, তাতে বুঝি পাণ্ডবরাও তাহলে যুদ্ধের ব্যাপারে নিশ্চয় করেছেন—ততঃ স্থাস্যন্তি সময়ে পাণ্ডবা ইতি মে মতিঃ। সমুচ্ছেদং হি নঃ কৃৎস্নং বাসুদেবশ্চিকীর্ষতি ॥ কাজেই দেখুন ভারতযুদ্ধে কৃষ্ণ যতই অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ না করার কায়দা দেখান না কেন, দুর্যোধন ঠিক বুঝেছিলেন যে, যুধিষ্ঠির নয়, ভীম নয়, এমনকি অর্জুনও নয়, সব কিছুরই মূলে আছেন কৃষ্ণ—সমুচ্ছেদং হি নঃ কৃৎস্নং বাসুদেবশ্চিকীর্ষতি। দুর্যোধন বুঝেছিলেন—যেসব রাজারা একত্রিত হয়েছিলেন—বাকুলপরা যুধিষ্ঠিরের পক্ষে, তাঁদের মধ্যেও প্রধান হলেন কৃষ্ণ, ঠিক যেমনটি আগে ছিলেন জরাসন্ধ—তে যুধিষ্ঠিরমাসীনম্ অজিনৈঃ প্রতিবাসিতম্। কৃষ্ণপ্রধানাঃ সংহত্য পর্য্যুপাসন্ত ভারত ॥

কংসের মৃত্যু থেকে আরম্ভ করে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ পর্যন্ত ভারতবর্ষে যে বিরাট রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে তার প্রাণকেন্দ্রে যে মানুষটি ছিলেন, তাঁকে যদি 'মহাভারত সূত্রধার' বলে থাকেন ভোজবর্মা, তো আর এক প্রাচীন কবি ভারী শ্লেষের সঙ্গে বলেছেন—কানীনস্তু পিতামহঃ সমভবৎ পিত্রাদয়ো গোলকাঃ—যাদের পিতামহ (ব্যাসদেব) ছিলেন কুমারী মেয়ের গর্ভজাত পুত্র, আর বাপ-জ্যাঠারা ছিলেন বিধবার ছেলে (কারণ ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডুর বাবা বিচিত্রবীর্য অকালে মারা গেছিলেন, তাই ব্যাসের ঔরসেই ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডুর জন্ম) ; আবার তাদেরও ছেলে যুধিষ্ঠির-ভীমেরা সব হল গিয়ে অন্য পুরুষের ব্যভিচারের ফল—তৎপুত্রাশ্চ যুধিষ্ঠির-প্রভৃতয়ঃ কুণ্ডা হ্যমী পাণ্ডবাঃ ; যাদের পাঁচ ভাইয়ের একটামাত্র বৌ, যাদের আত্মীয়-স্বজন সব মরেছে যুদ্ধে—পঞ্চানাং দ্রুপদাত্মজা সহচরী যুদ্ধে হতা বান্ধবাঃ ; এইরকম ব্যভিচারের কালিমাখা বংশকেও যিনি জগতের বন্দনার পাত্র করে তুলেছেন, তিনি হলেন কৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণেন কুলং-কলঙ্কনিচিতং নীতং জগদ্‌বন্দিতম্। কাজেই সেই মহাভারতের সূত্রধারের জয় হোক। ভারতযুদ্ধের ফলাফল নিয়ে আমাদের কোন দুশ্চিন্তা নেই ঠিকই, তবে দু-একটা মোটা কথা তো থেকেই যায়। যেমন এই যুদ্ধের ফলে কৌরবদের বৃদ্ধি একেবারেই রুদ্ধ হয়ে গেল। জনমনে পূর্বাহ্নেই প্রতিষ্ঠিত পাণ্ডবেরা রাজনৈতিক দিক থেকে চরম প্রতিপত্তি লাভ করলেও ভারতযুদ্ধে তাঁরাই ছিলেন শিখণ্ডী। যুদ্ধের মূলনায়ক হলেন কৃষ্ণ—'মহাভারতসূত্রধার'। পাণ্ডবদের

অজ্ঞাতবাস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরা-অভিমন্যুর বিবাহসভাই যুদ্ধের মন্ত্রণাসভায় পরিণত হয়েছে। কৃষ্ণ যুদ্ধেরই প্রস্তাব দিয়েছেন এবং সে মত বলরাম ছাড়া আর সবাই সমর্থন করেছে। সমর্থকদের মধ্যে একটা ভরসা ছিল বৃষ্ণি-অন্ধক-ভোজবীরেরা। দ্রুপদের পুরোহিতকে দুর্যোধনের কাছে পাঠান হল যাতে তিনি অর্ধেক রাজ্য পাণ্ডবদের দান করেন। কিন্তু এ শুধু দূত পাঠানোই, যুদ্ধের দামামা তখন বেজে উঠেছে, দু-পক্ষই সৈন্যসংগ্রহে ব্যস্ত। স্বয়ং দুর্যোধন এবং অর্জুন এসে জুটেছেন কৃষ্ণের কাছে, দুজনেই কৃষ্ণের সাহায্যপ্রার্থী। সৈন্য সংগ্রহের প্রথম কল্পেই কৃষ্ণকে নিয়ে যে টানাটানি আরম্ভ হল, তাতে বেশ বোঝা যায় কৃষ্ণ তখন রাজনীতির ক্ষেত্রে কত প্রতিষ্ঠিত এবং বৃষ্ণি-অন্ধক-ভোজবীরেরা তখন কতখানি মান্যগণ্য। বিশেষত 'বেলিজারেন্ট' নিরস্ত্র কৃষ্ণকে স্বপক্ষে পাওয়ার চেয়ে বৃষ্ণি-অন্ধক-যদুবীরদের নারায়ণী সেনা দুর্যোধনের কাছে অনেক বেশি প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে। পরবর্তীকালে কৃষ্ণের মুখেই শোনা গেছে বৃষ্ণি-অন্ধকেরা যে রাজার পক্ষে থাকবেন সেই রাজাই এই পৃথিবীতে থাকবেন, যার পক্ষে বৃষ্ণি-অন্ধকেরা নেই সে রাজা থাকবে না—যস্য ন স্যু র্ন বৈ স স্যাদ্ যস্য স্যুঃ কৃৎস্নমেব তৎ। কথাটা ভয়ংকর রকমের সত্যি, কিন্তু তৎ সত্ত্বেও যে দুর্যোধনের জয় হল না তার কারণ বৃষ্ণি-অন্ধকদের মহাগুরু কৃষ্ণ ছিলেন বিরোধী পক্ষে, এবং বলরাম যুদ্ধেই যোগ দেননি। অভিমন্যুর বিবাহ শেষে বলরাম প্রস্তাব করেছিলেন দুর্যোধনকে যেন শান্তপথে প্রণিপাত করে তুষ্ট করার চেষ্টা করা হয়। এ কথা কৃষ্ণের তো পছন্দ হয়ইনি, উপরন্তু প্রধান বৃষ্ণিবীরদের মধ্যে অন্যতম সাত্যকি বলরামকে উল্টো বকাঝকা করলেন। ভারতযুদ্ধের ব্যাপারে কৃষ্ণের যথেষ্ট উস্কানি ছিল, যদিও যুদ্ধের উদ্যোগপর্বে শেষ সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে যিনি কৌরবসভায় গেলেন, তিনি কৃষ্ণ। দুর্যোধন-দুঃশাসনেরা যাকে দেখতেই পারে না, তাদের দু চক্ষের বিষস্বরূপ সেই কৃষ্ণকে কেন পাঠান হল দূত করে? ক্রুদ্ধ ব্যক্তির কাছে অসহ্য ব্যক্তির শমোপদেশ শত্রুতা আরও বাড়ায়, কমায় না। সম্ভবত কৃষ্ণ এ কাজ অন্য কাউকে দিয়ে করাতেও চাননি, পাছে সন্ধি হয়েই যায়। কৃষ্ণই যুদ্ধ চেয়েছিলেন এবং সেই যুদ্ধই হয়েছে। কৃষ্ণ যখন কুরুসভায় যাচ্ছেন তখন মধ্যম পাণ্ডব সদা-কৌরববিদ্বেষী—চিরকালের ক্ষমাহীন—নিত্যমন্যুরমর্ষণঃ—ভীম পর্যন্ত কৃষ্ণকে বলেছিলেন—যেভাবে শান্তি আসে তাই কর কৃষ্ণ, সেই ভাবেই কথা বল যাতে যুদ্ধের ভয় দেখাচ্ছি, এমন মনে না হয়—যথা যথৈব শান্তিঃ স্যাৎ কুরূণাং মধুসূদন। তথা তথৈব ভাষেথা মা স্ম যুদ্ধেন ভীষয়েঃ।[৪২]

কৃষ্ণের যেন একটু হাসিই পেল। এসব কথা যুধিষ্ঠিরকে মানায়, ভীমও কি সেই যুধিষ্ঠিরের মত ঠাণ্ডা মেরে গেল—শীতত্বমিব পাবকে। কৃষ্ণ দৌত্যকর্ম নিয়ে সেইভাবেই চলে যেতে পারতেন। কিন্তু না, যাবার আগে তিনি ভীমকে উত্তেজিত করতে থাকলেন; পূর্বকথা, পূর্বের ক্রোধ সব স্মরণ করালেন, তারপর বললেন—হায়, যুদ্ধের সময় কিরকম উল্টোপাল্টা ব্যাপার ঘটছে; ভীমের মত লোকের মনেও ভয় ধরেছে—চেতাংসি বিপ্রতীপানি যত্ত্বাং ভীর্ভীম বিন্দতি। এর ফল যা হবার তাই হল। ভীম ক্ষেপে উঠলেন, তাঁর বাহুবল কিরকম তার বহুরকম ফিরিস্তি দিলেন। শেষে বললেন—সারা দুনিয়া ক্ষেপে গেলেও আমি

ভয় পাই না, কিন্তু তবু এটাই সহৃদয়তা ; সব কষ্ট যে সহ্য করেছি তার কারণ এই, যাতে ভরতবংশীয়রা একেবারে চিরবিলুপ্ত না হয়ে যায়—সর্বাংস্তিতিক্ষে সংক্লেশান্ মা চ নো ভরতা নশন্ ।[৪৩]

কৃষ্ণ দেখলেন এবং বুঝলেন লোহা গরমই আছে। তিনি এইটুকুই চেয়েছিলেন—এরা যেন এই মুহূর্তে ঠাণ্ডা মেরে না যায়—গিরেরিব লঘুত্বং তৎ শীতত্বমিব পাবকে। তিনি বললেন—না রে ভাই, মজা করছিলাম—প্রণয়াদিদমব্রুবম্। তিনি কৌরবসভায় গেলেন পাঁচখানি গ্রাম চাইতে, সন্ধির প্রস্তাব নিয়েও। কিন্তু চিরকালের পাণ্ডবপক্ষপাতী কৃষ্ণ, এই সময়ে নিরপেক্ষ দূত সাজলে চলে ? তাঁর আগমন সংবাদেই কৌরবপক্ষে সাজসাজ রব উঠল, শেষ পর্যন্ত যুদ্ধও আরম্ভ হল। সারা ভগবদ্গীতা জুড়ে কৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিলেন ক্ষত্রিয়ের ধর্মযুদ্ধ করতেই হবে। অর্জুন যুদ্ধ করলেন, সবাই যুদ্ধ করলেন। কৃষ্ণ সমস্ত জগতের সামনে প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁরই ঈপ্সিতপক্ষ জয়ী হয়েছে।

ভারতযুদ্ধের ফল কি হয়েছে ধর্মমতে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। ভারতীয় দার্শনিক পন্থাতেও সে ফল মেলানো অসম্ভব নয় কিন্তু মানবিকতার বৃহত্তর দৃষ্টিতে ভারতযুদ্ধের ফল শূন্য। ভীম যা আশঙ্কা করেছিলেন—একে একে সবাই চলে গেল। ভরতবংশের বাতি দেওয়ার জন্য যিনি থাকলেন, সেই পরীক্ষিৎ অর্জুনের নাতি বটে, তবে তিনি কৃষ্ণ-ভগিনী সুভদ্রারও নাতি, আরও পরিষ্কার করে বললে কৃষ্ণ-বাসুদেবের ভাগিনেয় বংশ। আমি বলছি না কৃষ্ণের কোন বুদ্ধি এখানে কাজ করেছে, কিন্তু ফলতঃ এই ঘটেছে। যুদ্ধ থেমে গেলে হস্তিনাপুরের শ্মশান-নৈঃশব্দ্যের মধ্যে যুধিষ্ঠির রাজ্য করতে চাননি, দুঃখে মনের ব্যথায় তিনি চেঁচিয়ে উঠেছেন—চল ভায়েরা সব, এই পুরুষহীন জ্ঞাতিহীন রাজ্যে দুর্গতি লাভ করে আর কি হবে, তার চেয়ে বৃষ্ণি-অন্ধকদের বাসস্থানে ভিক্ষে করাও ভাল—যদ্ ভৈক্ষ্যমাচরিষ্যাম বৃষ্ণ্যন্ধকনিবেশনে।

বিলাপ চলছে, বিলাপ হোক। ভিক্ষা করার অভিমান থাকলে হস্তিনাপুরেই করা যায়, সেখানে বৃষ্ণি-অন্ধকদের বাড়িতে গিয়ে তাদের দেখিয়ে দেখিয়ে ভিক্ষা করার কি মানে ? তাহলে কি যুধিষ্ঠিরের মনের কোণেও কোনও ক্ষোভ ছিল যে এই সুবৃহৎ ভারতযুদ্ধের পেছনে কৃষ্ণের চাপা মদত আছে ? এই একটা কথা থেকে এত বড় সিদ্ধান্ত ঠিক নয়, তবে যুদ্ধ ব্যাপারটা কৃষ্ণ চাননি, মহাভারত পড়ে তাও বোঝা যায় না। যুদ্ধ, যুদ্ধ এবং যুদ্ধই তাঁকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা দিয়েছে এবং সেখানে কাজ করেছে তাঁর আশ্চর্য রাজনৈতিক বুদ্ধি, যাকে তিনি বারবার বলেছেন 'যোগ'—যোগৈরপি হতাঃ যৈস্তে তন্মে শৃণু ধনঞ্জয়। এমন কি গীতা, যাতে দার্শনিক তত্ত্বের শেষ নেই কোথাও, সেখানেও একেবারে অন্তিম শ্লোকে—যেখানে ধর্ম, সেখানে কৃষ্ণ—এমন কথা আসেনি, বরঞ্চ বেশ ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে জানিয়েছে—জয় সেখানে হবেই, যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ। কাজেই বুদ্ধিযোগের ঈশ্বরের সঙ্গে পার্থের মত ধনুর্ধরের যোগাযোগ শুধুই ধর্মের জন্যে এ কথা বিশ্বাস করতে মন চায় না। এই 'যোগে'র ফলেই সেকালের ধর্মরাজ্যে কিংবা বৃষ্ণি-অন্ধক-যদুবীরদের রাজ্যে, হস্তিনাপুরে অথবা তাঁর ভাগিনেয় বংশ

পরীক্ষিতের রাজ্যে কৃষ্ণই একমাত্র প্রতিষ্ঠিত পুরুষ, অন্তত ভারতযুদ্ধের ফল তাই। পূর্বভারতীয় মহারাজ চক্রবর্তী সম্রাট জরাসন্ধের মৃত্যুতে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা যদি কৌরবদের হাতে চলে গিয়ে থাকে, তবে কৌরবদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে রাজনৈতিক ক্ষমতা পাণ্ডবদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়নি, সে ক্ষমতা চলে গিয়েছিল বৃষ্ণি-অন্ধক-যদুমুখ্যদের হাতে, যাদের কথা কৃষ্ণ নিজেই গর্ব করে বলেছেন—যে পক্ষে বৃষ্ণি-বীরেরা আছেন সেই পক্ষই যুদ্ধ জিতবে, আর যে দলে তারা থাকবে না তারা মুছে যাবে—যস্য ন স্যু র্ন বৈ স স্যাদ্ যস্য স্যুঃ কৃৎস্নমেব তৎ। এই যে প্রতিষ্ঠা, তাতে যদুমুখ্যতম ব্যক্তিটি, বৃষ্ণিদের অধিকর্তা ব্যক্তিটি কি পেয়েছিলেন ? বহির্জগতে প্রতিষ্ঠায় তাঁকে নয় সবাই ভগবান বলে মেনে নিয়েছে, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে ? সেখানে ঘর সামলাতে সামলাতেই তাঁর জীবন বীত হয়েছে। প্রতিষ্ঠার অন্তরালে সংসার-বিধ্বস্ত কৃষ্ণকেও তাই একটু চিনে নেওয়া দরকার।

॥ ৪ ॥

পাঠককে কয়েক মুহূর্তের জন্য মহাভারতের বনপর্বে নিয়ে যাব। পাণ্ডবেরা কাম্যকবনে পৌঁছেছেন, কৃষ্ণও তাঁর প্রিয়তমা মহিষী সত্যভামাকে সঙ্গে নিয়ে দেখা করতে এসেছেন পাণ্ডবদের সঙ্গে। পাণ্ডবেরা কৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলতে থাকলেন আর সত্যভামা বসলেন দ্রৌপদীর সঙ্গে। ঈষৎ আলাপাচারিতার পরেই সত্যভামা মোক্ষম একটি প্রশ্ন করলেন দ্রৌপদীকে। সত্যভামা বললেন—কি যাদু জান গো তুমি দ্রৌপদী ! একটি নয়, দুটি নয় পাঁচ-পাঁচটি মহা শক্তিশালী বর। এঁদের তুমি সামাল দাও কি করে—কেন বৃত্তেন দ্রৌপদি পাণ্ডবান্ অধিতিষ্ঠসি ? পাঁচজন তো বেশ তোমার বশে আছে, তোমার ওপর কোন ভাল-মন্দ মেজাজও দেখান না। —কথং চ বশগা স্তুভ্যং ন কুপ্যন্তি চ তে শুভে। এমনকি পাঁচজনেই যেন সব ব্যাপারেই তোমার মুখের দিকেই চেয়ে আছে, মেনিমুখো বললেই বা আপত্তি কি—মুখপ্রেক্ষাশ্চ তে সর্বে। বল না গো দিদি—ব্রত, স্নান, জপ, হোম নাকি ওষুধ করেছ দিদি। এই সৌভাগ্যের মূল কারণটা বল না পাঞ্চালী, যাতে কৃষ্ণও আমার বশে থাকে, কথা শোনে—যেন কৃষ্ণে ভবেন্নিত্যং মম কৃষ্ণো বশানুগঃ।[১]

সত্যভামার কথা শুনে দ্রৌপদী অনেক সদাচারের উপদেশ দিলেন। বললেন—যজ্ঞ, দান, জপ-তপ নয় স্বামীদের বিভিন্ন উপায়ে তুষ্ট রাখাই তাঁর সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। আমাদের জিজ্ঞাসা, সেকালের এক নারী হিসেবে সত্যভামা পতিসেবার মাহাত্ম্য জানতেন না ! সব জানতেন, কিন্তু তার চেয়েও বেশি করে জানতেন যে কৃষ্ণ কিঞ্চিৎ চপলমতি। মহাভারতের বনপর্বের সময়ে কৃষ্ণ মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত পুরুষ। জরাসন্ধ, শিশুপাল, নরকাসুর—এই সব সাংঘাতিক রাজারা কৃষ্ণের হাতে পূর্বাহ্নেই মৃত। কিন্তু ব্যক্তিজীবনে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তাঁর দুর্বলতার কথা অবিদিত ছিল না ; বোধ করি সত্যভামাও সেসব কথা জানতেন। হাজার বশে থাকলেও, হাজার কথা শুনলেও তাঁর স্বভাবে

বোধহয় সেই পিচ্ছিল ভাবটি ছিল, যাতে সত্যভামার মত প্রিয়তমা পত্নীরও বারবার মনে হয়েছে যে, কৃষ্ণ যেন সম্পূর্ণ করে তাঁরই নন। বৃন্দাবনের কেলিকলা এবং অন্যান্য রমণী বিষয়ে কৃষ্ণের লঘুভাবটিই বুঝি সত্যভামার সন্দেহের কারণ। সন্দেহ আরও এই জন্যে যে একমাত্র সত্যভামাই পাতিব্রত্য এবং কর্তব্যের সীমা লঙ্ঘন করে কৃষ্ণকে যথার্থ ভালবাসতেন, যে কথাটা দ্রৌপদী বোঝেননি এবং বোঝেননি বলেই অত সদাচারের উপদেশ করেছেন।

প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণের ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলতে হলে আমাদের আরও একবার পেছন ফিরে তাকাতে হবে। সেই যেদিন কংসের ধনুর্যজ্ঞের আমন্ত্রণ পেয়ে অক্রূরের রথে উঠলেন কৃষ্ণ, সেদিনটার কথা আমাদের স্মরণ করতেই হবে। সেদিনটা ছিল মথুরা যাবার দিন। পণ্ডিতেরা গো-পালক কৃষ্ণকে অক্রূরের রথে চড়িয়ে মথুরায় পাঠাতে একদম নারাজ, কিন্তু কবিরা এই পর্বটিকে অবলম্বন করেই মথুরা বিরহের অসংখ্য গীতি রচনা করেছেন, শিল্পীরা এঁকেছেন অমরচিত্র। আমি এসব বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে যাব না, তবে 'গোপীশতকেলিকার' কৃষ্ণ আর 'মহাভারত সূত্রধার' কৃষ্ণ—এই দুয়ের মধ্যে যোগসূত্র যে অক্রূর সে কথা অস্বীকারও করব না। অন্তত এই 'ট্র্যাডিশন' প্রথম/ দ্বিতীয় শতাব্দীতেই যথেষ্ট প্রচলিত ছিল যে, গোপালক কৃষ্ণকে কংসের দূত এসে নিয়ে গেছে মথুরায়। ভাসের বালচরিত নাটকে দেখি, যেদিন কালিয়নাগকে দমন করে গোপিনীবালিকাদের মধ্যে কেবলই একটু রঙ্গ-রস আরম্ভ করেছেন কৃষ্ণ, ঠিক তখনই খবর এল— অক্রূর এসেছেন কৃষ্ণকে নিতে। কৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গেই সে আমন্ত্রণ স্বীকার করেছেন, এবং দৃশ্যপট পরিবর্তিত হয়েছে মথুরায়।[২] অন্যান্য নাটক কিংবা পুরাণকারেরা এখানে গোপীবিরহ[৩], যেতে নাহি দিব—এমনিধারা অনেক রস, করুণরসের মাধুর্য সৃষ্টি করেছেন। আমরা পণ্ডিতদের স্বার্থে এই সমস্ত কবিত্ব বিসর্জন দিতে পারি, কিন্তু এটুকু না বললে চলবে না যে, অক্রূরের রথে ওঠবার আগে কৃষ্ণকে তাঁর চূড়া-বাঁশী দুটি রাধার কাছে জমা দিয়ে যেতে হয়েছিল, যশোদাকে ফিরিয়ে দিতে হয়েছিল কটিতটের পীতধটিখানি। চূড়া-বাঁশী আর পীতধটির স্মৃতিচিহ্ন ফেলে দিয়ে মথুরায় এসে কৃষ্ণ-বলরাম কংসের বাস-রাঙানি ধোপাকে মেরে রাজবেশ তুলে নিলেন দেহে, ব্যাস্ বৃন্দাবনের সমাধি হল সেইদিনই।

তাতে কৃষ্ণের পক্ষে ক্ষতি হয়নি কিছু। দু-একটি অতি ভাগ্যবান পুরুষ এমনই আছেন, ভালবাসা পেতে যাঁদের অসুবিধে হয় না। যত অন্যায় করুন, কথা দিয়ে একটি কথাও না রাখুন, তবুও তাঁদের সৌভাগ্যরেখা এমন যে অখিল রমণীকুল তাঁদেরই ভালবাসে অথবা তাঁদেরই প্রেমে মোহগ্রস্ত। সমস্ত যৌবনকালটা যার—শ্রীরাধিকে চন্দ্রাবলী, কারে রাখি কারেই ফেলি—বলে কেটেছে, মথুরার প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে যাবার সময়েই তাঁর ভাগ্যপথে আবির্ভাব হল এক রমণীর। রমণী সাধারণী। তবে মুখখানি বেশ সুন্দর, খুঁত আছে শুধু দেহে। পিঠের ওপরে একখানি কুঁজ থাকার ফলেই তার সমস্ত সৌন্দর্য মাটি হয়ে গেছে। রাজপথে রমণী দেখে কৃষ্ণ একটু সকাম ভাবেই তার সঙ্গে কথা কইতে থাকলেন। হরিবংশ থেকে আরম্ভ করে ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ—সবাই কৃষ্ণের দিক থেকে এই কামনার অভিব্যক্তিটুকু লক্ষ্য করেছে। যা কিছুই কৃষ্ণ এই

বিদেশিনীকে বলেছেন, তা সকামভাবেই বলেছেন—সকামেনৈব সা প্রোক্তা। আগেই বলেছি রমণী এমনিতে সুন্দরী, তার ওপরে সে রাজার ঘরে গন্ধ আর হরেঁক কিসিমের অঙ্গরাগের বেশাতি করে। কিছু চপলাও বটে, হরিবংশ তার হাঁটার ভঙ্গিটি বলেছে—'বিদ্যুৎকুটিলগামিনী'।

কৃষ্ণ বললেন—হ্যাঁগো মেয়ে, এত গন্ধ, এত অনুলেপন নিয়ে কোন দিকে চলেছ? মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে কুব্জা বলল—অত কথার কি দরকার বাপু, তোমার গন্ধ ভাল লাগে গন্ধ নাও, অঙ্গরাগ পছন্দ হয়, কত আছে সেজে নাও—যত্ত্বমিচ্ছসি মে বীর তদ্‌গৃহাণানুলেপনম্। তোমাকে দেখেই আমি মুগ্ধ। তোমরা সেজে নাও। আমি দাঁড়িয়ে আছি। দুই ভাই সেজে নিলেন তারপর কৃষ্ণ ধীরে ধীরে কুব্জার কুঁজের ওপর আপন আঙুল দুখানি দিয়ে চাপ দিলেন। কুব্জা সোজা হয়ে গেল। হরিবংশ তাই বলেছে। আর বিষ্ণু এবং ব্রহ্মপুরাণ বলেছে দেহের বক্রতা সোজা করার ব্যাপারটা জানতেন কৃষ্ণ—'উল্লাপনবিধানবিৎ'। কাজেই চিবুক ধরে পায়ের ওপর চাপ দিয়ে কি এক 'ফিজিওথেরাপি' করলেন কৃষ্ণ, যাতে কুব্জা সোজা হয়ে গেল। হরিবংশের মতে তার ফল হল এই যে, তার স্তনপ্রান্ত হয়ে উঠল উঁচু, দেহযষ্টি হল লতার মত, খিলখিলিয়ে হেসে উঠল রমণী—জহাসোচ্চৈঃ স্তনতটী ঋজুযষ্টি র্লতা যথা। কৃষ্ণের বসনপ্রান্ত ধরে সে বলল যাচ্ছ কোথায় তুমি, তুমি ধরা পড়েছ আমার কাছে—ক যাস্যসি ময়া রুদ্ধঃ কান্ত তিষ্ঠ গৃহাণ মাম্—তুমি আমার কাছেই থাক, আমাকে নাও। এসব কথা শুনে দুই ভাই নাকি পরস্পর চাওয়া-চায়ি করে হাততালি দিয়ে উঠলেন। বলরামের সামনে কৃষ্ণের এইটেই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ আর ব্রহ্মপুরাণ বলেছে—কুব্জা যেই সুন্দরী হয়ে গেল—যোষিতাম্ অভবৎ বরা (ভাগবত পুরাণ মতে—বৃহচ্ছ্রোণিপয়োধরা) তখনই সে কৃষ্ণের কাপড় টেনে ধরে বলল—আমার ঘরে চল তুমি—বস্ত্রে প্রগৃহ্য গোবিন্দং ব্রজ গেহং মমেতি বৈ। কৃষ্ণ বললেন—আজ নয়, পরে আসব।[৪]

হরিবংশ আর অন্য পুরাণ কর্তাদের আশয় বুঝেই ভাগবতপুরাণ বলেছে—বড় ভাই বলরামের সামনেই রমণীর প্রশ্রয়মাখা অকুল আহ্বান শুনে কৃষ্ণ একটু লজ্জাই পেলেন যেন—এবং স্ত্রিয়া যাচ্যমানঃ কৃষ্ণো রামস্য পশ্যতঃ—বললেন, যাব, পরে যাব।

হরিবংশ এবং অন্যান্য পুরাণকর্তারা কুব্জার নাম জানাননি। কেউ বলেছেন অনেক বক্রা, কেউ ত্রিবক্রা কেউ বা সোজাসুজি কুব্জাই। কুব্জার দেহের খুঁত তাঁদের প্রথম চোখে পড়েছে, মুখশ্রীর দিকে নজর পড়েছে পরে। তারপর কৃষ্ণের উল্লাপনবিধির চিকিৎসায় তার বৃহৎ শ্রোণী-পয়োধরও তাঁদের নজর এড়ায়নি। এরই মধ্যে কবি-নাট্যকার ভাস কুব্জার নাম দিয়েছেন মদনিকা, কিন্তু তার মনের দিকে কেউ তাকাননি—ভাসও না, অন্যান্য পুরাণকারেরাও না। প্রশস্ত রাজপথে কৃষ্ণ যে কথা দিয়েছিলেন মদনিকার বাড়ি যাবেন বলে, সে কথার কোন মূল্য দেননি অন্য পুরাণকর্তারা। একমাত্র ব্যতিক্রম ভাগবত পুরাণ। এখানে কংসবধের পর পরই কৃষ্ণ কুব্জার ঘরে গেছেন। ভাগবতকার কুব্জার বিশেষণ দিয়েছেন 'কামতপ্তা', কৃষ্ণ তার প্রতিদানও দিয়েছেন। কিন্তু কৃষ্ণ যেহেতু ঈশ্বরীয় গুণে অলংকৃত, তাই কৃষ্ণের কামনার কথা ভাগবতপুরাণ

বলেনি। বরঞ্চ সেই গীতার বাক্যমত "আমাকে যে যেভাবে ভজনা করে আমি তাকে সেইভাবেই ভজনা করি—যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—এই নিয়মে কামতপ্তা কুব্জার অভীষ্টপূরণ তপ্তভাবেই করেছেন।[৫]

আমরা জানি কৃষ্ণও সমান কামুক একথা বলতে ভাগবতপুরাণের বাধো-বাধো লাগবে। গবেষক সন-তারিখ মিলিয়ে কৃষ্ণের কুব্জা-রমণ সম্বন্ধে বলেছেন—ভাগবত পুরাণ তো হরিবংশ, ব্রহ্মপুরাণ কিংবা বিষ্ণুপুরাণের পরে লেখা হয়েছে, তাই হরিবংশে যেসব কথা কৃষ্ণের ভগবত্তা বা নৈতিকতার পক্ষে বিপজ্জনক, সেগুলি না বলে উল্টো দিক দিয়ে তার ভগবত্তা কিংবা মাহাত্ম্য রক্ষা করে গেছে।[৬]

আমরা বলি—ভাগবত পুরাণের তো এ দোষ আছেই, কিন্তু অল্প হোক বেশি হোক, এ দোষ কি হরিবংশেরও নেই? সনাতন গোস্বামী তাঁর বৈষ্ণবতোষণী টীকায় কুব্জা প্রসঙ্গে হরিবংশের কতকগুলি শ্লোক উদ্ধার করেছেন। সনাতন বলেছেন সেটা 'মাথুর হরিবংশ'। আমাদের ধারণা এটি মূল হরিবংশেরই অংশ যদিও সেটা এখনকার হরিবংশে দেখি না। যাই হোক এই শ্লোকগুলির মধ্যে কুব্জার পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত দেওয়া আছে, এবং তা এমন ভাবেই দেওয়া আছে যাতে বেশ বোঝা যায় কৃষ্ণের ভগবত্তা এবং নৈতিকতা রক্ষাকল্পেই শ্লোকগুলি বিরচিত।[৭]

আমরা এত বুঝি না। আমরা বুঝি গোপীশতকেলিকার শত গোপীকে বৃন্দাবনে ফেলে এসে নিজেকে ভাল করে বেঁধে রাখতে পারেননি। আকৃষ্ট হয়েছেন এমন এক মহিলার প্রতি, যিনি পুরাণে সৈরিন্ধ্রী বলে পরিচিত। রসশাস্ত্রকারেরা বলেছেন কুব্জার ভালবাসা নাকি 'সাধারণী রতি'। সাধারণী নারী মানে তো বেশ্যা। কুব্জার ভালবাসাও নাকি বেশ্যার মতই। সাধারণী রতির লক্ষণ হল, নায়ককে দেখা মাত্রই নায়িকার যৌন লালসা জাগে, এবং নায়কের অনুপস্থিতিতে সে লালসাও স্তিমিত হয়।[৮] প্রশস্ত রাজপথেই কুব্জার ভাব অত্যন্ত সকাম—বৃন্দাবনের গোপীকুলের কামগন্ধহীন নিকষিত ভালবাসাও তার নেই, কৃষ্ণ মহিষীদের নিষ্ঠাও তার নেই। সে রতি লালসা করেছে। স্বগৃহে সে লালসা তৃপ্ত হতেই সে নিবৃত্ত হয়েছে। কিন্তু মজা হল—রসশাস্ত্রকারেরা কুব্জার দিক থেকেই সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছেন, কৃষ্ণের দিক থেকে নয়। এই পর্বে কুব্জা যে ব্যবহার করেছে কৃষ্ণও তো সেই ব্যবহারই করেছেন। তিনি সাধারণী নায়িকার কামেচ্ছাপূরণ করেছেন, না, আপন ইচ্ছা পূরণ করেছেন সে তর্ক আসবেই। যদিও সে তর্ক ব্যাখ্যার জন্য সহস্র গীতা-বাণী এবং ভাগবতের শ্লোক মুখিয়েই আছে, তবু সে শুধু ব্যাখ্যাই। কৃষ্ণচরিত্রের মসী তাতে সাময়িক ধুয়ে যায় বটে, প্রশ্ন তবু থেকেই যায়।

হ্যাঁ, কুব্জার নিষ্ঠা নেই, নিষ্কাম প্রেম নেই, কেবলই লালসা। তাহলে নিষ্ঠাবতীদের কথা বলি। নিষ্ঠার জন্যে, পাতিব্রত্যের জন্যে মহিষীরাই তো বিখ্যাত, গোপীরা নয়! সাধারণ নিষ্ঠা, প্রেম, একনিষ্ঠতা—এ সব কিছুর ওপরে তাঁরা, কাজেই মহিষীপ্রেমের কথা আলাদা করে বলতে হবে। আগেই বলেছি, রুক্মিণীর বিয়ের মধ্যে রাজনীতি ছিল। তাঁর দাদা রুক্মী তাঁকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত রাজনীতির স্বার্থে, আর কৃষ্ণ তাঁকে বিয়ে করতে

চেয়েছিলেন আপন স্বার্থে। কিন্তু এর কোনটির মধ্যে রুক্মিণীর আত্মকথাটি নেই। রুক্মিণী তাঁর কালের সেরা সুন্দরী, শিশুপাল শাল্ব—সবারই তিনি মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। মহাভারতে রুক্মিণীর প্রসঙ্গে শিশুপাল বারবার বলেছে 'মৎপূর্বা' অর্থাৎ রুক্মিণী তারই। এ প্রসঙ্গে কথাবার্তাও মনে হয় অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল এবং রুক্মিণীও বোধহয় তা জানতেন। হরিবংশে দেখি, রুক্মিণীর স্বয়ংবর সংবাদে সমস্ত রাজারা যখন বিদর্ভরাজ্যে সমবেত হয়েছিলেন, তখন কৃষ্ণ সেই সভায় নিমন্ত্রিত ছিলেন না। তার সবচেয়ে বড় কারণ—তিনি মথুরার রাজা ছিলেন না। জরাসন্ধের মতে কোন সিংহাসনেই কৃষ্ণ বসার যোগ্য নয়, তাঁর কোনও রাজধানীও নেই, নগরও নেই—সিংহাসনম্ অনধ্যাস্যং পুরং চাস্য ন বিদ্যতে। কাজেই রাজারা যেখানে স্বয়ংবর সভায় সিংহাসনের ওপর রুক্মিণীর জন্য অপেক্ষা করবেন, সেই রাজসমাজে কৃষ্ণ বসবেন কোথায়? তিনি কি মাটিতে বসে থাকবেন? এই অপমান বরণ করার জন্য তিনি স্বয়ংবর সভায় আসবেনই না।[৯] কৃষ্ণ তবু এলেন, এবং এসে উঠলেন বিদর্ভ নগরেরই প্রাচীন পুরুষ ক্রথ ও কৈশিকের বাড়িতে। এঁরা দুই ভাই, এবং কৈশিক ভীষ্মকের বাবা অর্থাৎ রুক্মী-রুক্মিণীর পিতামহ।

এ অভ্যাস কৃষ্ণের ছিল। যেখানে পাশের ঘরেই ঝামেলা আছে, সেখানে তারই পাশের ঘরে গিয়ে বিপদ এবং ঝামেলার একটা আঁচ নেওয়া কৃষ্ণের অভ্যাস। কৌরবসভায় পাণ্ডবের দৌত্যপর্বেও তিনি সরাসরি দুর্যোধনের কাছে যাননি। একবার কুন্তীর ঘরে গেছেন, একবার বিদুরের ঘরেও গেছেন। এই কৈশিকের বাড়ি যাওয়াটা অনেকটা বিদুরের ঘরে যাবার মত। যাই হোক, কৃষ্ণ আসার সংবাদে সমস্ত রাজকুলের মধ্যে সোরগোল পড়ে গেল। স্বয়ংবর সভা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হওয়ার আশঙ্কায় ভীষ্মক সাময়িকভাবে স্বয়ংবর বন্ধ করে দিলেন। ঠিক এই সময়েই শাল্বের বক্তৃতা এবং তারই উদ্দীপনায় কালযবনের সাহায্য নেওয়া হল, যাতে স্বয়ংবরের আগেই কৃষ্ণকে শেষ করে দেওয়া যায়। যাই হোক স্বয়ংবর সভা স্থগিত হওয়ার সংবাদে বিভিন্ন নরপতির যাই প্রতিক্রিয়া হোক না কেন, রুক্মিণী সখীদের কাছে গিয়ে লজ্জায় অধোমুখী হয়ে বললেন—আমি কৃষ্ণ ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব না—ন চান্যোষাং নরেন্দ্রানাং পত্নী ভবিতুমুৎসহে।[১০]

মহামতি বঙ্কিমচন্দ্র রুক্মিণী হরণে বিশ্বাস করেন না। মহাভারতের যে কোন জায়গায় রুক্মিণী হরণের প্রসঙ্গ আছে, সেগুলিকে তিনি প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন। আর হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ অথবা ভাগবতপুরাণ তাঁর কাছে গল্প উপন্যাস ছাড়া কিছুই নয়। পুরাণ-ইতিহাসের যে ধারা ভারতবর্ষে প্রচলিত তার যে একটা ধারাবাহিকতা আছে, যাকে আজকের দিনের গবেষণার পরিভাষায় continuity বলি, সেই ধারাবাহিকতার ধারণা সম্বন্ধে বঙ্কিম আমলের সাহেবরা অপরিচিত ছিলেন, কাজেই আদর্শ কৃষ্ণের পক্ষে অসুবিধেজনক সব কিছুই হয় তিনি প্রক্ষেপ পঙ্কে নিক্ষেপ করেছেন, নয়তো বা গল্প-উপন্যাস বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। পুরাণকারেরা কিন্তু এই ধারণাই পোষণ করেন যে কৃষ্ণ রাক্ষস বিধি অনুসারে কন্যাহরণ করেই রুক্মিণীকে বিবাহ করেন। হরিবংশের লজ্জানত অধোমুখী রুক্মিণীর অস্ফুট একখানি বাক্য থেকেই ব্রহ্মপুরাণ এবং বিষ্ণুপুরাণ

সিদ্ধান্ত করেছে যে, রুক্মিণী এবং কৃষ্ণ—দুজনেই দুজনের প্রতি পরস্পর আসক্ত ছিলেন। ভাগবত পুরাণ যেহেতু আরও পরের লেখা তাই সেই পুরাণ-কবি রুক্মিণীকে দিয়ে রীতিমত একখানা প্রেমপত্র লিখিয়ে এক ব্রাহ্মণের হাতে পাঠিয়ে দিয়েছেন কৃষ্ণের কাছে। প্রেমপত্রের ভাষাটিও অপূর্ব। রুক্মিণী লিখেছেন—

তিন ভুবনের সেরা মানুষটি আমার!

তোমার গুণের কথা যেমন শুনেছি রূপের কথাও তেমনি এবং সেইজন্যেই আমার মনটিও একেবারে লজ্জাহীন হয়ে তোমাতেই আবিষ্ট হচ্ছে—ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তম্ অপত্রপং মে। তোমার বিদ্যা, বয়েস, সম্পত্তি, কুল-শীল—এসবই তোমারই মত, কিন্তু তাই বলে কোন্ কুলবতী কন্যা তোমাকে বরণ না করে থাকবে প্রিয়! আজ থেকে তোমাকেই আমি পতিত্বে বরণ করেছি। দেখো, তোমার মত বীরের প্রাপ্য যে জিনিসটি—রমণীর হৃদয়—তা যেন শিশুপাল ছিনিয়ে না নেয়, সিংহের ভাগ যেন শেয়ালে না চুরি করে—

মা বীরভাগম্ অভিমর্শতু চৈদ্য আরাদ্—
গোমায়ুবণ্মৃগপতে র্বলিম্ অম্বুজাক্ষ।

জানবে কালকেই আমার বিয়ে, তুমি শিশুপাল জরাসন্ধকে পরাস্ত করে আপন শক্তি শুল্কে রাক্ষসদের মত জোর করে আমায় নিয়ে যাও।[১১]

ভাগবত পুরাণের এই চিঠির মধ্যে কেমন করে, কোন সময়ে রুক্মিণীকে হরণ করতে হবে, তাও তিনি স্বয়ংই কৃষ্ণকে জানিয়েছিলেন। সেইমত কাজও হয়েছিল। কিন্তু এত কায়দাকানুন করে, একের চোখে ধুলো দিয়ে আরেক জনকে পিটিয়ে যে রুক্মিণীকে বিয়ে করা হল, সেই রুক্মিণীর বিবাহিত জীবনের ধারাটি হয়ে গেল বড়ই সাদামাটা, বড়ই তরঙ্গহীন। আসলে রুক্মিণীর রূপ ছিল, কিন্তু বুদ্ধি ছিল না। ছিল না সেই বিদগ্ধতা, সেই অধরা-ধরা ভাবটি যাতে স্বামীর কাছে তিনি চিরনতুন থাকেন। নবীনা নায়িকা বড় অল্পকালেই প্রবীণা সাধিকা বনে গেলেন। তিনি কেবলই স্বামীর অনুগতা। বৈদগ্ধ্য, হাব-ভাব কিংবা বিলাসিনী যুবতীর আড়াল ঘনিয়ে নেওয়া নিজের চারদিকে—এ সব তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি একটুও। স্বামীর প্রতি আনুগত্যে সাধারণ পরিহাস পর্যন্ত রুক্মিণী বুঝতেন না। ভাগবত পুরাণে আছে, কৃষ্ণ একবার রুক্মিণীকে বলেছিলেন— রাজকন্যে, আমি বোধহয় তোমার যোগ্যই নই। জরাসন্ধের ভয়ে আমি সমুদ্রের মধ্যে বাস করি, আর আমাকে ভগবান বলে ডাকে শুধু ভিখারীগুলো। তাছাড়া শিশুপাল জরাসন্ধ—এঁরা সব হলেন রাজা, আমি রাজা পর্যন্ত নই। আমি বলি কি, তার চেয়ে বরং নিজের ইচ্ছেমত এবং মনোমত আবার একটা বিয়ে কর—আত্মনো 'নুরূপং বৈ ভজস্ব ক্ষত্রিয়র্ষভম্।[১২]

রুক্মিণীর হৃদয় অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল। চোখে জল, রুদ্ধবাক, শেষে মূর্ছা গেলেন রুক্মিণী। তাঁর এই অবস্থা দেখে আমৃত্যু সংসার বিরাগী এক বৈষ্ণব বাবাজি পর্যন্ত হেসে বলেছেন—কৃষ্ণ যদি রুক্মিণীকে কৈল পরিহাস। কৃষ্ণ ছাড়িবেন বলি রুক্মিণীর হৈল ত্রাস॥ চৈতন্যচরিতামৃতের মরমী কবি তাঁর কথার সূত্রে যে তত্ত্বটি প্রকাশ করেছেন, বিবাহিত জীবনে সে কথাটি ঔষধের মত। তাঁর মতে বিবাহিত প্রেমিককে যিনি কেবলই প্রভু বলে মনে করেন, প্রেমিকের ওপর

ঈশ্বর বুদ্ধিতে যিনি কেবলই আনুগত্য নিয়ে চলবেন, প্রেমের বিচিত্র ক্ষেত্রে তিনি একেবারেই হতভাগিনী, ঠিক যেমনটি রুক্মিণী।[১৩] অথচ কৃষ্ণেরই অন্য এক পরিণীতা বধূ সত্যভামাকে দেখুন। তিনি সারাজীবনই মধুর দাম্পত্য রস এমনভাবেই ভাগাভাগি করে নিয়েছেন কৃষ্ণের সঙ্গে যে, সত্যভামার সামান্য ভ্রূকুটি রচনাতেই কৃষ্ণের মনে হত এই বুঝি সত্যা রেগে গেলেন। তাঁর সামান্য মৌনতাই কৃষ্ণের কাছে চরম নিগ্রহের রূপ নিয়ে ধরা দিত। কিন্তু কেন এমনটি হল ? এর কারণ লুকিয়ে আছে কৃষ্ণ-সত্যভামার বিবাহ-পূর্ব জীবন থেকে আরম্ভ করে সম্পূর্ণ বিবাহিত জীবন জুড়েই।

আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র সত্যভামার সঙ্গে কৃষ্ণের সম্বন্ধ স্বীকার করেন না, জাম্ববতীর সঙ্গেও নয়। সত্যভামার সঙ্গে জড়িত স্যমন্তক মণির বিবরণ তাঁর মতে উপন্যাস আর ভল্লুক কন্যা জাম্ববতীর সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহ নাকি অসম্ভব। এ প্রসঙ্গে দু-একটি কথা নিবেদন করতেই হবে। প্রথম কথা স্যমন্তক মণির কাহিনীটি অত্যন্ত পুরানো, এবং বেশির ভাগ পুরাণেই এ কাহিনীটি ধারাবাহিক কৃষ্ণ-জীবনের অনুক্রমে বর্ণিত নয়। একেবারে আলাদাভাবে যেখানে ভোজ বৃষ্ণি এবং অন্ধকদের বংশ-প্রতিবংশের নামকরণ হচ্ছে, সেইখানে এই সম্যন্তক মণির বিবরণ এবং সত্যভামা-জাম্ববতীর বিবাহ প্রসঙ্গ এসেছে। তাতে বুঝি এ কাহিনীর পৌরাণিকতা কৃষ্ণজীবনের অন্যান্য কাহিনীর থেকে অনেক বেশি। তাছাড়া বিষ্ণুপুরাণের মধ্যে স্যমন্তক মণির কাহিনীটি পুরাতন বংশাবলীর সঙ্গে প্রাচীন গদ্যে লেখা হয়েছে। অনেকেই মনে করেন—হাজারো শ্লোকে-গাঁথা ছন্দোবদ্ধ পুরাণকাহিনীর মধ্যে গদ্যে লেখা অংশগুলি বিশেষ পুরানো। সেদিক দিয়েও তাই সত্যভামা জাম্ববতীকে উড়িয়ে দেওয়া খুবই কঠিন।

সত্যি কথা বলতে কি, স্যমন্তক মণির বিবরণ সম্পর্কে বঙ্কিমের ধারণা একেবারেই ঠিক নয়। সত্যভামা এবং জাম্ববতীর বিয়ে স্যমন্তক মণির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, এবং একথা বলা অন্যায় হবে না যে পৌরাণিকেরা তাঁদের কল্পলোক থেকে এই কাহিনীর বিবরণ লেখেননি। পুরাণকর্তাদের বহু আগে থেকেই এই কাহিনী লোকসমাজে ঐতিহাসিকভাবে প্রচলিত ছিল। তার একটা বড় প্রমাণ উল্লেখ করছি, তবে একটু ধৈর্য ধরে তা বুঝতে হবে।

নিরুক্তকার যাস্ক ; যিনি বেদের প্রথম সফল বৈয়াকরণ বলে বিখ্যাত, এবং যিনি পুরাণকারদের অনেক পূর্ববর্তী, তিনি একটি বাক্য লিখেছেন 'দণ্ড্যঃপুরুষঃ'। এই বাক্যের 'দণ্ড্যঃ' এই পদটি বোঝাতে গিয়ে যাস্ক লিখেছেন 'দণ্ড' শব্দটির মূল ধাতু নাকি 'দা' ধাতু। আমরা জানি 'দণ্ড' শব্দটি 'দণ্ড্' ধাতু থেকেই আসছে এবং 'দা' ধাতু মানে, দান করা। কিন্তু যাস্ক বললেন দা ধাতুর রূপ হল 'দদতে' এবং তার মানে নাকি ধারণ করা কিংবা ধারণ করানো—ধারয়তি। 'দদতে' ক্রিয়ার এই অর্থ পুরাণের যুগে চলেনি অর্থাৎ 'সেমাণ্টিক' দিক দিয়ে এটি অতি প্রাচীন ব্যবহার। যাই হোক এই 'দদতে' ক্রিয়ার 'ধারণ' অর্থ বোঝাতে গিয়ে যাস্ক একটি উদাহরণ দিলেন। তিনি বললেন—

'অক্রূরো দদতে মণিম্ ইতি অভিভাষন্তে'। যাস্কের এই পংক্তিটিই বঙ্কিমের উপন্যাসকল্পে সবচেয়ে বড় আঘাত। এই পংক্তির মধ্যে অক্রূর কিংবা তার সঙ্গে মণির কি সম্পর্ক সে কথা পরে বলব, কিন্তু দুটি শব্দ এখানে সবচেয়ে বেশি

লক্ষণীয় । এক, 'দদতে' শব্দটির 'ধারণ' অর্থে ব্যবহার পুরাণকারেরা জানতেন না। তাঁরা এই শব্দটিকে 'আদান' অর্থাৎ গ্রহণ অর্থে ব্যবহার করে লিখেছেন জগ্রাহ (বিষ্ণুপুরাণ ৪· ১৩· ৪২ পৃঃ ২৯৮)। একমাত্র হরিবংশ লিখেছে 'ধারয়ামাস' (১. ৩৯. ১) যাতে ধারণ অর্থ খানিকটা আসে এবং তাতে বুঝি হরিবংশকার প্রাচীন বিবরণ অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েছেন। দ্বিতীয় কথা হল—যাস্ক লিখেছেন 'ইতি অভিভাষন্তে' অর্থাৎ অক্রূর সেই মণিরত্নটি ধারণ করেছিলেন 'এইরকম বলা হয়'। 'অভিভাষন্তে' মানে আরও পরিস্কার করে বলা যায়—'লোকে বলে'। অর্থাৎ স্যমন্তক মণির কাহিনী লোকমুখেই প্রচলিত ছিল, এবং সেই লোকপ্রবাদ বা oral traditions থেকেই পৌরাণিকেরা সেই কাহিনী ছন্দোবন্ধে ছড়িয়ে দিয়েছেন। গবেষক সিদ্ধান্ত করেছেন যে, যাস্কের উদ্ধৃত পংক্তিটি—'অক্রূরো দদতে মণিম্' অবশ্যই আরও পুরানো কোন শ্লোকের একাংশ। এই শ্লোকগুলিকে বলা হয় 'গাথা', যেগুলি ভীষণ পুরানো বলে গবেষকেরা মানেন। পংক্তিটি শুনলে, অবশ্যই এটিকে একটি ছন্দোবদ্ধ শ্লোকের একাংশ বলেই মনে হয় এবং গবেষকের ধারণা, স্যমন্তক মণির কাহিনীটি যেহেতু বৃষ্ণিবংশীয় সত্রাজিতের প্রসঙ্গেই সবসময় উচ্চারিত তাই এই গাথাটি "might have formed a part of family ballad or the gatha of the Vrsnis which used to be sung on ceremonial occasions."[১৪]

এত কথা আমি এখানে বলতাম না, কিন্তু বঙ্কিম যেমন গুরু গম্ভীরভাবে স্যমন্তক মণি এবং সত্যভামাকেও একেবারে নস্যাৎ করে দিয়েছেন, তাতে সমান গুরুগম্ভীরভাবেই এই প্রসঙ্গ প্রতিষ্ঠা করার দরকার ছিল। যাই হোক আমরা কৃষ্ণ-সত্যভামার প্রসঙ্গে আসি, যদিও এই প্রসঙ্গ শুরু করতে হবে শেষ থেকে। বঙ্কিমচন্দ্র, বিমানবিহারী মজুমদার—সবাই শেষ থেকেই শুরু করেছেন, আমরাও তাই করব। মহাভারতের শান্তিপর্ব খুললে দেখা যাবে— মহাভারতের সূত্রধার নারদের কাছে তাঁর জীবনের দুঃখ-কষ্টগুলি নিবেদন করছেন। তিনি বললেন—এই যে দেখছ আমার জ্ঞাতি-গুষ্টি—এরা সব আমাকে খুব ক্ষমতাশালী বলে মানে, এমনকি মুখে বলে আমি একেবারে ঈশ্বর, কিন্তু আসলে এই জ্ঞাতিদের চাকরের মতই থাকতে হয় আমাকে—দাস্যম্ ঐশ্বর্যবাদেন জ্ঞাতীনাং নু করোম্যহম্। ধন-সম্পত্তির যা আদায়-উপায় করি, তার অর্ধেক ভোগ করি আমি, আর সব যায় এই জ্ঞাতিগুষ্ঠির ভোগে এবং আমার লাভ এই যে, তার দরুণ যত গালাগালি আর নালিশ—সব সহ্য করতে হয় আমাকে। অক্রূর বলবে—কৃষ্ণ আহুকের পক্ষ নিয়েছে, আর সেই জন্যে আমাকে দেখতে পারে না। আবার আহুক বলবে—কৃষ্ণ অক্রূরের পক্ষ নিয়েছে এবং সেইজন্যেই আমায় দেখতে পারে না। এদের দুর্বাক্য সব সময় আমার মনের মধ্যে ধিকি ধিকি জ্বলছে। লোকে যেমন কাঠের ওপর দিকটা ধরে নীচের দিকটা আগুনে ঢুকিয়ে আগুন জ্বালায়, তেমনি দুর্বাক্যের কাঠটি আমার হৃদয় দহন করছে। এই যে দাদা বলরাম, তিনি নিজের শক্তিমত্তায় সব সময়েই মেজাজে রয়েছেন, ছোটভাই গদ, (এই ছোটভায়ের জন্যই কৃষ্ণের এক নাম গদাগ্রজ) সে সব সময়েই নিজের সুকুমার দেহ নিয়ে ব্যস্ত ; আর ছেলে প্রদ্যুম্ন— সে নিজের মোহন রূপে নিজেই মত্ত। এ অবস্থায় আমি যে কত অসহায় সে কেউ বুঝবে না। বৃষ্ণি-অন্ধকদের

মধ্যে অনেকেই এখন বড় মানুষ, শক্তিমান্ এবং তাঁরা যে রাজার দলে থাকবে তাদের জয় সুনিশ্চিত আর যাদের দলে নেই তাদের জয় অনিশ্চিত। কিন্তু এদের সাহায্যও আমি কিছু পাই না। আর সবার ওপরে আছে সেই আহুক আর অক্রূরের চিরকালের ঝগড়া, তাদের যে কোন একজনের পক্ষ অবলম্বন করা আমার পক্ষে অসম্ভব, অথচ এই দুজনের মত আত্মীয় যার আছে তার জীবন যে কিরকম দুর্বিষহ, তা তোমায় কি করে বোঝাব নারদ! দুই জুয়াড়ীর এক মায়ের মত আমি একজনের জয় আকাঙ্ক্ষা করি আর অন্যজন যাতে হেরে না যায় তাও চিন্তা করি—সো'হং কিতবমাতেব দ্বয়োরপি মহামতে। একস্য জয়মাশংসে দ্বিতীয়স্যাপরাজয়ম্।[১৫]

প্রায় বৃদ্ধ বয়সে সম্পূর্ণ সুপ্রতিষ্ঠিত অবস্থায় এই হল কৃষ্ণের মানসিক বিপ্লব। ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই মানসিক অবস্থার জন্য অনেকখানিই দায়ী হল স্যমন্তক মণি এবং সত্যভামা। ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করে বলি। যযাতিপুত্র ক্রোষ্টুর গান্ধারী আর মাদ্রী নামে দুই বউ। গান্ধারীর গর্ভে অনমিত্র, আর মাদ্রীর গর্ভে যুধাজিৎ আর দেবমীঢুষ। মাদ্রীর ধারায় যুধাজিতের ছেলে বৃষ্ণি এবং তাঁরই নাতি হলেন অক্রূর এবং একই ধারায় দেবমীঢুষের ছেলে শূর এবং তাঁর নাতি হলেন কৃষ্ণ। অন্যদিকে গান্ধারীর ধারায় অনমিত্রের ছেলে হলেন নিঘ্ন এবং তাঁরই নাতনী হলেন সত্যভামা। তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়—
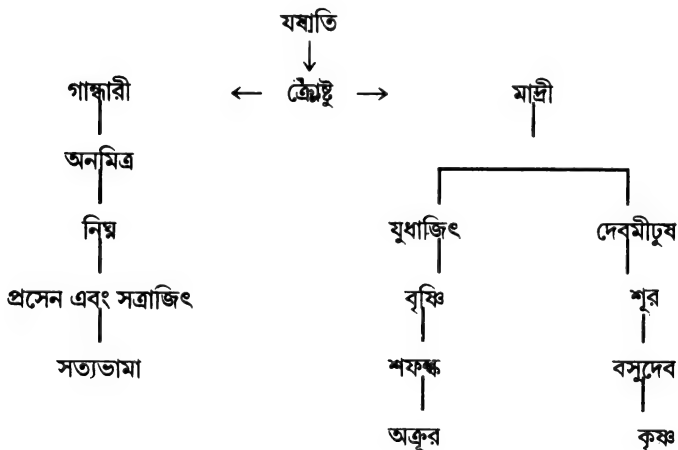
সম্পর্কে সত্যভামা তাহলে কৃষ্ণের সগোত্রীয়া বোন এবং তাঁরা একে অপরকে বহু আগে থেকেই চিনতেন এবং কৃষ্ণের সঙ্গে সত্যভামার যা সম্পর্ক, অক্রূরের সঙ্গেও সেই সম্পর্ক। এবারে মূল কথায় আসি।

সত্যভামার বাবা সত্রাজিৎ ছিলেন সূর্যের উপাসক এবং হরিবংশ বলেছে সূর্য নাকি তাঁর 'সখা প্রাণসমো' ভবৎ'। একদিন সমুদ্রের তীরে সত্রাজিতের সামনে সূর্যদেব আবির্ভূত হলেন এবং বর চাইতে বললেন। সত্রাজিৎ কিছু চাইলেন না, শুধু সূর্যের গলার মালাখানি চেয়ে বসলেন। সেই মালার মধ্যমণি ছিল স্যমন্তক।

সূর্যের কাছে মণিলাভ করে **সত্রাজিৎ যখন** দ্বারকায় ঢুকলেন তখন সবাই ভাবল আকাশের সূর্যই বুঝি হেঁটে চলেছে ভুঁয়ে—সূর্যোয়ং গচ্ছতীতি হ।[১৬] এই উজ্জ্বল স্যমন্তক মণি সত্রাজিৎ যেখান থেকেই পান, এই মণিরত্নের প্রভাব ছিল অলৌকিক। প্রতিদিন এই মণি আট ভার সোনা প্রসব করত, এবং রাজ্যে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, রোগ কিছুই ছিল না এই মণির প্রভাবে। হরিবংশ বলেছে সত্রাজিৎ মণিখানি নিয়ে ভালবেসে নিজের ভাই প্রসেনকে দিলেন কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ তার প্রাচীন গদ্যের ভাষায় জানিয়েছে যে, পাছে কৃষ্ণ এই মণি তাঁর কাছে চেয়ে বসেন, সেই ভয়েই তিনি ভাই প্রসেনের কাছে রেখে দেন। অবশ্য হরিবংশ এবং বিষ্ণুপুরাণ দুটিতেই স্বীকার করেছে যে, এই স্যমন্তক মণির ওপর কৃষ্ণের লোভ ছিল। কৃষ্ণকে মহান পুরুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিষ্ণুপুরাণ বলেছে যে, কৃষ্ণ নাকি মহারাজ উগ্রসেনের জন্য এই মণিটির প্রতি সস্পৃহ হয়েছিলেন। কারণ উগ্রসেন যেহেতু রাজা, অতএব মণিটি দেশের রাজারই যোগ্য। হরিবংশে দেখা যাচ্ছে প্রসেনের মণিটি একবার চেয়েও ফেলেছিলেন কৃষ্ণ। কিন্তু যাই হোক তিনি সেটি পাননি, এবং সামর্থ্য থাকলেও তিনি জোরও খাটাননি কেননা তাতে আত্মীয়াবিরোধ হতে পারে—গোত্রভেদভয়াচ্চ শক্তোঽপি ন জহার।[১৭]

এইটুকুতেই বেশ বোঝা যাচ্ছে যে স্যমন্তক মণির অধিকার নিয়ে গোলমাল রীতিমত পেকে উঠেছিল। এরই মধ্যে প্রসেন করলেন কি মণিটি গলায় দুলিয়ে মৃগয়ায় চলে গেলেন। হরিবংশ এবং পুরাণগুলি তাই বলেছে বটে, তবে আমার দৃঢ়মূল ধারনা যে প্রসেন মণিটি কোথাও রেখে আসবার জন্যেই মৃগয়ার ছল করে কোথাও যাচ্ছিলেন কারণ তিনি ধারণা করেছিলেন যে কৃষ্ণ মণিটি ছিনিয়ে নিতে পারেন। এদিকে বনমধ্যে এক সিংহ প্রসনকে মেরে ফেলে। বৃষ্ণি এবং অন্ধকেরা অর্থাৎ কৃষ্ণের জ্ঞাতিগুষ্ঠি সবাই প্রসেনের মৃত্যুর খবর পেয়ে এই ধারণা করলেন যে, কৃষ্ণ একসময়ে প্রসেনের কাছে মণিটি চেয়েছিলেন, অতএব সুযোগ বুঝে এখন তিনিই প্রসেনকে বনের মধ্যে গুপ্তহত্যা করেছেন—ততো বৃষ্ণ্যন্ধকাঃ কৃষ্ণঃ প্রসেন বধকারণাৎ। প্রার্থনাং তাং মণে র্বুধ্বা সর্ব এব শশঙ্কিরে। বিষ্ণুপুরাণ বলেছে সমস্ত যদুকুল প্রসেনবধের ব্যাপারে কৃষ্ণকে দায়ী করে কানাকানি করতে থাকল—যদুলোকঃ পরস্পরং কর্ণাকর্ণি অকথয়ৎ।[১৮]

যথাসময়ে সব কৃষ্ণের কানে উঠল। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার তাগিদে তিনি সাড়ম্বরে ঘোষণা করলেন যে ঘটনাস্থল থেকে মণিটি তিনি অবশ্যই উদ্ধার করে আনবেন। এইবারে কৃষ্ণকে আমরা দেখব রীতিমত গোয়েন্দার ভূমিকায়। প্রথমেই তিনি প্রসেন হত্যার অকুস্থলে পৌঁছোতে চাইলেন। যারা পায়ের ছাপ, হাতের ছাপ, সব বোঝে সেই সব লোকেদের সাহায্যে—পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ—তিনি প্রথমে প্রসেনের পায়ের চিহ্ন জোগাড় করলেন। চিহ্ন ধরে এগোতে এগোতে শ্রান্ত ক্লান্ত কৃষ্ণ এক পাহাড়ের কাছে এসে দেখেন প্রসেন মরে পড়ে আছে। যদু কুলের জনগণ এবার ভাবল সিংহই প্রসেনকে মেরেছে, কিন্তু মণির কোন হদিশ পাওয়া গেল না। কিছুদূর গিয়ে কৃষ্ণ দেখলেন সিংহটিও মরে পড়ে আছে এবং বিভিন্ন পদচিহ্ন পরীক্ষা করে দেখলেন যে এক ভালুক তাকে মেরেছে। এবার ভালুকের পদচিহ্ন ধরে এগোতে এগোতে

একটি গুহার কাছে গিয়ে দেখলেন পদচিহ্ন সেই গুহার মুখে এসেই মিলিয়ে গেছে। বৃষ্ণি-অন্ধকদের সবাইকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে কৃষ্ণ গুহার মধ্যে ঢুকলেন। অর্ধেক ঢুকেই তিনি একটি নারীকণ্ঠের সান্ত্বনাবাণী শুনতে পেলেন। রমণী বলছে—সিংহ প্রসেনকে মেরেছে আবার জাম্ববান সেই সিংহকে মেরে মণি নিয়ে এসেছে এ মণি এখন তোমারই—তব হ্যেষ স্যমন্তকঃ।[১৯]

অল্প সময়ের জন্যে হলেও পাঠক খেয়াল করবেন—হরিবংশ, ব্রহ্মপুরাণ এবং বিষ্ণুপুরাণ—এই তিনটি পুরাণেই রমণীমুখের এই সান্ত্বনাবাণীটি অনুষ্টুভ ছন্দে লেখা এমনকি বিষ্ণুপুরাণে গদ্যে লেখা কাহিনীটির মধ্যেও এই শ্লোকটি অবিকৃত।[২০] আমরা সন্দেহ করি, এটি সেই প্রাচীন গাথারই কোন অংশ যা লোক-মুখে চলত এবং যা পুরাণকারেরাও বিকৃত করতে সাহস পাননি। যাই হোক এমন স্পষ্ট কথা শুনে কৃষ্ণ গুহার মধ্যে ঢুকলেন এবং জাম্ববানের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ চলল একুশ দিন। বলরাম এবং অন্যান্য যাদব-বীরেরা সাত-আটদিন অপেক্ষা করে—সপ্তাষ্টদিনানি তস্থুঃ—ফিরে এলেন দ্বারকায়। আপন লোকেরা কৃষ্ণের শ্রাদ্ধশান্তিও করে ফেলল। এদিকে কৃষ্ণ জাম্ববানকে হারিয়ে মণিরত্ন উদ্ধার করলেন এবং বীরত্বের উপহারস্বরূপ পেলেন জাম্ববানের কন্যা জাম্ববতীকে।

পাঠকের ব্যাঘাত হলেও মনে রাখতে হবে কৃষ্ণের মহিষীকুলে জাম্ববতীর স্থান রুক্মিণীর পরেই। বঙ্কিম জাম্ববতীকে বিশ্বাস করেন না এবং বিশ্বাস করেন না যে, কৃষ্ণ কোন ভালুকের মেয়েকে বিয়ে করতে পারেন। আমরা বুঝি, জাম্ববান কোন ভালুক নয়, এরা এমন একটি জাতি যারা ভালুকের 'টোটেম' ব্যবহার করত। নইলে রামচন্দ্রের আমলের জাম্ববান কৃষ্ণের আমলে টিকে থাকতেন না। বিশেষতঃ জাম্ববানের গুহাটি বিন্ধ্যপর্বতের পাশে ঋক্ষবান্ পর্বতে। বিন্ধ্যপর্বতের ওপারে ঋক্ষবান্ পর্বতের নাম শুনেই বুঝি এই লোকগুলির স্থায়ী বসতি ছিল এইখানে, এবং তারা ঋক্ষ অর্থাৎ ভালুকের 'টোটেম' ব্যবহার করত। জাম্ববান্ নামটি শুধু তাদের 'লিডারে'র মাহাত্ম্য বাড়ানোর জন্য। এরা অবশ্যই অনার্য্য এবং বিবাহের ব্যাপারে অনার্য্যকন্যা আর্যদের কাছে কোনকালেই নিরানন্দের কারণ ছিল না—তার উদাহরণ দিতে পারি ভূরি ভূরি। জাম্ববতীর কথায় আবার পরে আসব, আপাততঃ আমাদের মূল গোয়েন্দা কাহিনীতে ফিরে আসি।

জাম্ববতীর সঙ্গে স্যমন্তকমণি হাতে কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরলেন। নিজের অপবাদ মোচন করার জন্য মণিটি সবার সামনে সত্রাজিতের হাতে দিলেন, কারণ তিনিই তো মূল অধিকারী— দদৌ সত্রাজিতে তং বৈ সর্বসাত্ত্বতসংসদি। মণি ফিরে পেয়ে সত্রাজিতের মনে দ্বিগুণ লজ্জা হল। এই মণির জন্য তিনি কৃষ্ণকে লোভী, চোর সবই সাজিয়েছেন। একটু ভয়ও হল। তিনি কৃষ্ণকে খুশি করার জন্য নিজের সুন্দরী মেয়েটিকে কৃষ্ণের সঙ্গে বিয়ে দিলেন। সত্রাজিতের মেয়ের নাম সত্যভামা। সত্যভামার বাসররাত্রি থেকেই কৃষ্ণ জীবনে দ্বিতীয় নাটকের শুরু। যে কৃষ্ণ ঘরে-বাইরে প্রায় সুপ্রতিষ্ঠিত, যে কৃষ্ণ তাঁর জ্ঞাতিগুষ্ঠির জন্য এতকাল শুধু করেই গেছেন, তাদেরই হাতে তাঁকে কেমন নাকাল হতে হল, সে নাটক আরম্ভ হয়েছে সত্যভামার সঙ্গে তাঁর বিয়ে থেকেই।

সত্যভামাকে যে কৃষ্ণ বৌ হিসেবে পাবেন, এ তিনি ভাবতেই পারেননি।

আত্মীয়তার সূত্রে এই বিদগ্ধা মহিলাটিকে তিনি নিশ্চয়ই আগে থেকেই জানতেন, কিন্তু তালে-গোলে ঘটনার চক্রে সে যে কোনদিন তাঁরই গৃহের বধূটি হয়ে আসবে, এ ছিল তাঁর ভাবনার বাইরে। বিশেষতঃ এই 'অনিন্দিতা' সত্যভামার ওপরে চোখ ছিল অনেকের এবং তাঁরা সবাই কৃষ্ণের আপন ঘরের লোক। সত্যভামার হস্তকামীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন অক্রূর।[২১] সত্যভামার ওপরে অক্রূরের যেমন সবসময় চোখ ছিল, তেমনি লোভ ছিল্ মণিরত্ন স্যমন্তকের ওপরেও। এই মণি কত সুবর্ণপ্রসব করত সে আলোচনায় লাভ নেই, তবে মণিটির বিক্রয়মূল্য নিশ্চয়ই ছিল সাংঘাতিক, যার জন্য সবারই লোভ ছিল মণিটির প্রতি। সত্যভামার ওপরে অক্রূরের লালসাদৃষ্টির কথা হরিবংশ জানিয়েছে, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ বলেছে—কৃষ্ণের বহু আগে থেকেই শুধু অক্রূর নয়, কৃতবর্মা, শতধন্বা—এইসব যাদব বীরেরাও সত্যভামার হৃদয়-লিপ্সু ছিলেন—তাঞ্চ অক্রূর-কৃতবর্ম-শতধন্ব প্রমুখ-যাদবাঃ পূর্বং বরয়ামাসুঃ। কৃষ্ণের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার অনেক আগে থেকেই যেহেতু এরা সত্যভামার পিছনে ঘুরঘুর করছিলেন, তাই কৃষ্ণকে অযাচিত কন্যাদানের ফলে এঁরা সবাই সত্রাজিতের ওপরে ভীষণ ক্ষেপে গেলেন এবং তাঁর সঙ্গে প্রচণ্ড শত্রুতা আরম্ভ করলেন।

অক্রূরের পরিচয় আগেই বলেছি। কৃতবর্মা আর শতধন্বা, দুই ভাই, অন্ধক-বৃষ্ণিদের মতই আরেক ধারা ভজমানের বংশে জন্মেছেন। কৃষ্ণ কিংবা অক্রূরের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কও ঘনিষ্ঠ। সত্যভামার বিয়ের পর অক্রূর আর কৃতবর্মা ছোটভাই শতধন্বাকে বললেন—এই সত্রাজিৎ হল পাকা বদমাশ—'অতি দুরাত্মা'। আমরা, এমনকি তুমিও ওর মেয়েটিকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে। ও আমাদের তো মেয়ে দিলই না এমনকি তোমাকেও যদি দিত, তাহলেও হত। তোমাকেও দিল না, দিল কৃষ্ণকে—অস্মান্ ভবন্তং চ অবিগণয্য কৃষ্ণায় দত্তবান্। এ অবস্থায় সত্রাজিতের বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। তাছাড়া নিতান্তই মেয়েটাকে যখন পেলে না, তখন ও ব্যাটাকে মেরে মণিটা নিতে দোষ কি ? তুমি বরং সেই চেষ্টা কর—ঘাতয়িত্বৈনং তন্মহারত্নং ত্বয়া কিং ন গৃহ্যতে ? কৃষ্ণ যদি এ ব্যাপারে বাগড়া দেয়, তাহলে আমরা তোমাকেই সাহায্য করব। শতধন্বা, যিনি হয়তো অক্রূর এবং কৃতবর্মার থেকেও সত্যভামার প্রতি বেশি অনুরক্ত ছিলেন, হয়তো বা এদের থেকে বয়সও তার কম ছিল, তিনি বললেন— ঠিক আছে, তাই হবে।

সুযোগও এসে গেল। ঘটনার পটভূমিকাটা এইরকম— দুর্যোধন পাণ্ডবদের বারণাবতে পাঠিয়েছেন জতুগৃহে বদ্ধ করে দগ্ধ করার জন্য। জতুগৃহদাহ হয়ে গেছে এবং আচমকা পাণ্ডবদের মৃত্যুসংবাদ রটে গেলে কৃষ্ণ বারণাবতে পৌঁছোলেন ঘটনার সত্যতা যাচাই করার জন্য। কৃষ্ণের মাথায় কিঞ্চিৎ গোয়েন্দা-বুদ্ধি থাকার ফলে তিনি বুঝতে পারলেন যে পাণ্ডবরা জতুগৃহে দগ্ধ হননি। কিন্তু এদিকে আরেক বিপদ হল। কৃষ্ণের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে শতধন্বা নিদ্রিত অবস্থায় সত্রাজিতকে বধ করে স্যমন্তক মণি ছিনিয়ে নিলেন। পিতৃহীন, মণিহীন সত্যভামা একাই রথে করে বারণাবতে উপস্থিত হলেন : এই আচরণ সত্যভামাকেই শোভা পায়, রুক্মিণী কিংবা জাম্ববতীর মত কুলবতীরা কৃষ্ণের কাছে কোনদিন এত প্রশ্রয় পাননি যে একা একা রথে করে দ্বারকা থেকে

হস্তিনাপুর যাবেন। যাই হোক কেঁদেকেটে সত্যভামা কৃষ্ণকে পিতার মৃত্যুসংবাদ জানালেন এবং জ্ঞাতিগুষ্টির মধ্যে তাঁর এই অপমান যে অসহ্য, সে কথাও কৃষ্ণকে বোঝাতে ভুললেন না। এত ঝামেলার মধ্যে স্যমন্তক মণির মূল অধিকারী শ্বশুর সত্রাজিতের মৃত্যুতে কৃষ্ণ মনে মনে খুশিই হলেন কিন্তু মুখে খুব রাগ দেখিয়ে বললেন—এই অপমানের বিহিত আমি করব।[২২]

পাণ্ডবদের মৃত্যুতে অবিশ্বাসী কৃষ্ণ একটি লোকদেখানি শ্রাদ্ধক্রিয়া করলেন বটে কিন্তু সাত্যকিকে বললেন পাণ্ডবদের দগ্ধ মৃতদেহগুলি খুঁজে বার করতে কারণ তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল পাণ্ডবেরা মরেনি। সাত্যকিকে কর্তব্যকর্মের ভার দিয়ে ব্যস্ত রাজনীতিবিদ দ্বারকায় ফিরেই প্রথমে জপানোর চেষ্টা করলেন বলরামকে। কৃষ্ণ তাঁকে বললেন—সত্রাজিতের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে স্যমন্তক মণি এখন আমাদেরই—স্যমন্তকো মহাবাহো হ্যস্মাকং স ভবিষ্যতি। বাস্তবিক এই কারণেই সত্রাজিতের মৃত্যুসংবাদ শুনেও কৃষ্ণের অন্তরে আনন্দ হয়েছিল এমনকি এখন যে তিনি বলরামকে স্বপক্ষে আনার জন্যে—'ওই মণি এখন আমাদের'—এই বলে গৌরবে বহুবচন ব্যবহার করলেন, তাও তাঁর মনের কথা কিনা কে জানে, কারণ এই নিয়ে পরে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে।[২৩]

যাই হোক কৃষ্ণ বলরামকে সঙ্গে নিয়ে শতধন্বাকে মারার চেষ্টা নিলেন। খবরটা ফাঁস হয়ে যেতেই শতধন্বা দাদা কৃতবর্মার শরণ নিলেন। পূর্ব প্রতিজ্ঞা ভুলে কৃতবর্মা কৃষ্ণ এবং বলরামের মত শক্তিধরের বিরুদ্ধে যাবার অসামর্থ্য জানালেন। সময় বুঝে অক্রূরও শতধন্বাকে উল্টো কথা বললেন। আসলে সত্রাজিৎ মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে এঁদের সত্যভামার ব্যাপারে খানিকটা ক্রোধশান্তি হয়েছিল। তারপরে সত্যভামার একাকী হস্তিনাপুর চলে যাওয়া এবং কৃষ্ণের ক্রুদ্ধ হয়ে দ্বারকায় ফিরে আসা থেকেই কৃতবর্মা আর অক্রূরের প্রত্যক্ষ ভীতি সঞ্চার হয়। হরিবংশ অবশ্য বলেছে যে কৃষ্ণের সঙ্গে টক্কর দেবার ক্ষমতা অক্রূরের ছিল কিন্তু শঠতা করেই তিনি হৃদিকপুত্র শতধন্বাকে সাহায্য করেননি—শক্তো'পি শাঠ্যাদ্ হার্দিক্যমক্রূরো নাভ্যপদ্যত। শতধন্বা বুঝলেন তাকে বাঁচাতে পারে এমন কোন শক্তি নেই এবং তার মূল ওই মণিটি, যেটা পূর্বে ছিল তিনজনেরই লক্ষ্য। শতধন্বা বললেন—ঠিক আছে, তবে মণিটি আপনি রাখুন। অক্রূর মণি নিতে স্বীকার করলেন এই শর্তে যে, প্রাণ গেলেও মণিটি কোথায় আছে তা তিনি কৃষ্ণকে বলবেন না। তাই হল। মণি দিয়ে শতধন্বা ঝড়ের বেগে ঘোড়ায় চড়ে পালিয়ে চললেন। একই বেগে রথে চড়ে কৃষ্ণ-বলরাম শতধন্বার পিছু নিলেন। এক জায়গায় শতধন্বার ঘোড়া মারা গেল এবং তিনি পায়ে হেঁটেই পালাতে লাগলেন। পথের মাঝে ঘোড়ার মৃতদেহ দেখে কৃষ্ণ-বলরামের রথের ঘোড়াগুলিও বুঝি বা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তাই কৃষ্ণ তাঁর দাদাকে রথে অপেক্ষা করতে বলে শতধন্বাকে ধাওয়া করলেন পায়ে হেঁটেই, কারণ এতেই সময় বাঁচার কথা। এক সময়ে শতধন্বাকে ধরেও ফেললেন কৃষ্ণ এবং কোন কথা জিজ্ঞেস করার আগেই তাঁকে মেরে ফেললেন। কিন্তু তাঁর শরীর এবং কাপড়-চোপড় আতিপাঁতি করে খুঁজেও তিনি মণিটি পেলেন না। বিফল মনোরথ ফিরে এসে সে কথা যখন বলরামকে জানালেন তখন আরেক বিপদ হল।

বলরাম বললেন—ধিক্ কৃষ্ণ, শত ধিক্ তোমাকে, তুমি এত অর্থপিশাচ।

তুমি আজ বেঁচে গেলে শুধু আমার ভাই বলে—ধিক্ ত্বাং যস্ত্বমর্থলিপ্সুঃ। এতচ্চ তে ভ্রাতৃত্বান্ মর্ষয়ে। এই সেই পথ, তুমি মানে মানে চলে যাও, তোমাকে বা তোমার জ্ঞাতি-বন্ধু বৃষ্ণি-অন্ধকদেরও আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমি চললাম। ভীষণ ক্রুদ্ধ বলরাম বিদেহ নগরীতে চলে গেলেন। এবং আতিথ্য নিলেন বিদেহদেশের রাজার।[২৪]

পাঠক বোধহয় এতক্ষণে খানিকটা বুঝতে পারছেন যে, মহাভারতে কৃষ্ণ যে দুঃখ করেছেন তার খানিকটা কারণ নিশ্চয়ই আছে। অক্রূর, কৃতবর্মা, বলরাম—এইসব যদুবীরদের সঙ্গে কৃষ্ণের যা সম্পর্ক দাঁড়াল তা মোটেই স্বস্তিকর নয়। বিদেহ অর্থাৎ মিথিলাদেশে বলরাম বেশ কিছুদিন ছিলেন এবং সমস্ত পুরাণগুলি একযোগে খবর দিয়ে বলেছে যে ওই সময়েই কুরুরাজ দুর্যোধন বলরামের কাছে গদাশিক্ষার উন্নততর কৌশলগুলি শিখে নেন। এই খবরটি অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই, কেননা একেবারে অন্যরকম একটি গল্পাংশের মধ্যেও এই টুকরো খবরটি সর্বত্র অবিকৃত, এবং এটিও স্বীকৃত সত্য যে দুর্যোধন বলরামের কাছে এক সময়ে গদা শিক্ষা করেন। গদার ব্যাপারে বলরামের শিক্ষা দুর্যোধনের কাজে লেগেছে তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, এবং বলরামের শিষ্য বলেই তিনি পরিচিত। যাই হোক, বলরাম থাকলেন মিথিলায়, এদিকে তিন বছরের মধ্যেও যখন এমন কোন লক্ষণ বোঝা গেল না যে, কৃষ্ণই মণিটি নিয়েছেন, তখন উগ্রসেন এবং অন্যান্য বড় বড় যদুবীরেরা বলরামকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে ফের দ্বারকায় নিয়ে এলেন।

দ্বারকায় আরও একটি উল্লেখ্য ঘটনা ঘটল। অক্রূর, যাঁর কাছে মণিটি ছিল এবং যা কেউ জানত না, সেই অক্রূর হঠাৎ বড়লোক হয়ে উঠলেন এবং তিনি বিভিন্ন যজ্ঞক্রিয়া আরম্ভ করলেন। তাঁর আকস্মিক এই ভক্তিভাবের মধ্যেও একটা রাজনীতি ছিল, সেটি পরিষ্কার করে দিয়েছে বিষ্ণুপুরাণ। ক্ষত্রিয় যদি যজ্ঞে দীক্ষিত হন তবে তাঁকে মারলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। অতএব যজ্ঞে দীক্ষিত অবস্থায় কৃষ্ণ তাঁকে কোনমতেই প্রাণে বধ করে মণিটি ছিনিয়ে নিতে পারবেন না, এই বিশ্বাসেই অক্রূর একটি যজ্ঞ শেষ করেই আরেকটি আরম্ভ করতে লাগলেন অর্থাৎ এইভাবে যজ্ঞকর্মের ছলে তিনি প্রায় বাষট্টি বছর কাটিয়ে দিলেন—সবনগতৌ হি ক্ষত্রিয়বৈশ্যৌ নিঘ্নন্ ব্রহ্মহা ভবতীতি দীক্ষাকবচং প্রবিষ্ট এব তস্থৌ দ্বিষষ্টিবর্ষাণি।[২৫]

বিষ্ণুপুরাণ বলেছে—এরপর অক্রূরপক্ষের ভোজেরা সাত্বতকুলের একজনকে মেরে ফেলার ফলে অক্রূর ভয়ে দ্বারকা ছেড়ে কিছু আত্মীয়স্বজনকে সঙ্গে নিয়ে অন্যত্র পালিয়ে গেলেন। বিষ্ণুপুরাণ এখানে আরেকটা হত্যাকাহিনীর উল্লেখ করলেও আমাদের ধারণা, হরিবংশের বয়ানমত, শতধন্বার দ্বারা সত্রাজিৎকে গুপ্তহত্যা করবার সঙ্গে সঙ্গেই অক্রূর তাঁর জ্ঞাতি-গুষ্টি কিছু অন্ধকদের সঙ্গে নিয়ে দ্বারকা ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। কারণ সত্রাজিৎ বধের পরিকল্পনার মধ্যে যে অক্রূর ভালভাবে জড়িত ছিলেন সে কথা অন্তত কৃষ্ণের কাছে লুক্কায়িত ছিল না, এবং তিনি যে তখনই অক্রূরকে কিছু বলেননি তার একমাত্র কারণ তাতে জ্ঞাতি-ভেদ সৃষ্টি হত।[২৬] শতধন্বাকে মেরে কৃষ্ণ সত্রাজিৎ-হন্তাকে সোজাসুজি শাস্তি দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু সমুচিত প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও অক্রূরের গায়ে হাত

তুললে যে জ্ঞাতিগুষ্টির মধ্যে গণ্ডগোল বাড়বে, সে কথা কৃষ্ণ ভালই বুঝতে পেরেছিলেন। তাছাড়া, রাজনীতিক হিসেবে অক্রূরও কম প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না, শতধন্বার মৃত্যুর পরেই তাঁকে ঘাঁটানো সমীচীন মনে করেননি কৃষ্ণ। কিন্তু অক্রূরকে বাগে পাবার জন্য নানারকম প্যাঁচ তিনি কষেই যাচ্ছিলেন।

হরিবংশ এবং পুরাণগুলি বলেছে যে, অক্রূর দ্বারকা ছেড়ে পালিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে অনাবৃষ্টি, মড়ক এবং আরও নানা উপসর্গ দেখা দিল। এগুলি নাকি সেই স্যমন্তক মণির প্রভাব। মণিটি যতদিন দ্বারকায় ছিল, ততদিন দ্বারকায় কোন আধিভৌতিক, আধিদৈবিক বিপদ ছিল না, কিন্তু অক্রূর মণি নিয়ে চলে যেতেই দ্বারকায় বিপৎপাত শুরু হল। কৃষ্ণ মনে মনে যাই আন্দাজ করে থাকুন, তিনি বৃষ্ণি, অন্ধক এবং ভোজবৃদ্ধদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। এক অন্ধকবৃদ্ধ বললেন—অক্রূরের বাবা শফল্ক যেখানে থাকতেন, সেখানে কোন আধিদৈবিক বিপৎপাত ঘটত না। উত্তরাধিকারসূত্রে অক্রূরেরও নাকি এই গুণ আছে। অতএব সবাই মত প্রকাশ করলেন অক্রূরকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনা হোক এবং তাও একেবারে বিনা প্রশ্নে, বিনা শর্তে—তদয়মানীয়তামিতি, অলমতিগুণবতি অপরাধান্বেষণেন ইতি।[২৭]

পারিবারিক রাজনীতির খেলাতেও কৃষ্ণ যে কত ধুরন্ধর তা বোঝা যাবে এই সময়ে। বৃষ্ণি-অন্ধকদের কথা মেনে নিয়ে তিনি নিজে, উগ্রসেন, বলরাম সহ অক্রূরের কাছে গিয়ে তাঁকে সমস্ত অভয় দিয়ে ফিরিয়ে আনলেন দ্বারকায়। অক্রূর যখন দ্বারকা ছেড়ে পালালেন, কৃষ্ণ তখনই বুঝেছেন যে মণিটি অক্রূরের সঙ্গে চলে গেছে। কৃষ্ণ জানতেন, একটার পর একটা যজ্ঞ করা সাধারণভাবে অক্রূরের পক্ষে সম্ভব ছিল না, কেননা তাঁর রেস্ত অত ছিল না—অল্পোপদানশ্চাস্য। অক্রূর দ্বারকায় ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বারকার সমস্ত বিঘ্ন শান্ত হয়ে গেল। কৃষ্ণ এবার নিশ্চিতভাবে বুঝলেন যে স্যমন্তক মণি অক্রূরের কাছেই আছে। ঠিক এই সময়ে কৃষ্ণ নিজের বাড়িতে যাদবদের এক সভা ডাকলেন। নির্ধারিত সময়ে কৃষ্ণ যাদবদের কাছে তাঁর সভা ডাকার উদ্দেশ্য পরিষ্কার করে বলে দিলেন। এরপর অক্রূর এসে পৌঁছোলে কৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে খানিক হাস্য পরিহাস করেই আসল কথা পাতলেন। তিনি বললেন—আমি জানি শতধন্বা পালানোর আগে স্যমন্তক মণিটি দিয়ে গেছে আপনার কাছেই। না, না, আপনার সঙ্কুচিত হওয়ার কোন কারণ নেই, মণিটি আপনার কাছেই থাকুক। মণির যে সুফল তা তো আমরা সবাই পাচ্ছি। আমার বক্তব্য শুধু একটাই—আমার দাদা বলরাম সন্দেহ করেন যে মণিটি আমি লুকিয়ে রেখেছি। আমাকে শুধু এই সন্দেহ এবং অপবাদ থেকে মুক্ত করার জন্য মণিটি একবার তাঁকেই দেখান—কিন্তু এষ বলভদ্রো'স্মান্ আশঙ্কিতবান্। তদস্মৎপ্রীতয়ে দর্শয়...।[২৮] দয়া করে আপনি অভদ্র ব্যবহার করবেন না। আজকে প্রায় ষাট বচ্ছর হয়ে গেল, আমি মণিটির জন্য ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম। পূর্বেকার সেই রাগ হয়তো এখন চলে গেছে, কিন্তু তবু সেই রাগ মনের মধ্যে এখনও ধিকিধিকি জ্বলছে—বৃষ্টিবর্ষে গতে কালে যদ্‌রোষো'ভূন্ মমানঘ। স সংরূঢ়ো'সকৃৎ প্রাপ্তস্ততঃ কালাত্যয়ো মহান্॥[২৯]

উপায়ান্তর না দেখে অক্রূর মণিহরণের কথা স্বীকার করলেন এবং মণিটি দেখালেনও বটে। নানা ওজর তুলে তিনি বললেন—শতধন্বার মৃত্যুর পর আমি

ভেবেছিলাম মণিটি আপনি চেয়ে নেবেন। আপনি আজ নেন কি কাল নেন এই ভেবে আমিই মণিটি এতকাল ধারণ করেছিলাম—এতাবন্তং কালম্ অধারয়ম্ (পাঠক যাস্কের উদ্ধৃতিটি খেয়াল করবেন, সেখানে 'ধারয়তি' অর্থে 'দদতে' প্রয়োগ আছে—অক্রূরো দদতে মণিম্)। আমি নিজেও এর জন্য বহু যন্ত্রণা সহ্য করেছি, নিশ্চিন্তে কোন সুখভোগও করতে পারিনি। এখন আপনি নিজে এই মণি গ্রহণ করে আমায় মুক্তি দিন। ইচ্ছে হলে অন্য কাউকে দিন—তদিদং স্যমন্তকরত্নং গৃহ্যতাম্, ইচ্ছয়া যস্যাভিমতং তস্য সমর্প্যতাম্। এই বলে মণিটি বার করে সবার সামনে রাখলেন।

হরিবংশ বলেছে—কৃষ্ণ নিজে অপবাদমুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তুষ্ট হলেন এবং মণিটি অক্রূরকে আবার ফিরিয়েও দিলেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুরাণ ভেতরের কথাগুলি ফাঁস করে দিয়েছে। বিষ্ণুপুরাণ বলেছে—অক্রূর মণিটি কৃষ্ণের হাতে দিতেই বলরাম ভাবলেন—শুধু কৃষ্ণ কেন আমিও এই মণির সমান অংশীদার—মমায়ম্ অচ্যুতেনৈব সামান্যঃ সমন্বীপ্সিতঃ—অতএব তিনি মণির ব্যাপারে কিঞ্চিৎ লালায়িত হলেন। কৃষ্ণমহিষী সত্যভামা ভাবলেন—এ আমার বাপের ঘরের জিনিস, বাপের সম্পত্তি মেয়েই পাবে—মমৈবেদং পিতৃধনমিতি, অতএব তিনিও মণিটি পেতে ইচ্ছা করলেন। এই অবস্থায় কৃষ্ণ একবার বলরামের মুখে চান, আরেকবার সত্যভামার মুখে, শেষে নিজের ঘরেই বিবাদ ডেকে আনার চেয়ে মণিটি তিনি অক্রূরকেই রাখতে দিলেন, কারণ তাতেই রাজ্যের উপকার, সবার উপকার।[৩০] দীর্ঘ ষাট বছর ধরে স্যমন্তকমণির অধিকার নিয়ে যে বিবাদ চলেছিল, কৃষ্ণের প্রায় বৃদ্ধবয়েসে সেই বিবাদ সম্মানজনক ভাবে মিটল। মহাভারতের মধ্যে কৃষ্ণ যে আক্ষেপ করেছিলেন, তার সমাধান হল এতদিনে। তবে একটা কথা এখানে বলতে হবে। মহাভারতের মধ্যে আহুক আর অক্রূরের যে ঝগড়ার কথা উল্লেখ করেছেন, তার বোধহয় কোন সূত্র এখানে পাওয়া গেল না। যে আহুক কংসপিতা উগ্রসেনেরও পিতা, তাঁর সঙ্গে অক্রূরের বিবাদ—এটা হতে পারে না। আবার বিমানবিহারী মজুমদার মশায় আরেক আহুকের কথা বলেছেন, যার একশত বলবান পুত্র ছিল এবং যার সম্বন্ধে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে ভরসা দিয়েছিলেন যে, দুর্যোধনের সঙ্গে বিবাদে এই আহুক যুধিষ্ঠিরের পক্ষে লড়বেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা হল এই আহুকের সঙ্গে অক্রূরের কোন বিবাদের কথা তো মহাভারত হরিবংশ কিংবা পুরাণে কোথাও নেই। কাজেই এ ব্যাপারটি একটু অন্যভাবে ভাবতে হবে। সকলেই লক্ষ্য করেছেন—কৃষ্ণ, বলরাম, অক্রূর, কৃতবর্মা—এইসব মানুষদের অনেকেই তাঁদের পূর্বতন বংশকার, উর্ধ্বতন পুরুষদের নামে পরিচিত ছিলেন—যেমন বৃষ্ণি, অন্ধক ইত্যাদি। রামায়ণের রামচন্দ্রকে অনেকেই ডেকেছেন রঘু বলে। আবার দেখেছি অনেকে যেমন বহু পূর্বতন পুরুষের নামে নিজের পরিচয় দিতেন, তেমনি অল্প পূর্ববর্তী বংশকারের নামেও পরিচয় দিতেন, যেমন একই লোক কখনও অন্ধক বলে, কখনও বা কুকুর বলে ; এমনকি অব্যবহতি পূর্বপুরুষের নামেও পরিচয় চলত যেমন, শূরের ছেলে বসুদেব অনেক সময়ই শূর বলেও পরিচিত। আমার বক্তব্য হল স্যমন্তক মণিটি কৃষ্ণ মূলত চেয়েছিলেন দেশের রাজা উগ্রসেনের জন্য এবং উগ্রসেনের পিতা হলেন আহুক। আহুক নিজে যথেষ্ট বিখ্যাত ছিলেন এবং আহুক বলতে এখানে

উগ্রসেনকেই বোঝানো হচ্ছে।

আমি যে ঠিক বলছি কিংবা আহুক বলতে উগ্রসেনকে ইঙ্গিত করার একটা ধারা যে দ্বাদশ/ ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত টিকে ছিল তার প্রমাণ দেবেন ভাগবত পুরাণের সবচেয়ে পুরানো টীকাকার শ্রীধরস্বামী। যদুবংশ ধ্বংসের নিমিত্তমাত্র যে মুষলটি কৃষ্ণপুত্র সাম্ব প্রসব করেছিলেন সেই মুষলটি ভেঙে ফেলেছিলেন আহুক যাকে শ্রীধরস্বামী বলেছেন "আহুক উগ্রসেনঃ" (শ্রীমদ্ভাগবতম ১১. ১. ১৯ শ্রীধরস্বামীর টীকা)। অক্রূর কংসের রাজসভায় মন্ত্রী ছিলেন এবং অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতাও বটে। কংসের মৃত্যুতে মথুরার নেতৃত্ব উগ্রসেনের হাতে চলে যায় এবং অক্রূরের প্রভাবও কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয় নিশ্চয়ই। কৃষ্ণ সবসময়ই উগ্রসেনের স্বার্থরক্ষা করে চলেছেন ঠিকই, কিন্তু অক্রূরকেও তিনি অবহেলা করেননি। এমনকি উগ্রসেনকন্যার সঙ্গে অক্রূরের বিবাহব্যবস্থাও কৃষ্ণই করেন। কিন্তু কংসের মৃত্যুর পর হতপ্রভাব অক্রূরের সঙ্গে শ্বশুর উগ্রসেনের একটা ক্ষমতার ঠাণ্ডা লড়াই চলছিলই। এই লড়াইতে কৃষ্ণ আর কি করবেন, মহাভারতের বয়ান মত, তিনি চেয়েছেন—উগ্রসেনেরই যেন জয় হয় আবার অক্রূরও যেন একেবারে পরাজিত না হন। এরই মধ্যে স্যমন্তক মণির ঘটনা। ঘটনারম্ভের ষাট বছর পরে স্যমন্তকমণিটি অক্রূরের কাছেই ফিরিয়ে দিয়ে কৃষ্ণ বলেছেন—আপনার কাছে যদি মণিটি থাকে তবে এই মথুরারাজ্যেরই উপকার—ত্বৎস্থঞ্চাস্য রাষ্ট্রস্যোপকারকং—আপনার কাছেই মণিটি থাকবে। এইভাবেই বৃহত্তর স্বার্থে রাজ্যোপকারের অছিলায় কৃষ্ণ হয়তো আহুক উগ্রসেন আর অক্রূরের ঠাণ্ডা লড়াই বৃদ্ধ বয়েসে হলেও খানিকটা মেটানোর চেষ্টা করেছিলেন। অক্রূর মণিরত্ন পূর্ববৎ ধারণ করলেন, আর বিষ্ণুপুরাণ বলল—তথেতি উক্ত্বা জগ্রাহ তন্মহামণিরত্নম্, যাকে অতিপ্রাচীন ভাষায় যাস্ক বলেছিলেন অক্রূরো দদতে মণিম্। শেষের এই সুদিনের কথা পুরাণকারেরা যতই বর্ণনা করুন না কেন, এই স্যমন্তক-মণিটি যে প্রথমে অক্রূর শঠতার মাধ্যমেই নিজের কাছে রেখেছিলেন, সে কথাটা বেশ চালু হয়ে গেছিল। তৃতীয়-চতুর্থ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই একটি বিখ্যাত নাটক কিংবা কাব্য লেখা হয়ে গিয়েছিল, যার নাম ছিল 'মণিহরণ'। এই গ্রন্থটি আজ হারিয়ে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য হল, এই কাব্য/নাটক গ্রন্থটি সনাতন ঐতিহ্যবাহী গ্রন্থপঞ্জী থেকে বাদ গেলেও একেবারে বিপরীতধর্মী বৌদ্ধ আচার্যরা কিন্তু অত্যন্ত সম্মান করে তার উল্লেখ করেছেন। বৌদ্ধ আচার্য স্থিরমতি, যিনি অসঙ্গ অথবা বসুবন্ধুর শিষ্য, তিনি 'মহাযান' নামে একটি গ্রন্থের নাম এবং গ্রন্থোপনিবদ্ধ বিষয়ের তাৎপর্য বোঝানোর জন্য দুটি সনাতনপন্থী বিখ্যাত গ্রন্থের উদাহরণ দেন এবং সেই দুটিই কৃষ্ণের জীবন সংক্রান্ত। একখানি তো 'কংসবধ', যার উল্লেখ মহর্ষি পতঞ্জলি পর্যন্ত করেছেন, আরেকটি হল এই 'মণিহরণ' যা অবশ্যই এই স্যমন্তক মণি বিষয়ক কাব্য কিংবা নাটক।[৩১]

অক্রূরের কৃতকর্মের বিচার থেকে আমরা একে মণিধারণই বলি আর মণিহরণই বলি, আমরা কিন্তু লক্ষ্যের থেকে উপলক্ষকে বড় করে ফেলেছি অর্থাৎ সত্যভামার থেকে স্যমন্তককে বেশি প্রাধান্য দিয়েছি। বাস্তবিকপক্ষে কৃষ্ণ-সত্যভামার বিবাহিত জীবনের ষাট বছর যদি চলে না যেত তাহলে যে সভায় স্যমন্তক মণি সর্বসমক্ষে কৃষ্ণের হাতে দেওয়া হল এবং যে মণির প্রতি

সত্যভামার সস্পৃহ কটাক্ষ নিক্ষিপ্ত হয়েছে, এই কটাক্ষকে অবহেলা করে কৃষ্ণের পক্ষে আর মণি ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হত না। এই স্ফুরিতাধরা রমণীটিকে কৃষ্ণ যে কি পরিমাণ সমঝে চলতেন তা বলে বোঝাবার নয়। সত্যভামার অজস্র রূপ-গুণ মুগ্ধ ভক্তদের ফাঁকি দিয়ে কৃষ্ণ সত্যভামাকে পেয়েছিলেন জীবনে।

কৃষ্ণ এ সৌভাগ্য জীবনেও ভুলতে পারেননি। এমনকি চৈতন্যযুগের আলঙ্কারিকরা পর্যন্ত বলেছেন—রুক্মিণী কৃষ্ণের বিনীতা প্রেয়সী বটে কিন্তু সত্যভামার সৌভাগ্যই বেশি—সত্যভামোত্তমা স্ত্রীণাং সৌভাগ্যে চাধিকাভবৎ। আমরা বলি সৌভাগ্য কৃষ্ণেরই, সারাজীবন ধরে সত্যভামার অজস্র আবদার তামিল করেছেন কৃষ্ণ। একমাত্র তিনিই পেরেছেন অন্তঃপুর ছেড়ে একা একা কৃষ্ণের সঙ্গে সেই বারণাবতে দেখা করতে যেতে। নরকাসুরকে বধ করবার সময় তিনি কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্র পর্যন্ত গেছেন। গরুড়বাহনে দুজনের ভাল করে জায়গা হয় না, তো কি, কৃষ্ণ তাঁকে প্রায় কোলে করেই নিয়ে গেছেন—অঙ্কে নিধায় দয়িতামিহ সত্যভামাম্।[৩২] তাঁর জন্য স্বর্গের ইন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণকে যুদ্ধ করতে হয়েছে। স্বর্গের নন্দনকাননের বুক থেকে ফুটন্ত পারিজাত ছিঁড়ে এনে লাগাতে হয়েছে সত্যভামার চুলে। কেন ? সত্যভামা স্পষ্ট কথায় জানিয়ে দিয়েছেন—সতীনদের মনে ঈর্ষার জ্বালা ধরবে, তাদের মধ্যে এই ফুল মাথায় গুঁজে আমি সগর্বে ঘুরে বেড়াব—বিভ্রতী পারিজাতস্য কেশপক্ষেণ মঞ্জরীম্। সপত্নীনাম্ অহং মধ্যে শোভেয়মিতি কাময়ে ॥ আর সত্যভামার এই সব আবদার যদি না শোনা যায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঠোঁট দুটি যাবে ফুলে, অনুযোগ করে তিনি বলবেন—মিথ্যে কথা, সব মিথ্যে, তুমি না বলেছ কৃষ্ণ, রুক্মিণী, জাম্ববতী কেউ আমার তত প্রিয় নয়, যেমনটি তুমি—ন মে জাম্ববতী তাদৃগ্ অভীষ্টা ন চ রুক্মিণী।[৩৩] সত্যভামা এখানেই থামলেন না। বললেন—

এ কথা যদি নিছক চাটুবাক্য না হয় তাহলে এই পারিজাত বৃক্ষ তুলে নিয়ে যেতেই হবে দ্বারকায়, আর সেই ফুল খোঁপায় গুঁজে আমি সতীনদের মনে জ্বালা ধরিয়ে দেব। শেষ পর্যন্ত সত্যভামার কথা ফেলতে না পেরে দেবরাজের সঙ্গে এক বিরাট যুদ্ধ লাগিয়ে দিলেন কৃষ্ণ। অন্যদিকে ইন্দ্রেরও বলিহারি যাই। তিনিও শচীর কথায় ওঠ-বোস করে, ক্রোধান্বিত হয়ে চলে গেলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। অলঙ্ঘ্য নিয়মে যুদ্ধের ফল কৃষ্ণের স্বপক্ষে গেল। অবশেষে দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে রসরাজ কৃষ্ণের যখন বোঝাপড়া হয়ে গেল তখন কিন্তু বিগলিত হয়ে আসল কথাটি স্বমুখেই ফাঁস করেছেন কৃষ্ণ, বলেছেন এত সব যুদ্ধ-বিগ্রহ—তার কারণ স্ত্রীর বচন—সত্যা-বচন-কারণাৎ। সত্যভামার আদরের নাম—সত্যা।[৩৪]

সতীন-কাঁটা বলতে যা বোঝায়, সত্যভামার কাছে তাঁরা দুজন হলেন জাম্ববতী, আরেকজন রুক্মিণী। কৃষ্ণের আর যেসব স্ত্রী ছিল, তাদেরকে সত্যভামা বোধহয় পাত্তাই দিতেন না, ভাবে বুঝি কৃষ্ণও তাঁদের খুব একটা পাত্তা দিতেন না, না হলে সদা মানিনী সত্যভামার মুখে তাদের নাম বাদ পড়ার কথা নয়। আরেক কথা, রুক্মিণী এবং জাম্ববতীর বিয়ে যেহেতু সত্যভামার আগেই হয়েছিল, তাই সত্যভামার ঈর্ষা ছিল প্রধানত এই দুজনের ওপরেই। সত্যভামার সঙ্গে বিয়ে হবার পরেও কৃষ্ণের অন্য স্ত্রীদের প্রভাব কৃষ্ণের ওপরে থাকবে—এটা সত্যভামা বিশ্বাস করতেন না। সত্যি কথা বলতে কি, বিশ্বাস না করার কারণও আছে।

রুক্মিণী এবং সত্যভামা বাদে আর যিনি কৃষ্ণের মনে প্রেমের মন্ত্র গুঞ্জরণ করতেন, তিনি বোধহয় জাম্ববতী। জাম্ববতী হয়তো ছিলেন কোন অনার্যজাতির মেয়ে, যারা 'টোটেম' হিসেবে ব্যবহার করত একটি ভল্লুককে। হরিবংশ জাম্ববতীর বাবাকে চিনিয়েছে ভল্লুকদের রাজা বলে কিন্তু মহাভারত জাম্ববতীকে বলেছে 'কপীন্দ্রপুত্রী' বলে, তার মানে বানর রাজার মেয়ে। ভালুক কিংবা বানরের গবেষণা না করেও বোঝা যায় যে, জাম্ববতী ছিলেন অনার্যপ্রসূতা,—আর্যদের অপ্সরী-কিন্নরী বিয়ে করা মিষ্টি-মুখে হয়তো এই অনার্যরমণীরাই তেঁতুলের কাজ করতেন। তাই জাম্ববতীও কৃষ্ণের প্রিয় পাত্রী হয়ে উঠেছিলেন। শিলালিপিগুলির মধ্যে প্রথম যেটিতে কৃষ্ণমহিষীদের কথা পাই সেটি হল চতুর্থ খ্রিস্টাব্দের তুসমের প্রস্তরলিপি। পাটরানী রুক্মিণী নয়, মানিনী সত্যভামা নয়, কৃষ্ণ এখানে বর্ণিত হয়েছেন জাম্ববতী নামে যে কমলিনী তার মধুকর হিসেবে।[৩৫] এই একটিবার মাত্র জাম্ববতীর সৌভাগ্য উদয় হয়েই যেন অস্তাচলের শেষরেখাটির মত তুসম পাহাড়ের ফলক-খানি রাঙিয়ে দিল। কৃষ্ণ যে মধুকর, উদ্ধবের কাছে গোপীরাও তাই বলেছে, পাহাড়ে খোদাই করা লিপিও তাই বলে। আসলে রুক্মিণী আর সত্যভামাকে বিয়ে করে কৃষ্ণ যে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চেয়েছিলেন, সেটি সফল হয়নি। রুক্মিণীর জন্য শিশুপাল, জরাসন্ধের ঝামেলা যেমন বেড়েই চলল, তেমনি সত্যভামা আর তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি স্যমন্তক মণি নিয়ে সমগ্র যাদবকুলের মধ্যে গোলমাল বেধেই রইল। বিয়ে করে যেখানে সুবিধে হওয়ার কথা, সেখানে ঘরে-বাইরে—নানা অসন্তোষ বেড়েই চলল। তবু কৃষ্ণ আরও কিছু বিয়ে করে ফেললেন, যদিও সেই বিবাহিতা রমণীদের নাম সম্বন্ধে হরিবংশ দু-জায়গায় দুরকম লিস্টি দিয়েছে, বিষ্ণু পুরাণের সঙ্গেও সে লিস্টির পুরোপুরি মিল হয় না। বেশ বোঝা যায় এই সব স্ত্রীরা কৃষ্ণের অন্তঃপুরের শোভামাত্র, এঁরা কোনদিনই কৃষ্ণের হৃদয় অধিকার করতে পারেননি। আর ছিল সেই ষোল হাজার একশ মহিলা, যাঁদের মধ্যে অপ্সরী, দেবী, মানুষী সবাই ছিলেন।

হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ এবং অন্য সমস্ত পুরাণগুলো একবাক্যে স্বীকার করেছে যে এই ষোল হাজার একশ মহিলাকে আসামের রাজা নরকাসুর বিভিন্ন জায়গা থেকে ধরে এনেছিলেন। ভাবীকালে কৃষ্ণের সঙ্গে বিয়ে হবে বলে পুরাণকারেরাও এই যুবতীদের একেবারে একবেণীধরা সতী বলে উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু কৃষ্ণ যখন বিজিত এবং মৃত নরকাসুরের ধনসম্পত্তি দ্বারকায় নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছায় আসামের মণি পর্বতে ঢুকলেন, তখন হরিবংশকার যেভাবে বর্ণনা দিয়েছেন তা বড়ই অদ্ভুত। কৃষ্ণ ঢুকেই দেখতে পেলেন সেখানে রক্ষিত আছে সেই সব মেয়েরা, যারা গন্ধর্ব এবং অসুরমুখ্যদের বড়ই প্রিয়—গন্ধর্বাসুর-মুখ্যানাং প্রিয়া দুহিতরস্তথা। গন্ধর্ব এবং অসুরদের ব্যক্তিগত ন্যায়নীতি বোধ সম্বন্ধে অন্যত্র পুরাণকারদের মতামত মোটেই অনকূল নয়, কিন্তু তাদের মেয়েদের নাকি নরকাসুর একটুও বিরক্ত করেননি—এবং তাঁরা নাকি সব কাম-টামের ব্যাপার একেবারে বর্জন করে দেবীর মত সুখে বাস করছিলেন—সুখিন্যঃকামবর্জিতাঃ। নরকাসুর লোকটা খুব ভালো বলতে হবে, যিনি শুধু 'আর্ট ফর আর্টস সেক' সুন্দরী সুন্দরী মহিলাদের দূর দূরান্ত থেকে চয়ন করে আনতেন। কিন্তু কৃষ্ণের

ব্যবহারটি দেখুন—এতগুলো সুন্দরী মেয়ে দেখে তাঁর অন্য কোন প্রত্যঙ্গ সৌন্দর্য নজরে পড়ল না, তিনি দেখলেন—দদর্শ পৃথুলশ্রোণীঃ সংরুদ্ধা গিরিকন্দরে। এতগুলি স্থূলনিতম্ববতী মেয়ে এক সঙ্গে দেখে কৃষ্ণ নিশ্চয়ই বোকার মত দাঁড়িয়ে ছিলেন না ; বরঞ্চ অভিজ্ঞ পুরুষটি যখন দেখলেন সব মেয়েগুলিই এক সঙ্গে তাঁকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিল, সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বর এবং অভয় দুটিই তাঁদের দান করলেন।

হরিবংশ কিংবা পুরাণগুলি নরকাসুরের আনা এই কন্যাগুলির কুলশীলের কোন পরিচয় দেয়নি, তবে এঁদের চরিত্র যে একেবারে ঘৃতশুদ্ধ ছিল না, তা নানা কারণেই মনে হয়। এ বিষয়ে বরাহ পুরাণ এবং সাম্ব পুরাণ—এ দুটিই আমাদের সাক্ষী দেবে। আমি আগেই বলেছি রুক্মিণী জাম্ববতী এবং সত্যভামা—এই তিনজনের ভালবাসাতেই আঁধার-আলোয়, ভাল-মন্দে কৃষ্ণের দিনগুলি কেটে গেছে। অন্যদিকে এই তিনজনই কৃষ্ণের শত মধুকরবৃত্তি ক্ষমা করেও স্বামীর অনুরক্তা। কিন্তু আর যাঁরা—সে মিত্রবিন্দাই হোক কি নাগ্নজিতী, সে ভদ্রা, কালিন্দীই হোক কি রোহিণী—এঁরা কেউই কৃষ্ণের প্রতি সুনিষ্ঠ ছিলেন বলে মনে হয় না, নরকাসুর সঞ্চিতা পৃথুলশ্রোণীদের কথা তো বাদই দিলাম। মহাভারতকার বলেছেন যখন বৃষ্ণি অন্ধক বংশ ধ্বংস হয়ে গেল, কৃষ্ণ-বলরাম লোকান্তরিত হয়েছেন, তখন অর্জুন দ্বারকায় গেছিলেন বৃষ্ণি-স্ত্রীদের রক্ষা করতে। আমার ধারণা বৃষ্ণি নয়, তাঁরা কৃষ্ণেরই স্ত্রী এবং সংখ্যায় তাঁরা ছিলেন সহস্র। যখন পুরোদমে লুঠতরাজ চলছে তখন অর্জুন দস্যুদের পেছনে একটা নিষ্ফল ধাওয়া করলেন। মহাভারত জানাচ্ছে সেই হাজারো স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেককেই দস্যুরা টেনে নিয়ে গেল অর্জুনের সামনেই আর অনেকে ইচ্ছে করেই কামবশত দস্যুদের সঙ্গে চলে গেল—সমন্ততোঽবকৃষ্যন্ত কামাচ্চান্যাঃ প্রবব্রজুঃ।[৩৬] এরা নাকি পঞ্চনদী অঞ্চলের দস্যু আভীর জাতের মানুষ—আভীরৈরপসৃত্যাজৌ হৃতাঃ পাঞ্চনদালয়ৈঃ।[৩৭]

এই যে সহস্র-স্ত্রীলোকেরা ইচ্ছে করে দস্যুদের সঙ্গে পালিয়ে গেল, হিসেব কষলে তাদের বয়স তখন কম হবে না, কিন্তু সেই বয়সেও যে তাদের ভোগবাসনার বীজ লুপ্ত হয়নি, তা তো প্রমাণ হয়েই গেল। আমাদের ধারণা এই সব কটি স্ত্রীলোকই সেই নরকাসুরের ঘর থেকে আনা, যাদের দিকে চোখ পড়লে হরিবংশকার পর্যন্ত আর কিছুই দেখতে পান না, শুধু খেয়ালে আসে 'পৃথুলশ্রোণীঃ'। খুব সম্ভব এঁরাই পালিয়ে ছিলেন নিজের ইচ্ছেয়, আর এঁরা যে সব কৃষ্ণেরই স্ত্রী ছিলেন তার প্রমাণ দেবে সাম্ব পুরাণ। তবে তার আগে বরাহ পুরাণের কথাটা বলি, সাম্বের প্রসঙ্গ সেখানেও আসবে।

সাম্ব হলেন জাম্ববতীর ছেলে, তাঁর মত সর্বাঙ্গসুন্দর পুরুষ তাঁর যুগে দ্বিতীয়টি ছিল না। হরিবংশ বলেছে, যে বছরে রুক্মিণীর ছেলে প্রদ্যুম্নকে সম্বরাসুর ধরে নিয়ে গেল সেই বছরেই সাম্বের জন্ম। জন্মের পর থেকেই সাম্ব যে জন্য বিখ্যাত, সে হল তার রূপ। বরাহ পুরাণের মতে নারদ কৃষ্ণকে জানালেন যে তাঁর ষোল হাজার স্ত্রীই সাম্বের রূপে মত্ত। সাম্ব এবং এই স্ত্রীদের অবৈধ আচার-আচরণ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে নারদ সেই কুৎসা ব্রহ্মলোকে থেকেও শুনতে পেয়েছেন। নিজেরই ঔরসজাত পুত্র, কি করেই বা পরীক্ষা করা যায় ? শেষ

পর্যন্ত নারদের কথার সত্যতা যাচাই করতে কৃষ্ণ সাম্বকে উপস্থিত হতে বললেন তাঁর আপন স্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে। কৃষ্ণ সবিস্ময়ে লক্ষ করলেন যে সাম্ব এলেন, দেখলেন এবং তাঁর আপন স্ত্রীদের জয় করলেন।[৩৮]

সাম্ব পুরাণে, নারদ যে কৃষ্ণের কান ভাঙাচ্ছেন তার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল। সাম্ব নাকি নিজের রূপ-যৌবনে মত্ত হয়ে সর্বদাই ক্রীড়া করে বেড়াতেন এবং নারদকে যথেষ্ট ছেদ্ধা-ভক্তি করতেন না। এতে নারদ রুষ্ট হয়ে ভাবলেন সাম্বকে উচিত শিক্ষা দেবেন—করিষ্যে বিনয়ং ভৃশম্। নারদ কৃষ্ণকে বললেন—আপনার ষোল হাজার বৌ তো বটেই এমনকি আপনার পত্নীরাও মানে রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী ছাড়া, আর সবারই মন পড়ে আছে সাম্বের কাছে—সর্বাসাং চ মনাংসি আসাং সাম্বেন কিল কেশব।[৩৯]

নারদ কৃষ্ণকে বললেন—এই কথাটা বলা আমার ভুল হল, কিন্তু বলা উচিত বলে বললাম। ব্যাপারটা চলছিলই, কৃষ্ণের অগোচরে। গো-ব্রাহ্মণের হিতকারী কৃষ্ণকে এতদিন কেউ বলার সাহস পাননি। কিন্তু সংসারের এই অপবাদ ব্রহ্মলোকে না হোক লোকমুখে চলছিলই। নারদ সে কথাটা কৃষ্ণকে জানিয়েছেন মাত্র। সত্যান্বেষীর মত কৃষ্ণ এখানে নারদকে বিশ্বাস করেননি প্রথমে। তারপর যখন সস্ত্রীক ক্রীড়া করবার সময় সাম্ব সেখানে উপস্থিত হলেন, তখন কৃষ্ণ দেখলেন তাঁর স্ত্রীদের অবস্থা খুবই খারাপ। এমনকি সাম্বকে দেখে—যোষিতাম্ অল্পসত্ত্বানাং যোন্যঃ শীঘ্রং প্রসুস্রুবুঃ। সাম্ব পুরাণ অবশ্য বলেছে কৃষ্ণস্ত্রীরা সে সময় প্রচুর মদও খেয়েছিল এবং তাতে কৃষ্ণের রাগটা আরও বেড়ে গিয়েছিল। একটি শাপে সাম্বকে কৃষ্ণ-পরিণত করলেন এক কুষ্ঠরোগীতে। আর পত্নীদের তিনি বললেন—স্বামী থাকা সত্ত্বেও তোমাদের মন যখন অন্য জায়গায় পর পুরুষে ধরেছে— যস্মাদ্ ধৃতানি চেতাংসি মাং মুক্ত্বান্যত্র বঃ স্ত্রিয়ঃ—তখন আমার লোকান্তরের পর তোমরা পতিলোক প্রাপ্ত হবে না এবং অরক্ষিত অবস্থায় দুস্যুহস্তে পতিত হবে।[৪০]

সাম্ব পুরাণে বসিষ্ঠ এই গল্প বলে নিজে মন্তব্য করলেন—হরির এই শাপেই তাঁর স্ত্রীরা অর্জুনের সামনেই পঞ্চনদীয় দস্যুদের দ্বারা অপহৃত হয়েছিলেন। তাহলে মহাভারতের সেই সহস্র সকামা রমণীদের সম্বন্ধে আমাদের যে অনুমান ছিল বসিষ্ঠ সেই মতের পরিপোষণা করলেন। কৃষ্ণের শাপের আওতা থেকে বাদ পড়েছিলেন তিনটি মাত্র রমণী—রুক্মিণী, জাম্ববতী এবং সত্যভামা— মুক্ত্বা তিস্রঃ পতিব্রতাঃ। এতে স্পষ্ট বোঝা যায়, কৃষ্ণের অন্য পাঁচ প্রধানা মহিষীও বাসনার দূষণমুক্ত ছিলেন না অথবা কৃষ্ণও তাঁদের স্ববশে রাখতে পারছিলেন না।

কৃষ্ণ বশে রাখতে পারেননি কিংবা তাঁরা বশগত হননি অথবা তারা বশ্যা ছিলেন না—এ সব কিছুর ফলশ্রুতি একই, মহামতি কৃষ্ণের ব্যক্তিজীবনের পক্ষে সে ফল করুণ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

তাহলে কি দাঁড়াল? বহির্বিশ্বে যে মানুষটি একটু একটু করে ক্ষমতার চূড়োয় উঠেছিলেন, সেই কৃষ্ণের চোখের সামনেই কুরুবংশ নিষ্প্রদীপ হল, পাণ্ডবদের শিবরাত্রির সলতে পরীক্ষিৎ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জনমেজয়ে পরিণত হলেন আর সে মানুষটির জীবন কেটে গেল—কবে ঘি খেয়েছিলেন, সেই পিতামহ কাহিনীর গল্প শুনতে শুনতেই। অপিচ কৃষ্ণের নিজের জ্ঞাতি-গুষ্টি

ভোজ-বৃষ্ণি-অন্ধকেরা নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি, হানাহানি করে মরল। রাজনীতি কি বিচিত্র বস্তু। আসলে কৃষ্ণ কংসবধ করেছিলেন বটে, কিন্তু কংসের বলদর্পিতার আগুনটি তিনি নিজে আত্মস্থ করেছিলেন। সেই আগুন জরাসন্ধকে পুড়িয়েছে, কৌরবদের পুড়িয়েছে, শেষে সেই আগুন তাঁর নিজের ঘরেও এসে লাগল—তিনি শেষরক্ষা করতে পারলেন না। ক্রমিক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটা এমনভাবেই তাঁর মজ্জায় মজ্জায় ঢুকে গিয়েছিল যে, এই প্রতিষ্ঠা, আরও প্রতিষ্ঠা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কৃষ্ণের পেছন পেছন ঘুরেছে। এতে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সুখ নির্ভর করেছে শুধুমাত্র স্ত্রীদের সতীত্বের ওপর আর তাঁর জ্ঞাতি-গুষ্টিরা একে অন্যের থেকে শুধু বলবান হয়ে উঠেছিল। তার ফলে আহুক উগ্রসেন আর অক্রূরে বনিবনা হয় না, বলরাম শুধু সুরাপানের মাত্রা চড়িয়ে কারণে অকারণে বলদর্পী হন। কৃষ্ণের ওপরেও তাঁর যে আস্থা নেই এবং বলরামের ওপরেও যে কৃষ্ণপক্ষীয়দের আস্থা ছিল না তা বহুভাবে প্রমাণিত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের উদ্যোগ-আলোচনায় বলরামকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেন যুযুধান সাত্যকি, যিনি কৃষ্ণের আপন ঘরের লোক, ভাই। অথচ সাত্যকির সঙ্গে আরেক নাম করা বৃষ্ণিবীর কৃতবর্মার বনিবনা হয় না, যে কৃতবর্মা সাত্যকি-কৃষ্ণের বিপক্ষে কৌরবপক্ষে যোগ দেন। এরকম একটা কথা বেশ চালু হয়েছে যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বে কৃষ্ণ অর্জুনকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন—হয় নারায়ণী সেনা নাও, নয় নিরস্ত্র আমাকে নাও। অর্জুন নিরস্ত্র কৃষ্ণকে বরণ করলেন আর দুর্যোধন (সে নাকি বোকা) নিলেন নারায়ণী সেনা।

এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার নারায়ণী সেনা কৃষ্ণেরই প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত এক বিশেষ শক্তিমান সেনাবাহিনী যা কেবলই গোপালকদের দ্বারা তৈরী এবং যারা যুদ্ধে কৃষ্ণকেও হার মানাতে পারে—মৎসংহননতুল্যানাং গোপানাম্ অর্বুদং মহৎ। নারায়ণা ইতি খ্যাতাঃ... ॥[৪১] আমি আগেই বলেছি গোপেদের সঙ্গে অন্ধক-বৃষ্ণিদের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। কৃষ্ণ গোপেদের দিয়ে এই বাহিনী তৈরী করে তার নাম দিয়েছিলেন—নারায়ণী সেনা, এখনকার ভাষায় যাকে বলা যায় 'নারায়ণ রেজিমেন্ট'। কংসের সম্মুখীন হবার সময় এই বাহিনীর সহায়তা কৃষ্ণ গ্রহণ করেছিলেন কিনা সে খবর ইতিহাস দেয়নি, কিন্তু একেবারে মৃত্যুর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কংস আদেশ দিয়েছিলেন—সমস্ত গোপেদের বার করে দাও আমার রাজ্য থেকে—গোপানামপি মে রাজ্যে ন কশ্চিৎ স্থাতুমর্হতি।[৪২] শুধুমাত্র কৃষ্ণ-বলরামের ওপর আক্রোশেই যদি কৃষ্ণাশ্রিত গোপেদের ওপর কংসের রাগ হয়ে থাকে সে কথা আলাদা, কিন্তু মহাভারতের নারায়ণী সেনা গোপেদের সেনা। আমার বক্তব্য কিন্তু এখানে নয়, মহাভারতে কৃষ্ণ আর নারায়ণী সেনার বিকল্প শুধুমাত্র কৃষ্ণনির্ভর ছিল, কিন্তু সাত্বতকুলের যুযুধান সাত্যকি, যিনি কৃষ্ণের ভাই এবং নিশ্চয়ই কোন সংঘমুখ্য, তিনি চতুরঙ্গ সেনা সঙ্গে পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়েছিলেন—যুযুধানস্ততো বীরঃ সাত্বতানাং মহারথঃ। মহতা চতুরঙ্গেন বলেনাগাদ্ যুধিষ্ঠিরম্ ॥ অপরদিকে কৃতবর্মা যিনি আরেক সংঘমুখ্য হবেন এবং যিনি কৃষ্ণের সঙ্গে যথেষ্ট সম্পর্কিত, তিনি ভোজ, অন্ধক এবং কুকুরবংশের ব্যক্তিগত অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে যোগ দিলেন দুর্যোধনের পক্ষে—কৃতবর্মা চ হার্দিক্যো ভোজান্ধকুকুরৈঃ সহ। অক্ষৌহিণ্যৈব সেনায়া

দুর্যোধনমুপাগমৎ ॥[৪৩] লক্ষণীয় বিষয় হল, এখানে মহাভারতকার উদ্যোগপর্বের উচ্ছ্বাসে অথবা অভ্যাসে বলেছেন যে, সাত্যকি চতুরঙ্গবাহিনী নিয়ে পাণ্ডবপক্ষে যোগ দেন। কিন্তু তা ঠিক নয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের একেবারে শেষ পর্যায়ে ভীম আর দুর্যোধন যখন গদাযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত তখন বলরাম সেখানে উপস্থিত হলেন। ঠিক সেই সময়ে বৃষ্ণি-ভোজদের কথা আবার উঠল। বলরাম কৃষ্ণকে বলেছিলেন—তুমি দুর্যোধনদেরও সাহায্য কর। তাতে কৃষ্ণ ক্ষেপে গেলেন এবং বলরাম চলে গেলেন তীর্থযাত্রায়। কিন্তু এই দুই ভায়ের মতবিরোধের সুযোগ নিয়ে অনুরাধা নক্ষত্রের শুভযোগে কৃতবর্মা সমস্ত যাদবদের নিয়ে যোগ দিলেন কৌরবপক্ষে—মৈত্রনক্ষত্রযোগেণ সহিতঃ সর্বযাদবৈঃ। আশ্রয়ামাস ভোজস্তু দুর্যোধমন্ অরিন্দম ॥ সাত্যকি কিন্তু একাই কৃষ্ণের সঙ্গে যোগ দিলেন পাণ্ডব পক্ষে—যুযুধানেন সহিতঃ বাসুদেবস্তু পাণ্ডবান্।[৪৪] সাত্যকি অর্জুনের শিষ্য, তাই বোধহয় এই কৃতজ্ঞতা।

আগেই বলেছি সত্যভামা এবং স্যমন্তকের অধিকার নিয়ে কৃতবর্মা কিভাবে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে চলে যান। কৃষ্ণের সঙ্গে তার শত্রুতা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছিল তা বোঝা যাবে কৃষ্ণের ভাগ্নে এবং অর্জুনের পুত্র অভিমন্যুবধে। সপ্তরথীর যে চক্রব্যূহ অভিমন্যু ভেদ করেছিলেন, তার অন্যতম প্রধান রথী ছিলেন কৃতবর্মা। অভিমন্যু হলেন সেই মানুষটি যাঁর মধ্যে তাঁর মাতুল কৃষ্ণের অসাধারণ গুণগুলি এবং পাণ্ডবদের উত্তরাধিকার—দুইই আছে—যে চ কৃষ্ণে গুণাঃ স্ফীতাঃ পাণ্ডবেষু চ যে গুণাঃ। অভিমন্যৌ কিলৈকস্থা দৃশ্যন্তে গুণসঞ্চয়াঃ ॥ বৃষ্ণিকুলের পরমপ্রিয় এই ভাগিনেয় অভিমন্যু এবং পাণ্ডবদের আদরের দুলাল—তাঁকে বধ করার অন্যতম অংশীদার বৃষ্ণিকুলেরই কৃতবর্মা। কৃতবর্মা শুধু অভিমন্যুর গায়ে প্রখর শরাঘাত করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি শুধু পাণ্ডবদের বিপক্ষে প্রবল পরাক্রম দেখিয়েই ক্ষান্ত হননি—এই কৃতবর্মা ছিলেন সেই সাংঘাতিক পাপকর্মের জন্য দায়ী, যে পাপ তাঁর স্বপক্ষীয় দুর্যোধন পর্যন্ত ক্ষমা করেননি। যে তমসাবৃত রাত্রিতে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থমা পাণ্ডবদের পাঁচটি পুত্রকে ঘুমন্ত অবস্থায় মেরে রেখে এলেন, সেদিনও দ্বাররক্ষীর কাজটি করেছিলেন এই কৃতবর্মা।

এতগুলি অপকর্ম করেও কৃতবর্মা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত পার পেয়ে গেছিলেন। রথী-মহারথীদের যুদ্ধে পতন ঘটলেও কৃতবর্মা অক্ষত ছিলেন এবং যুদ্ধশেষে তিনি ফিরেও এসেছিলেন দ্বারকায়। কৃষ্ণ ফিরে এসে বসুদেবকে যথারীতি যুদ্ধের খবর দিয়েছেন কিন্তু অভিমন্যুর ব্যাপারে কৃতবর্মার অন্যায় আচরণের কথা কৃষ্ণ বলেননি—সে কি জ্ঞাতিভেদের ভয়ে, না শুধুই ভয়ে! কৃতবর্মাকে তিনি কখনই ঠেকাতে পারেননি। শেষে কৃষ্ণপুত্র সাম্বের দুর্মতিতে যদুবংশের মধ্যে যে মুষল-যুদ্ধ আরম্ভ হল সেইদিন কৃতবর্মাকে বাগে পেলেন সাত্যকি। সমস্ত মহাভারতখানি কুরু-পাণ্ডবের আত্মকথা হলেও মহাভারতের মৌষলপর্বখানি কিন্তু বৃষ্ণি-অন্ধক-ভোজ-যাদবদের ইতিহাস, যদিও তা ধ্বংসের ইতিহাস। এই ধ্বংসের আরম্ভটা ছিল সাংঘাতিক। মদ, মাংস মেয়েমানুষ কোনটারই অভাব ছিল না। স্বয়ং বলরাম কৃষ্ণের সামনেই কৃতবর্মার সঙ্গে মদ্যপান আরম্ভ করলেন—রামঃ সহিতঃ কৃতবর্মনা। অন্যদিকে সাত্যকি, গদ এবং বভ্রু একসঙ্গে মদ্যপান আরম্ভ করলেন। কৃষ্ণ কাউকে বারণ করলেন না।

মদের ঝোঁকে সাত্যকির মুখ দিয়ে এবার সত্যি কথা বেরোতে আরম্ভ করল। তিনি বললেন—কিরে ব্যাটা কৃতবর্মা, মৃতের মত ঘুমন্ত পাঁচটি বাচ্চা ছেলেকে তুই মেরে এলি, তোর এই অধর্ম যাদবরা কখনও ক্ষমা করবে না।[৪৫] সাত্যকির এই অবজ্ঞা, অবহাস সম্পূর্ণ সমর্থন করলেন কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন। কৃতবর্মাকে বাঁহাতের আঙুল নাচিয়ে উত্তর দিতে দেখে—নির্দিশন্নিব সাবজ্ঞং তদা সব্যেন পাণিনা—সাত্যকি এবার কৃষ্ণের সামনেই সেই সত্যভামা আর স্যমন্তকের পুরানো কাসুন্দি ঘেঁটে তুললেন। কাহিনী শুনে সত্যভামা পুরানো পিতৃমণির শোকে কৃষ্ণের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। নিজেও তিনি যেমন রেগে উঠলেন, কৃষ্ণকেও তেমনি খেপিয়ে তুললেন। তবু কৃষ্ণ কাউকে কিছু বললেন না। এবারে সাত্যকি খড়্গ নিয়ে লাফিয়ে পড়লেন কৃতবর্মার মাথায়। কৃতবর্মার মাথা কাটা গেল—এতদিনের পুরানো হিস্যা এই মিটল। কিন্তু তাতে কি ? সাত্যকিও মারা পড়লেন কৃতবর্মাপক্ষীয়দের হাতেই। এগিয়ে এলেন প্রদ্যুম্ন, এবারে চুলোচুলি লড়াই আরম্ভ হল—তাতে পিতার হাতে পুত্র মারা পড়ল, পুত্রের হাতে পিতা—যদুবংশ ধ্বংস হল।[৪৬] তিলে তিলে যে গৌরব, যে ক্ষমতা বৃষ্ণি-অন্ধকদের জন্য পুঞ্জীভূত করেছিলেন কৃষ্ণ, ক্ষমতালিপ্সু সংঘমুখ্যদের কারণেই সেই গৌরব চুরমার হয়ে গেল।

যাদব-বৃষ্ণি বীরেরা একের সঙ্গে অপরে ল'ড়াই করে যখন সবাই শেষ হয়ে গেল, তখন সারথি দারুককে দিয়ে কৃষ্ণ খবর পাঠালেন অর্জুনকে। সেই সময়ে দ্বারকার স্ত্রীদের রক্ষার কথা তাঁর মনে পড়ল—স্ত্রিয়ো ভবান্ রক্ষিতুং যাতু শীঘ্রং। বলরামকে বললেন, একটু অপেক্ষা করুন আর্য—যাবৎ স্ত্রিয়ো জ্ঞাতিবশাঃ করোমি। বসুদেবকে কৃষ্ণ বললেন—কিছুক্ষণের জন্য আপনি স্ত্রীদের রক্ষা করুন, যতক্ষণ অর্জুন না এসে পৌঁছোয়—স্ত্রিয়ো ভবান্ রক্ষতু নঃ সমগ্রা ধনঞ্জয়স্যাগমনং প্রতীক্ষন্।

কৃষ্ণ বুঝেছিলেন—ঘরে পুরুষমানুষ না থাকলে স্ত্রীরা খারাপ হয়ে যাবে। হাসি পায়, যে মানুষটি জনে জনে স্ত্রীরক্ষার কথা বলে আপন দায়িত্ব পালন করছিলেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বে সেই কৃষ্ণকে দুই সেনাবাহিনীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে অর্জুন বলেছিলেন যুদ্ধ করব না কৃষ্ণ, যুদ্ধে কুলক্ষয় হলে যে অধর্ম হবে, সে অধর্মে নষ্ট হয়ে যাবে পাণ্ডব-কৌরবের সকল কুলকামিনীরা—অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ। কুলস্ত্রীরা দুষ্ট হলে উপযুক্ত পুরুষের অভাবে বর্ণসংকর তৈরী হবে, পূর্বপুরুষেরা পিণ্ড পাবেন না। কিন্তু এত আর্তি, এত ভবিষ্যদ্ দৃষ্টি কৃষ্ণের চোখে তখন পড়েনি। তিনি বলেছিলেন—এসব হৃদয়ের দুর্বলতা, এগুলি ত্যাগ করতে হবে, যুদ্ধ করতেই হবে—ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ। আজকে যখন নিজেদের মধ্যে হানাহানি করে যদু-বৃষ্ণি পুঙ্গবেরা সবাই মরল, তখন কি কৃষ্ণের অর্জুনের সেই কথাগুলি মনে পড়ল—অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ। কিন্তু তখন বড় দেরী হয়ে গেছে। অর্জুন এসেও তাঁদের রক্ষা করতে পারলেন না। ষোড়শস্ত্রীসহস্রানি বাসুদেবপরিগ্রহঃ—তাদের কতজনকে দস্যুরা ছিনিয়ে নিল, আর কতক নিজেই পালালেন—কৃষ্ণের বহুকাল অনুপস্থিতিতে তাঁরা বুঝি বা দুষ্ট হয়েই ছিলেন। রুক্মিণী জাম্ববতী আগুনের শরণ নিলেন সত্যভামা তপস্যার জন্য গেলেন বনে।

ধর্ম, ধর্মযুদ্ধের এই কি পরিণতি, বাইরেও কৃষ্ণের শান্তি মিলল না, ঘরেও নয়। বৃন্দাবনবিলাসী একনায়ক, মথুরা-দ্বারকার রাজাদেরও রাজা, কুরু-পাণ্ডবের ধর্মযুদ্ধের পুরোহিত—তাঁর এই কি বিদায়!

প্রথম অধ্যায়ের
গ্রন্থপঞ্জী

১. ছান্দোগ্য উপনিষদ, দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৩৩ সাল, ৩. ১৭. ৬. পৃ. ৩৫২।

২. বিমানবিহারী মজুমদার, কৃষ্ণ ইন্ হিস্ট্রি এন্ড লিজেন্ড্, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ৪।

৩. হারম্যান জ্যাকবি, কৃষ্ণসম্বন্ধীয় প্রস্তাব, হেস্টিংস সম্পাদিত এনসাইক্লোপেডিয়া অব রিলিজয়ান্ এন্ড এথিক্স্। ৭ম খণ্ড, নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৪, পৃ. ১৯৫।

৪. আর. জি. ভাণ্ডারকার, বৈষ্ণবিজম্ শৈবিজম্ এন্ড মাইনর রিলিজিয়াস্ সিস্টেম্স, বারাণসী : ইন্দলজিক্যাল্ বুক হাইস, ১৯৬৫, পৃ. ৮-১২ ; ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়ারি, ১৯১২, পৃ. ১৩।

৫. এ. বি. কিথ, জার্নাল অব দ্য রয়্যাল্ এশিয়াটিক্ সোসাইটি, ১৯১৫, পৃ. ৮৪০।

৬. আর. জি. ভাণ্ডারকার, বৈষ্ণবিজম্ শৈবিজম্, পৃ. ৩৫-৩৮।

৭. জে. এন. ফারকুহার, পার্মানেন্ট লেসনস অব দ্য গীতা, অকস্ফোর্ড, ১৯১২, পৃ ৩১।

৮. জে. এন. ফারকুহার, আ প্রাইমার অব হিন্দুইজম্, দিল্লী, ১৯৭৫ (পুনর্মুদ্রিত) পৃ. ৭৪।

৯. জি. পারিন্দার, অবতার এন্ড ইনকারনেশন্, ফেবার এন্ড ফেবার, ১৯৭০, পৃ. ১২২।

১০. ঐ পৃ. ১২৩।

১১. হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, মেটিরিয়ালস ফর দ্য স্টাডি অব আর্লি হিস্ট্রি অব দ্য বৈষ্ণব সেক্ট, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২০, পৃ. ৪৮-৫০।

১২. পাণিনি সূত্র করেছেন 'বাসুদেবার্জুনাভ্যাং বুঞ্' (৪. ৩. ৯৮) পাণিনির নিজেরই করা দ্বন্দ্বসমাসের নিয়ম অনুসারে সূত্রটির গঠন হওয়া উচিত ছিল 'অর্জুনবাসুদেবাভ্যাং বুঞ্'। পণ্ডিতেরা বলেন পাণিনির এই ভুলটি নাকি ইচ্ছাকৃত এবং এই ভুলের পেছনে নাকি পাণিনির একটি উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্য এই যে, বহু অক্ষর বিশিষ্ট 'বাসুদেব' পদটি আগে বসিয়ে পাণিনি বাসুদেবের পূজ্যত্ব প্রতিপাদন করেছেন। পাণিনির পরবর্তী মহাবৈয়াকরণ

কাত্যায়ন শেষ পর্যন্ত একটি প্রতিপূরক সূত্রই বানিয়ে দিয়েছেন— 'অভ্যর্হিতং পূর্বং'। এতে বেশি সম্মাননীয় ব্যক্তির নাম দ্বন্দ্বসমাসে আগে বসবে!

১৩. কার্টিয়াস লিখেছেন— **An image of Hercules was borne in front of the line of infantry, and this acted as the strongest of all incentives to make the soldiers fight well. To desert the bearers of this image was reckoned a disgraceful military offence...**
আর. সি. মজুমদার, দ্য ক্লাসিক্যাল্ অ্যাকাউন্টস অব্ ইন্ডিয়া, ফার্মা কে. এল. এম : কলিকাতা, ১৯৪১, পৃ. ১১৯-১২০।

১৪. পতঞ্জলি, মহাভাষ্য, মতিলাল বনার্সিদাস : দিল্লী, ১৯৬৭, ৩. ২. ১১১, পৃ. ১৭৬।

১৫. জে. ম্যাক্রিন্ডল, এন্‌সেন্ট ইন্ডিয়া অ্যাজ ডিস্‌ক্রাইবড্ বাই মেগাস্থিনিস এন্ড আরিয়ান, কলিকাতা, ১৯২৬, পৃ. ৬৪।

১৬. জোজেফ এম. কিটাগাওয়া। দ্য হিস্ট্রি অব রিলিজনস (চিকাগো) ১৯৭৩, পৃ· ২৬।

১৭. ছান্দোগ্য উপনিষদ, ঐ, ৭. ২.।

১৮. আর. পি. চন্দ, মেমোয়েরস্ অব দ্য আরকিওলজিক্যাল্ সার্ভে অব ইন্ডিয়া, নং ৫, পৃ. ১৫৭।

১৯. এস. এন. দাসগুপ্ত, হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ান্ ফিলজফি, ৩য় খণ্ড, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬১, পৃ. ৩৪-৪১।

২০. জে. এ. বি ভ্যান ব্যুটেনন, "দ্য নেম্ পঞ্চরাত্র"— দ্য হিস্ট্রি অব রিলিজিয়ান ১ : ২ (১৯৬২) পৃ. ২৯৩।

২১. ডি. আর. ভাণ্ডারকর, দ্য আরকিওলজিক্যাল্ রিমেইন্‌স এন্ড এস্‌কেভেসন্‌স অ্যাট নাগরী, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া, ১৯২০, মেমোয়ের্ নং ৪।

২২. জে. এন. ব্যানার্জি, ডিভালপমেন্ট্ অব্ হিন্দু আইকোনোগ্রাফি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৬, পৃ. ৯৩, ৩৮৬

২৩ . বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'কৃষ্ণচরিত্র', বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সাহিত্যসংসদ ১৩৮০ সাল (৫ম মুদ্রণ). পৃ. ৪৯২।

২৪. ঐ. পৃ. ৪৩৩।

২৫. রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৯৬৫ দ্র. চতুরঙ্গ, পৃ. ৪৮৬।

২৬. শঙ্করীপ্রসাদ বসু, "বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচর্চা" দ্র. দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৯৫, পৃ. ১৩০-১৪২।

২৭. বিপিনবিহারী গুপ্ত, পুরাতন প্রসঙ্গ, বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, বিদ্যাভারতী সংস্করণ, পৃ. ২৮৯-২৯০।

২৮. ঐ. পৃ. ২৯০-২৯২।

২৯. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, উদ্বোধন কার্যালয় : কলিকাতা, ১৩৬৯ সাল, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৫০-৫৪।

২য় অধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জী

১. দ্র. ভোজবর্মার বেলাভ তাম্রশাসন, এপিগ্রাফিকা ইন্ডিকা, ১২শ সংখ্যা, পৃ. ৩৭-৪৩।
পণ্ডিত নলিনীকান্ত ভট্টশালী ঢাকা রিভিউতে (জুলাই ১৯১২) পুরো শ্লোকটি উদ্ধার করেছিলেন। ড: রাধাগোবিন্দ বসাক এবং জে. এন. ব্যানার্জি সেই শ্লোকটির একটি শব্দ নিয়ে বিচার-বিবেচনা করা সত্ত্বেও ভট্টশালীর পাঠটিই সাধারণ্যে গৃহীত। যদিও "সো'পীহ গোপীশতকেলিকারঃ কৃষ্ণো মহাভারতসূত্রধারঃ" এই পংক্তি নিয়ে কোথাও কোন বিবাদ নেই।

২. সুকুমারী ভট্টাচার্য, ইন্ডিয়ান থিওগনি, ফার্মা কে. এল. এম : কলিকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ৩০১।

৩. সুকুমারী ভট্টাচার্য, "দ্য সান-গড্ এন্ড সোটেরিওলজি", অন্বীক্ষা (সংস্কৃত বিভাগের পত্রিকা) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৯৭২, পৃ. ২৬।

৪. জন স্ট্রাটন্ হলি, কৃষ্ণ, দ্য বাটার-থিফ্, প্রিন্সটন্ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৩, পৃ. ২৫।

৫. গাথাসপ্তশতী, রাধাগোবিন্দ বসাক সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৭১, ২. ১২ পৃ. ২৬।

৬. ঐ. ১. ৮৯ পৃ. ২১।

৭. ভাগবত পুরাণ, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩০৯ সাল, ১০. ৩০. ৩৭-৩৮।

৮. রাধাগোবিন্দ নাথ, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা, ভক্তিগ্রন্থ প্রচার ভাণ্ডার : কলিকাতা, বঙ্গাব্দ ১৩৫৫, পৃ. ৮৩, ৯৬-৯৯, ১৮৫-১৮৭, ২০৪-২৩৮।

৯. হেসিয়ড, থিওগনি, লোয়েব সংস্করণ, পৃ. ৩৩৩-৩৩৬। দ্রঃ সুকুমারী ভট্টাচার্য ইন্ডিয়ান থিওগনি, (পূর্বে উল্লিখিত) পৃ. ৩০৪।

১০. ইয়ান্ খণ্ডা, আসপেক্ট্স অব আর্লি বিষ্ণুইজম্, মতিলাল বনার্সিদাস : দিল্লী, ১৯৬৯ (২য় সংস্করণ), পৃ. ১৫৫-১৫৭।

১১. সুবীরা জয়সোয়াল, দ্য অরিজিন এন্ড ডিভালপমেন্ট্ অব্ বৈষ্ণবিজম্, মুন্সীরাম মনোহরলাল : দিল্লী, ১৯৬৭, পৃ. ৫০-৫১ ; দ্রঃ ইয়ান্ খণ্ডা (পূর্বে উল্লিখিত) পৃ. ২৪-৩১, ১২২।

১২. ইয়াং খণ্ডা (পূর্বে উল্লিখিত) পৃ. ১৫৬।

১৩. মহাভারত, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, কলিকাতা (বঙ্গবাসী সংস্করণ) ২. ৪২. ১ ; ২. ৪১. ৬ ; ২. ৪২. ৪।

১৪. হরিবংশ আর্যশাস্ত্র : শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এবং নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ সম্পাদিত কলিকাতা, ১৩৮৪ সাল, ১. ৩৫. ৯-১২। ব্রহ্মপুরাণ, আর্যশাস্ত্র, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এবং নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৯২ সাল, ১৪. ৪৬।

১৫. এফ. ই. পারজিটার, এনসেন্ট্ ইন্ডিয়ান্ হিস্টোরিক্যাল্ ট্র্যাডিশন, লন্ডন,

১৯২২, পৃ. ২৪৩-২৪৮।

১৬. হরিবংশ, ঐ, ১. ৩৫. ১২-১৪।

১৭. কথাটা এমনি করে অবশ্য কোন পুরাণ কিংবা শাস্ত্রকারেরা বলেননি। গোপীদের প্রসঙ্গে 'অপ্সরা' কথাটার প্রথম প্রয়োগ করেন বৈষ্ণবাচার্য মধ্ব—'জারত্বেন অপ্সরস্ত্রীণাং', 'কামভক্ত্যা অপ্সরস্ত্রীণাং'। এই কথাগুলি তিনি বলেছেন ভাগবত পুরাণে যেই গোপীদের কথা আরম্ভ হল, তখনই। শব্দরত্নাবলী 'অপ্সরা' শব্দের মানে করেছে 'স্বর্বেশ্যা'। কাজেই কোন গোপবালিকাকে অপ্সরা বলে চিহ্নিত করলেই তাকে অপ্সরা বলে মানতে হবে এমন কথা নেই।

খণ্ডা সাহেব আবার বিষ্ণুপুরাণের ভিত্তিতে যে কথাটা বলতে চাইলেন, সেটা আমাদের মনোমত হল বটে, কিন্তু ভুল বললেন। তিনি লিখেছেন—

And what is—to give another instance—the element of 'historical truth' in the tradition preserved in the Visnupurana (5, 9. 38) that the gopis, the wives of Krsna were the apsarases who had been cursed by the ascetic Astavakra?" (Aspects of early Visnuism p. 125)

বিষ্ণুপুরাণের যে জায়গাটুকু খণ্ডা উদ্ধার করেছেন, সেখানে কৃষ্ণস্ত্রীদের পূর্বজন্মে অপ্সরা বলা হয়েছে এবং তাঁরাই অষ্টাবক্র মুনির শাপ লাভ করেছিলেন। ফলে তাঁরা কৃষ্ণের স্ত্রী হয়েও পরে দস্যুদের দ্বারা হৃত হয়েছিলেন। এখানে গোপীদের কথাটাও জুড়ে দিয়ে খণ্ডা সাহেব অন্যায় করেছেন বলে মনে করি।

১৮. পতঞ্জলি, ব্যাকরণ-মহাভাষ্য, এফ. কিলহর্ণ সম্পাদিত, বম্বে, ১৮৯২, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫২।

১৯. এপিগ্রাফিকা ইন্ডিকা, ১৬শ খণ্ড, নং ১৭ ; দ্রঃ ডি. আর. ভাণ্ডারকর, অ্যানুয়াল্ রিপোর্ট, আর্কিওলজিক্যাল্ সার্ভে অব ইন্ডিয়া, ১৯১৩-১৯১৪, পৃ. ২৩০-২৩১ এবং দীনেশচন্দ্র সরকার, দ্য এজ অব ইম্পেরিয়াল ইউনিটি, ভারতীয় বিদ্যাভবন : বম্বে, ১৯৬০ (তৃতীয় সংস্করণ), পৃ. ২২২।

২০. জাতক, ই. বি. কাউয়েল সম্পাদিত, কেমব্রিজ, ১৮৯৫-১৯১৩, ঘটজাতক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫১-৫২।

২১. হরিবংশ, ঐ, ১. ৫. ৪-৮।

২২. হরিবংশ, ঐ, ১. ২০. ৪-৫।

২৩. হরিবংশ, ঐ, ১. ২০. ৬।

২৪. হরিবংশ, ঐ, ১. ২০. ১১-১৪।

২৫. এফ. হার্ডি, বিরহভক্তিঃ দ্য আর্লি হিস্ট্রি অব কৃষ্ণ ডিভোসন্ ইন্ সাউথ ইন্ডিয়া, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস : দিল্লী, ১৯৮৩, পৃ. ১১৯-২৩৭।

২৬. ভি. আর রামচন্দ্র দিক্ষিতর, শিলপ্পড়িকারম্ : ইংরেজী অনুবাদ, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস : লন্ডন, ১৯৩৯, ১৭।

এম. রাঘবায়েঙ্গার, আরায়চিত্তোকুতি, পরিনিলয়মঃ ম্যাড্রাস, ১৯৬৪, পৃ. ৬২।

২৭. কালিদাস, রঘুবংশ, হরগোবিন্দ মিশ্র, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ : বারাণসী, ১৯৬১, ৬. ৪৫-৫০।

২৮. বলরামের রাগের কথা আছে ভাগবত পুরাণে।

২৯. ওদেশে ডেভিশ কিংসলে সাহেব কৃষ্ণের এই সব নাচের একটা 'মিষ্টিক্' ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যা এদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে বেশ চলে। দ্রঃ ডি. কিংসলে, "উইদাউট্ কৃষ্ণ দেয়ার ইজ নো সং", হিস্ট্রি অব রিলিজিয়নস্ পত্রিকা ১২ খণ্ড, নং ২ (১৯৭২), পৃঃ ১৬০-১৬১।

এই 'কানু বিনে গীত নাই' শীর্ষক প্রবন্ধ ছাড়াও এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা পাওয়া যাবে, কিংসলেরই লেখা দুখানি গ্রন্থে : দ্য ডিভাইন প্লেয়ার : আ স্টাডি অব কৃষ্ণলীলা, দিল্লী, ১৯৭৯ এবং দ্য সোর্ড এন্ড দ্য ফ্লুট্ : কালী এন্ড কৃষ্ণ, বার্কলে, ১৯৭৫।

৩০. গাথাসপ্তশতী (পূর্বে উল্লিখিত) ২. ১৪. পৃ. ২৬।

৩১. ডি. ইনগলস্, "দ্য হরিবংশ অ্যাজ্ আ মহাকাব্য", লুই রেণু স্মারক গ্রন্থ (**Melanges d'indianisme a la memoire de Louis Renou**)' প্যারিস, ই. ডি. বোকার্ড, ১৯৬৮, পৃ. ৩৮৪-৩৮৭।

৩২. ভাস, বালচরিত, সি আর দেওধর, ওরিয়েন্টাল বুক এজেন্সি : পুনা, ১৯৫১, পৃ. ৫২৪-২৯।

৩৩. হরিবংশ, ১. ৮. ২৪-২৮।

৩৪. ভাস, বালচরিত (পূর্বে উল্লিখিত)

৩৫. প্রিনজ (Printz) সাহেব প্রথমে লক্ষ্য করেন যে বালচরিতের ৩য় অংশের প্রথমার্ধে এবং পঞ্চরাত্রের ২য় অংকের প্রবেশকে এক ধরনের বিশেষ প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। পরে হেলার সাহেব এই ভাষাটি বিশ্লেষণ করে দেখান যে এটি আভীরীদের ভাষা— Hirtendialekt. (এইচ. হেলার, বালচরিত, লাইপজিগ, ১৯২২ ২য় খণ্ড, ভূমিকা পৃ. ৩ (এফ)। দ্রষ্টব্য : এইচ হার্ডি, বিরহভক্তি (পূর্বে উল্লিখিত) পৃ. ৭৮, পাদটীকা ১০০।

৩৬. কালিদাস, মেঘদূত, পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৭৬ সাল, পূর্বমেঘ. ১৫।

৩৭. সুভাষিতরত্নকোষ, ডি. ডি. কোশাম্বি এবং ভি. ভি. গোখলে সম্পাদিত, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৫৭, হরিব্রজ্যা, ২০, পৃ. ২৪।

৩৮. হিউগো রাহ্নির, "দ্য ক্রিশ্চান্ মিস্ট্রিজ্ এন্ড পেগান মিস্ট্রিজ্। দ্রঃ মিস্ট্রিজ্, এরানোজ ইয়ার বুক, প্রিন্সটন্ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭১, পৃ. ৩৫৯।

৩৯. বার্থ সাহেবের বক্তব্য সুশীল কুমার দে উদ্ধার করেছেন। দ্রঃ এস. কে. দে, আসপেক্টস্ অব স্যানসক্রিট্ লিটারেচার, কলিকাতা, ১৯৫৯, পৃ. ৯১-৯২ পাদটীকা নং ২।

৪০. জীব গোস্বামীর জ্যাঠামশাই সনাতন গোস্বামী ভাগবত পুরাণের ওপর বৈষ্ণবতোষণী টীকায় বলেছেন আরও ভাল। তাঁর মতে, চিরকালের

পরমাত্মীয় পরমাত্মস্বরূপ কৃষ্ণের কাছে 'পর' বলেই কেউ নেই, সেখানে 'পরদারা'—নাস্তি অস্য পরো নাম কশ্চিৎ, কে বা পরদারাঃ। দ্রঃ ভাগবত পুরাণ, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন, মুর্শিদাবাদ, ১২৯৪ সাল, ১০ম স্কন্ধ, পৃ. ৬৩৪।

৪১. জে. এল. ম্যাসন, "দ্য চাইল্ডহুড্ অব্ কৃষ্ণঃ সাম্ সাইকো-অ্যানালিটিক্ অবসার্ভেসন"। দ্রঃ জার্নাল অব দ্য আমেরিকান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি, খণ্ড ৯৪ : নং ৪।

৪২. শ্রীমদ্‌ভাগবতম্, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, ১০. ৪৭. ২১.

৪৩. বিষ্ণুপুরাণ, কালীপদ তর্কাচার্য এবং শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ সম্পাদিত, আর্যশাস্ত্র, কলিকাতা, ১৩৭২ সাল, ৫. ১৮. ১৪, ১৫।

৪৪. শ্রীমদ্‌ভাগবতম্, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, ১০. ৪৬. ৬।

তৃতীয় অধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জী

১. ঋগ্বেদসংহিতা, রমেশচন্দ্র দত্তকৃত বঙ্গানুবাদ, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, জ্ঞানভারতী : কলিকাতা, ১৯৬৩, ৮. ৯৬. ১৩-১৫।

২. এস. রাধাকৃষ্ণান, ইন্ডিয়ান্ ফিলসফি, লন্ডন, ১৯৪৮, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৮৭। ইয়ান খণ্ডা, আস্‌পেক্টস অব আর্লি বিষ্ণুইজম্ (পূর্বে উল্লিখিত), পৃ. ১৫৭। সুকুমারী ভট্টাচার্য, ইন্ডিয়ান থিওগনি (পূর্বে উল্লিখিত), পৃ. ৩০৫ (সুকুমারী ভট্টাচার্য অবশ্য অনবধানতাবশতঃ ঋক্‌সংখ্যাটি ভুল নির্দেশ করেছেন (৮. ৮৫. ১৩-১৫)

৩. ইয়ান খণ্ডা, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১৫৭।

৪. হরিবংশ, পূর্বে উল্লিখিত, বিষ্ণুপর্ব, ১৫. ৪-৫, ৮-১৯।

৫. ঐ, বিষ্ণুপর্ব, ১৬. ১-১১ ; ১৭. ২১-২৪।

৬. বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ ছাড়াও কালিয়াদমনের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের জন্য দ্রষ্টব্য : হাইনরিখ জিমার, মিথস্ এন্ড সিমবলস্ ইন্ ইন্ডিয়ান্ আর্ট এন্ড সিভিলাইজেসন্, বলিন্‌জেন্ ফাউন্ডেসন্ : ওয়াশিংটন, ১৯৪৬, পৃ. ৭৭-৯০।
মির্চা এলিয়াদে, কসমস্ এন্ড হিস্ট্রি : দ্য মিথ্ অব দ্য ইটারন্যাল্ রিটার্ন্, অনুবাদ : ডাবলু. আর. ট্রাস্ক, নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৯, পৃ. ১২-১৫, ৫৫-৬০ ; এলিয়াদে, প্যাটার্নস ইন কমপারেটিভ্ রিলিজিয়ন্, অনুবাদ : রোজমেরী শীড, ক্লিভল্যান্ড, ১৯৬৩, পৃ. ৮৯, ৯৯-১০১, ৩৭৪-৩৭৯।
জন স্ট্রাটন হলি, "কৃষ্ণস্ কসমিক ভিক্‌ট্রিস।" দ্রঃ
জার্নাল অব দ্য আমেরিকান অ্যাকাডেমি অব রিলিজিয়ন, খণ্ড ৪৭ : নং ২ (১৯৮০) পৃ. ২০৪।

৭. হরিবংশ, পূর্বে উল্লিখিত, বিষ্ণুপর্ব, ১৯. ৪৫, ৪৭. ৫৯।

৮. ঐ, ১৯. ৭৩-৮৮।

৯. ঐ, ১৯. ৯৪-৯৯।

১০. ভাস, বালচরিত, সি. আর. দেওধর সম্পাদিত, ২য় সংস্করণ, ওরিয়েন্টাল বুক এজেন্সি, পুনা, ১৯৫১, পৃ. ৫১৪।

১১. যদ্যয়ং বালো লোকহিতার্থং কংসবধার্থং বৃষ্ণিকুলে প্রসূতশ্চেৎ ঘোষাত্ কশ্চিদ্ ইহাগচ্ছতু।
বালচরিত, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৫১৬।
প্রসঙ্গতঃ ফরাসী গবেষক আঁদ্রে কোতুঁরের একটি মন্তব্য আমরা এখানে উল্লেখ করব, কারণ তাঁর মন্তব্যটি আমার বক্তব্যের পরিপোষক। কোতুঁরে মনে করেন— মথুরার কাণ্ডকারখানায় কৃষ্ণের হস্তক্ষেপের ব্যাপারটি অনেক বেশি জটিল ; অন্ততঃ অনেক বেশি জটিল, যতখানি ভাণ্ডারকর তাঁর মহাভারতের কৃষ্ণ আর গোপাল কৃষ্ণের ভেদতত্ত্বে প্রতিপাদন করেছেন। কোতুঁরে মনে করেন কৃষ্ণ এসেছিলেন যাদবদের বংশ রক্ষা করতে এবং কালনেমির অবতার কংসকে পর্যুদস্ত করতে। এইভাবেই তিনি জগতের হিত সাধন করতে চেয়েছেন। কোতুঁরের মূল মন্তব্যটি নীচে দেওয়া হল :
Les motifs invoques pour l'intervention de Krsna in Mathura sont donc plus complexes que ne l'avait apercu Bhandarkar dans son desir de distinguer un Krsna epique et un dieu des bouviers. Krsna vient redresser la lignee des Yadava, Vaincre une reincarnation de Kalanemi et a travers cela, il se propose d'oeuvrer au bien-etre du monde.
আঁদ্রে কোতুঁরে, "জিনিয়লজি এত্ রিইনকারনেসন্ দাঁস্ লা মিথ্ ডেনফাঁস্ দ্য কৃষ্ণ (Genealogie et reincarnation dans le mythe d'enfance de Krsna) দ্রঃ স্টাডিজ্ ইন রিলিজিয়ন, সায়েন্সেস রিলিজিঁয়সেস্, খণ্ড ২ : নং ২ (১৯৮২), পৃ. ১৪৫।
১২. হরিবংশ, পূর্বে উল্লিখিত, বিষ্ণুপর্ব, ২৮. ৫৪-১১৫।
১৩. ঐ, বিষ্ণুপর্ব, ২৮. ১১৬।
১৪. কৌটিল্যীয়ম অর্থশাস্ত্রম্, রাধাগোবিন্দ বসাক সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৬৪, ১ম খণ্ড, ১ম অধিকরণ, প্রকরণ-ইন্দ্রিয় জয়ঃ, পৃ. ৪
১৫. হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব, ২২ অধ্যায়টি সম্পূর্ণ দেখুন।
১৬. ঃ. বিষ্ণুপর্ব, ২৩. ১-৭।
১৭. ঐ, বিষ্ণুপর্ব ২৮. ৩৭।
১৮. মহাভারত, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, কলিকাতা, শকাব্দ ১৮৩০, ২. ১৪. ৩৩।
১৯. হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব, ২২. ৯৮।
২০. ঐ বিষ্ণুপর্ব, ৩১. ৪৬।
২১. ঐ বিষ্ণুপর্ব, ৩২. ৩১।
২২. মহাভারত, পূর্বে উল্লিখিত, ২. ১৪. ৩৩-৩৪।
২৩. বিমানবিহারী মজুমদার, কৃষ্ণ ইন হিস্ট্রি এন্ড লিজেন্ড্, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ৮২-৮৩।
২৪. হরিবংশ, হরিবংশপর্ব, ৩৯. ৬—প্রযযৌ রথমারুহ্য নগরং বারণাবতম্। বিষ্ণুপুরাণ, পূর্বে উল্লিখিত, ৪. ১৩. ৩৭ পৃ. ২৯৬।

২৫. বিষ্ণুপুরাণ বলেছে— জতুগৃহদাহের পর কৃষ্ণ পাণ্ডবদের আসল বৃত্তান্ত জেনেও দুর্যোধন যাতে পাণ্ডবদের আরও গভীরতর কোন ফাঁদে না ফেলেন সেইজন্যই কুলোচিত সৌজন্য রক্ষার্থে বারণাবতে গেছিলেন জতুগৃহদগ্ধানাঞ্চ পাণ্ডুনন্দনানাং বিদিতপরমার্থোপি ভগবান্ দুর্যোধন-প্রযত্নশৈথিল্যার্থং কুল্যকরণায় বারণাবতং গতঃ (৪. ১৩. ৩৬)
২৬. মহাভারত, ২. ১৪. ৮-১১, ৩৬।
২৭. ঐ, ২. ১৪. ৪৯।
২৮. হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব, ৩৫. ৬।
২৯. ঐ, বিষ্ণুপর্ব, ৩৮. ৫৬-৬০।
৩০. ঐ, বিষ্ণুপর্ব, ৩৮. ৬০-৬৪।
৩১. ঐ, বিষ্ণুপর্ব, ৩৯. ৮-৯।
৩২. মহাভারত, আদিপর্ব, অধ্যায় ২২১। এই অধ্যায়টির নাম শুধু সুভদ্রাহরণপর্ব নয়, এ পর্বের নাম হরণাহরণপর্ব।
৩৩. ঐ, ১. ২২১. ১৯।
৩৪. ঐ, আদিপর্ব অধ্যায় ১৮৬।
৩৫. ঐ, আদিপর্ব, ১৮৭. ১৫-১৬, ২৪-২৭।
৩৬. হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, পলিটিক্যাল্ হিস্ট্রি অব অ্যানসেন্ট্ ইন্ডিয়া, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭২, পৃ. ৩৮১-৩৯৪।
৩৭. হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব, ৫২. ২৫-৩২।
৩৮. ঐ, বিষ্ণুপর্ব, ৫২. ৩৩-৩৭।
৩৯. ঐ, বিষ্ণুপর্ব, ৫৭. ৩১-৩৮।
৪০. ঐ, বিষ্ণুপর্ব, ৫৭. ২৯-৩০।
৪১. হরিবংশ লিখেছে জরাসন্ধ শিশুপালের সমানবংশ এবং জ্ঞাতি। শিশুপালের বাবা শিশুপালকে জরাসন্ধের হাতেই মানুষ করার জন্য দিয়েছিলেন এবং জরাসন্ধও তাঁকে ছেলের মত দেখতেন। দ্রঃ হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব, ৫৯, ২১-২৪।
৪২. মহাভারত, ৫. ৭৪. ১-২৩।
৪৩. ঐ ৫. ৭৬. ১-১৮।

৪র্থ অধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জী

১. মহাভারত, ৩. ২৩২. ৪-৮।
২. ভাস, বালচরিত, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৫৪৯
৩. বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবতপুরাণ সবিস্তারে অক্রূরযাত্রা এবং বিরহপর্বের ছবি এঁকেছে। রূপ গোস্বামীর ললিতমাধব নাটকের তৃতীয় অঙ্কও এ ব্যাপারে তাৎপর্যপূর্ণ। আরও দ্রষ্টব্য : ডনা ম্যারি উলফ্, "আ স্যানসক্রিট পোট্রেট : রাধা ইন দ্য প্লেজ অব রূপ গোস্বামী।" দ্রঃ ডিভাইন কনসর্ট, জে. এস. হলি এবং ডনা ম্যারি উলফ সম্পাদিত, বার্কলে রিলিজিয়াস স্টাডিজ সেরিজ, ১৯৮৯, পৃ. ৩০।
৪. হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব, ২৭. ২৬-৩৯। বিষ্ণুপুরাণ, ৫. ২০. ১-১২।

ভাগবতপুরাণ, ১০. ৪২. ১-১২।

৫. ভাগবত পুরাণ, ১০. ৪৮. ১-৯।

৬. নোয়েল শেট, "দ্য জাস্টিফিকেশন্ ফর্ কৃষ্ণজ্ অ্যাফেয়ার উইদ দ্য হাঞ্চ-ব্যাকড্ উওম্যান"। দ্রঃ পুরাণ (বারাণসী) খণ্ড ২৫ : নং ২১ (জুলাই ১৯৮৩) পৃ. ২৩৩।

৭. শ্রীমদ্ ভাগবতম্, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত, মুর্শিদাবাদ, ১৮৯৪ সন, ১০. ৪৮. ৪ শ্লোকের ওপর সনাতন গোস্বামী কৃত বৈষ্ণবতোষণী টীকা। অধিকন্তু রাধাগোবিন্দ নাথ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, চতুর্থ খণ্ড, প্রাচ্যবাণী : কলিকাতা ১৯৫৯, পৃ. ২৬৫৫।

৮. রূপ গোস্বামী, উজ্জ্বল নীলমণি, হরিদাস দাস (সং), হরিবোল কুটীর : নবদ্বীপ, গৌরাব্দ ৪৬৯, স্থায়িভাব প্রকরণ, ৪৫, পৃ. ২৫৩।

৯. হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব, ৫০. ১৫-১৬।

১০. ঐ, বিষ্ণুপর্ব, ৫২. ৩, ৫১।

১১. শ্রীমদ্ ভাগবতম্, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, ১০. ৫২. ৩৭-৪৪।

১২. শ্রীমদ্‌ভাগবতম, ১০. ৬০. ১০-১৭।

১৩. রূপ গোস্বামী, উজ্জ্বলনীলমণি, পূর্বে উল্লিখিত, হরিপ্রিয়া প্রকরণ, শ্লোক নং ১১।
রূপ গোস্বামী তাঁর ললিতমাধব নাটকে রাধা, চন্দ্রাবলী এবং আরও ছয় মুখ্য সখীকে নিয়ে অভিনয় জমিয়েছিলেন। কিন্তু এক সময়ে কৃষ্ণের মথুরাযাত্রার কষ্টে তাঁরা সবাই আত্মবিসর্জন দিলেন। পরবর্তী অঙ্কগুলিতে রূপ গোস্বামী রাধা, চন্দ্রাবলী সবাইকেই কৃষ্ণমহিষীরূপে পুনরুজ্জীবিত করেন। কৃষ্ণমহিষীদের মধ্যে রুক্মিণীই পাটরানী বলে ইতিহাস-পুরাণে বিখ্যাত। কিন্তু পুনরুজ্জীবনের সময়ে রূপ গোস্বামী রাধাকে করলেন সত্যভামা, কারণ তিনি বামা, মানিনী নায়িকা আর চন্দ্রাবলীকে করলেন রুক্মিণী, কারণ তিনি দক্ষিণা আনুগত্যময়ী নায়িকা।

১৪. যোগেন্দ্রনাথ বসু, "সোর্সেস্ অব দ্য টু কৃষ্ণ লিজেন্ডস্।" দ্রঃ ইন্ডিয়ান কালচার খণ্ড ৬নং ১-4 (জুলাই ১৯৩৯-এপ্রিল ১৯৪০) পৃ. ৪৬৪-৪৬৭।

১৫. মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৮১. ৫-১২।

১৬. হরিবংশ, হরিবংশপর্ব, ৩৮. ১৩-২৩।

১৭. বিষ্ণুপুরাণ, ৪. ১৩. ১৬।

১৮. ঐ, ৪. ১৩. ১৯।

১৯. হরিবংশ, হরিবংশপর্ব, ৩৮. ৩০-৩৬। বিষ্ণুপুরাণ, ৪. ১৩. ২০-২২। ব্রহ্মপুরাণ, ১৬. ২৯-৩৬।

২০. শ্লোকটি সম্পূর্ণ দেওয়া হল :
সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ।
সুকুমারক ! মা রোদীস্তব হ্যেষ স্যমন্তকঃ॥
হরিবংশ, ১. ৩৮. ৩৬ ; বিষ্ণুপুরাণ, ৪. ১৩. ২২ ; ব্রহ্মপুরাণ, ১৬. ৩৬।

২১. ব্রহ্মপুরাণ ১৭. ২, হরিবংশ, ১. ৩৯. ২, বিষ্ণুপুরাণই একমাত্র বলেছে যে সত্যভামার প্রণয়প্রার্থী ছিলেন অক্রূর, কৃতবর্মা শতধন্বা—এরা তিনজনেই— তাঞ্চাক্রূর-কৃতবর্ম- শতধন্ব-প্রমুখ-যাদবাঃ পূর্বং বরয়ামাসুঃ (৪. ১৩. ৩৫)।

২২. 'তয়া চৈবমুক্তঃ পরিতুষ্টান্তঃকরণো'পি কৃষ্ণ'—সত্যভামার কথা শুনে কৃষ্ণ মনে মনে খুশি হয়েছিলেন এইজন্যে যে তাঁর ঈপ্সিত মণিটি এবার সত্যভামার মাধ্যমে তাঁরই অধিকারে আসবে (বিষ্ণুপুরাণ, ৪. ১৩. ৩৮)।

২৩. হরিবংশে দেখি, বলরামকে বলার সময় কৃষ্ণ প্রথমে মুখ ফসকে বলেছিলেন—এ মণি এখন আমারই হবে— স্যমন্তকঃ স'মদ্‌গামী। কিন্তু বলরামের সাহায্যপ্রার্থী কৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে ভুল সংশোধন করে বলেছেন, মণিটি এখন আমাদের হবে।' দ্রঃ হরিবংশ ১. ৩৯. ১০-১১।

২৪. বিষ্ণুপুরাণ, ৪. ১৩. ৪৬।

২৫. ঐ. ৪. ১৩. ৪৮-৫০।

২৬. "জ্ঞাতিভেদভয়াৎ কৃষ্ণস্তমুপেক্ষিতবানথ", হরিবংশ, ১. ৩৯. ৩০-৩১।

২৭. বিষ্ণুপুরাণ, ৪. ১৩. ৫৬-৫৭।

২৮. ঐ, ৪. ১৩. ৬০।

২৯. হরিবংশ, ১. ৩৯. ৩৬-৩৭।

৩০. বিষ্ণুপুরাণ, ৪. ১৩. ৬৫-৬৮।

৩১. স্থিরমতি, মধ্যান্তবিভাগভাষ্যটীকা, আর. সি. পাণ্ডেয় সম্পাদিত, মতিলাল বনার্সিদাস, ১৯৭১, পৃ. ১৫০। স্থিরমতি লিখেছেন: অস্য চ মহাযানস্যাভিধায়িকা যা সূত্রাদিদেশনা সাপি মহাযানং ভবতি...যথা কংসবধো মণিহরণঞ্চ।

৩২. ধর্মসূরি, নরকাসুরবিজয়ব্যায়োগ, আর্যেন্দ্রশর্মা সম্পাদিত, ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটি, হায়দ্রাবাদ, ১৯৬১, পৃ. ৭।

৩৩. বিষ্ণুপুরাণ, ৫. ৩০. ৩৩-৩৭।

৩৪. ঐ, ৫. ৩১. ৩।

পুরাণকারেরা সত্যভামার আদরের নাম সত্যা বললেও, শুষ্ক-রুক্ষ বৈয়াকরণ পতঞ্জলি তাঁর আদরের নাম বলেছেন ভামা। পতঞ্জলি বলেছেন— এই জগতেই দেখা যায় সম্পূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করতে গিয়ে লোকে বাক্যের খানিকটা বলে কিংবা সম্পূর্ণ পদ বোঝাতে গিয়ে পদের একটুখানি প্রয়োগ করে— পদেষু পদৈকদেশান্, যেমন 'দেবদত্ত' বলতে 'দত্ত' কিংবা 'সত্যভামা' না বলে শুধু 'ভামা'—সত্যভামা ভামেতি (ব্যাকরণমহাভাষা, মতিলাল বনার্সিদাস, দিল্লী প্রকাশিত, ১৯৬৭, ১. ১. ৪৫)।

হায়! খ্রীস্টপূর্ব দেড়শ শতাব্দীতে লোক প্রযুক্ত—

'দৃশ্যন্তে হি...প্রযুঞ্জানাঃ'—এইরকম পদ ব্যবহার দেখেও বঙ্কিমচন্দ্র সত্যভামার চরিত্রে বিশ্বাস করেন না!

৩৫. "জিতমভীক্ষ্ণমেব জাম্ববতী-বদনারবিন্দোর্জ্জিতালীন"

ফ্লিট, করপাস্ ইনস্‌ক্রিপসনাম্ ইন্ডিকেরাম্, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৯, ২৭০।

অধিকন্তু পি. ব্যানার্জি, কৃষ্ণ ইন ইন্ডিয়ান্ আর্ট, ন্যাশনাল মিউজিয়াম্, নিউ দিল্লী, ১৯৭৮, পৃ. ১৬৩।

৩৬. মহাভারত, মৌষলপর্ব, ৭. ৫৯।

৩৭. ঐ, মৌষলপর্ব, ৮. ১৭

যারা কৃষ্ণস্ত্রীদের হরণ করেছিল তাদেরকে কখনও বা ম্লেচ্ছও বলা হয়েছে মহাভারতে :

প্রেক্ষতস্ত্বেব পার্থস্য বৃষ্ণ্যন্ধকবরস্ত্রিয়ঃ।

জগ্মুরাদায় তে ম্লেচ্ছাঃ সমন্তাজ্ জনমেজয় ॥

মৌষলপর্ব, ৭. ৬৩।

৩৮. বরাহপুরাণ, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল সংস্করণ, কলিকাতা, ১৮৮৮, অধ্যায় ১৭৭, ৪-২৯ শ্লোক।

৩৯. সাম্বপুরাণ, বিজনবিহারী গোস্বামী সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স : কলিকাতা, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ, তৃতীয় অধ্যায়, ১৬-৫০ শ্লোক।

৪০. ঐ, তৃতীয় অধ্যায়, ৪৬ শ্লোক।

৪১. মহাভারত, উদ্যোগপর্ব, ৭. ১৮।

৪২. হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব, ৩০. ৬৬।

কংসের সঙ্গে যুদ্ধে গোপেদের সোজাসুজি কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা যায়নি বটে, তবে কংসের ধনুঃশালায় ঢুকে প্রথমে যখন কৃষ্ণ ধনুকখানি ভেঙে বেরিয়ে আসলেন, তখন কিন্তু কৃষ্ণ গোপেদের সঙ্গেই মিলিত হয়েছিলেন—নির্গম্য ত্বায়ুধাগারাজ্ জগ্মতু গোপসন্নিধৌ (হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব, ২৭. ৫০)। এ ঘটনা গোপবাহিনীর ব্যাপারে কোন ইঙ্গিত বহন করে কি ?

৪৩. মহাভারত, উদ্যোগপর্ব, ১৯. ১ এবং ১৯. ১৭।

৪৪. ঐ, শল্যপর্ব, ৩৫. ১৪।

৪৫. ঐ, মৌষলপর্ব, ৩. ১৮।

৪৬. ঐ, মৌষলপর্ব, তৃতীয় অধ্যায়।

৪৭. ঐ, মোষলপর্ব, ৪. ৪, ৭, ৮।

মহাভারতের ভারতযুদ্ধ

সাত কাণ্ড রামায়ণ পড়ে কেউ যদি 'সীতা কার বাপ'—এই প্রশ্ন তোলে, তার প্রতি আমরা বিরক্ত হই। তার বুদ্ধি এবং স্মরণশক্তি সম্বন্ধেও আমরা অনিশ্চিত বোধ করি। কিন্তু একইভাবে মহাভারতের কোন চরিত্রের সম্বন্ধ নির্ণয় করতে গিয়ে কেউ যদি এমন অসম্ভব প্রশ্ন করে যে, অমুক লোকটি কার বাবা, তখন হয়তো দেখা যাবে যে হাজারো চরিত্রের জঙ্গলে সঠিক বাবাটিকেও চেনা যায় না। মহাভারতের বিশাল গহনে একজনের বাবাকে অন্য একজনের বাবা বলে মনে হয়। সত্যি কথা বলতে কি মহাভারতে এসব ঘটনা ঘটে। শল্য পাণ্ডবদের আপন মামা। মহাভারতের পূর্ব পর্বগুলিতে যেহেতু তাঁকে বেশি দেখা যায়নি, তাই মহাভারতের পাঠকেরা অনেকেই তাঁকে ভাল চিনতেন না। কিন্তু যুদ্ধপর্বে মামা ভাগনের হাতে মারাই পড়লেন। অর্জুন বিয়ে করে বসলেন সুভদ্রাকে, অথচ সুভদ্রা তাঁর মামাতো বোন। মহাভারতে এই ধরনের বিসদৃশ, বিরুদ্ধ অথবা পরম্পরাহীন—ঘটনার সন্নিবেশ ঘটেছে মাঝেমাঝেই। ঘটনার গতি, বিচিত্র গল্প, তার ভেতরে গল্প—এতে করে চরিত্রগুলির স্বাতন্ত্র্য কিংবা কে কোথা থেকে এল, তার পূর্বপুরুষের পরিচয় কি—এ সব কিছু হারিয়ে যায়। তাই মহাভারতের মুখ্য চরিত্রগুলির মধ্যে ঢুকবার আগে তাদের পূর্বকথা, পূর্বপুরুষ এবং কুরু-পাণ্ডবের পাশাপাশি বেড়ে ওঠা অন্য রাজ্যগুলির রাজাদের সম্বন্ধেও কিছু জানা দরকার। তাতে লাভ দুটি। এক—কুরু-পাণ্ডবের ঝগড়া যে শুধুমাত্র ভাইতে-ভাইতে গণ্ডগোল—এই ধারণার অবসান ঘটবে। দুই—ভারতযুদ্ধ যে শুধুমাত্র কুরু-পাণ্ডবের গৃহবিবাদের পরিণতি নয়—সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপই যে শেষ পর্যন্ত ভারতযুদ্ধের রূপ ধারণ করেছে—সেটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে। রাজনীতির বিবর্তনে ভারতযুদ্ধের সম্ভাবনা কি করে হল—সে পরের কথা। তারও আগে দরকার স্বয়ং কুরু-পাণ্ডবদের, যাদব-কৃষ্ণ-বলরামের, জরাসন্ধ-শিশুপালের বংশমূল জানা। তাতে অনেক কিছুরই কারণ বোঝা যাবে, অনেক বিবাদ-বিগ্রহই সযৌক্তিক হয়ে উঠবে।

প্রথমেই মনে রাখা দরকার, সেকালের বড় বড় রাজবংশে যে দু-একটি মহান এবং শক্তিশালী রাজা জন্মাতেন, পরবর্তী সময়ে তাঁদের নামেই সেই সেই রাজবংশ প্রসিদ্ধ হয়ে যেত। বংশের উত্তরাধিকারে উত্তরপুরুষেরাও তাঁদের মহান পূর্বজদের নামে সম্বোধিত হতে ভালবাসতেন এবং গর্বও বোধ করতেন। কোন

কোন ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ রাজবংশের উত্তরপুরুষেরা যখন কোন অন্যায় কাজ করার সাহস দেখিয়েছেন অথবা মন দিয়েছেন এমন কোন কাজে যা মান, মর্যাদা অতিক্রম করে, তখন তাঁদের ওপর নেমে আসত সেই পূর্বজন্মা প্রসিদ্ধ রাজনামের খাঁড়া, তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হত সেই সেই রাজার চিরন্তন কীর্তিকলাপ, কখনও বা তিরস্কারের ভাষায় বলা হত—অমুক রাজার, তমুক রাজার বংশে জন্ম নিয়ে এ তুমি কি করতে যাচ্ছ। সবচেয়ে বড় কথা, এই সব বিশেষ ক্ষেত্রে উত্রপুরুষকে তাঁর পূর্বপুরুষের নাম ধরেই ডাকা হত, কখনও বা সেই নামের সঙ্গে জুড়ে যেত একটি মাত্র তদ্ধিত প্রত্যয়, যার মানে হবে অমুকের ছেলে—অথচ সেই অমুক হয়তো জন্মেছে তার দশ পুরুষ আগে।

যেমন ধরুন, এই অর্জুন, দুর্যোধন, কি ধৃতরাষ্ট্র-যুধিষ্ঠিরের কথা। মহাভারতের মধ্যে এঁদের 'ভারত', 'ভারত', বলে সম্বোধন করা হয়েছে, 'পৌরব' বলা হয়েছে, আবার কতবার 'কৌরব'ও বলা হয়েছে, ঠিক যেমন, রামায়ণের রাম-লক্ষ্মণকে একবার 'রঘু'-'রাঘব', একবার 'ইক্ষ্বাকু' একবার দাশরথি বলেও ডাকা হচ্ছে। মহাভারতের বেলায় একেবারে সাধারণ স্তরে, এইরকম একটা ধারণা আছে যে, দুর্যোধন-দুঃশাসনেরাই শুধু কৌরবপক্ষ, আর পাণ্ডবেরাই পাণ্ডব। কিন্তু সত্যি বলতে কি পাণ্ডবেরাও তো কৌরব, মহাভারতের মধ্যেই অজস্রবার পাণ্ডুপুত্রদের 'কৌরব' বলে ডাকা হয়েছে। মহাভারতের রাজবংশগুলির কৌলীন্য বুঝতে গেলে আগে পুরুকে জানতে হবে, পাণ্ডব-কৌরবের মূলপুরুষ ভরতকে জানতে হবে, কুরুকে জানতে হবে ; ঠিক যেমন জানতে হবে কৃষ্ণ-বলরামের পূর্বপুরুষ বৃষ্ণি, অন্ধক, যদুকে, জানতে হবে জরাসন্ধের পূর্বপুরুষ কিংবা চেদিপতি শিশুপালের পূর্বপুরুষকেও ; নইলে মহাভারতের পাস্পরিক সামাজিক সূত্রগুলিও বোঝা যাবে না, রাজনীতির খেলাও বোঝা যাবে না।

তবে হ্যাঁ, সেরকম করে বলতে গেলে তো একবারে মনুষ্য সংসারের আদি পুরুষ মনু পর্যন্ত যেতে হয়। আমরা অত দূর যাব না এবং সত্যি বলতে কি, গেলে সুবিধেও হবে না। মনুষ্য সংসারে অতি পূর্বপুরুষের স্মৃতি অস্পষ্ট হয়ে যায়, বিশেষত যে পুরুষ অকৃতী—তিনি একেবারে স্মৃতির অতলে তলিয়ে যান। আবার যিনি কৃতকর্মা পুরুষ, তাঁর কর্ম রাজা হিসেবে তাঁকে খ্যাতি দিতে পারে, মানুষ হিসেবেও খ্যাতি দিতে পারে। আবার বিচিত্রকর্মা পুরুষ হিসেবেও কেউ বা বিখ্যাত হতে পারেন। যেমন ধরুন যযাতি। সেই যযাতি, যাঁর স্ত্রী দেবযানী একসময় বৃহস্পতিপুত্র কচের প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। সেই যযাতি, যিনি দেবযানীর চৌকি-দেওয়া 'রাহুর প্রেম' সহ্য করতে না পেরে দানব-রাজনন্দিনী শর্মিষ্ঠার বাহুবন্ধনে ধরা দিয়েছিলেন। কৌরব-পাণ্ডবের বংশমূলে বিরাট এক রক্ত-বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল শুধুমাত্র যযাতির বিয়েতেই।

অনেক পরবর্তী সময়ে গাণ্ডীবধারী অর্জুন মহামতি কৃষ্ণের কাছে খুব বড় মুখ করে বলেছিলেন—কুলক্ষয় হলে সমাজে পুরুষ-মানুষ কমে যাবে। পুরুষ কমে গেলেই মেয়েরা নাকি সব ভারি দুষ্টু হয়ে পড়ে এবং মেয়েরা দুষ্টু হলেই নাকি সমাজে বর্ণসংকর তৈরি হয়—স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসংকরঃ[১]। ভগবদ্গীতার কথারম্ভেই অর্জুন অনুযোগ করে বলেছেন—এই বর্ণসংকর একবার ঘটলে আর রক্ষে থাকবে না— অনন্ত নরক জুটবে কপালে। পিতৃ-পুরুষেরা

কুলঘ্ন পুত্রদের কাণ্ডকারখানা দেখে ঘেন্নায় আর তাদের দেওয়া জল স্পর্শ করবেন না—সংকরো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ। পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ।[২] অর্জুনের ধারণা—বর্ণসংকর ঘটলে জাতিধর্ম, কুলধর্ম—সব উচ্ছন্নে যাবে আর এই উচ্ছন্নে-যাওয়া পুরুষদের যে চিরকালের নরকবাস অবধারিত—সে ব্যাপারে অর্জুন একেবারে নিঃসন্দেহ।

কত পুরুষ পরে আপন বংশের রক্তের বিশুদ্ধতায় বিশ্বাসী এক বীর পুরুষের ছেলেমানুষি দেখে যযাতি স্বর্গ থেকে, নাকি নরক থেকে, হেসে উঠেছিলেন কি না—সে খবর আমরা পাইনি, কিন্তু এক পুরুষেই সেই যযাতি যেরকম ব্রাহ্মণ-চণ্ডালে মেল-বন্ধন করেছিলেন, সে খবর অর্জুন পেলে আর খামোকা যুদ্ধপর্বে হঠাৎ করে কৃপাবিষ্ট হয়ে পড়তেন না। সত্যি কথা বলতে কি, যযাতির খুব একটা উপায় ছিল না। ব্রাহ্মণ শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী যখন বিদ্যার্থী কচের কাছে প্রত্যখ্যাত হলেন, তখন—আবার মোরে পাগল করে দিবে কে—এই আশাতেই বসেছিলেন। দুর্ভাগ্য নয়, সৌভাগ্যক্রমেই এর মধ্যে তাঁর সঙ্গে শর্মিষ্ঠার একটা ঝগড়া হয়ে গেল। শর্মিষ্ঠা দানব-রাজার মেয়ে, সে দেবযানীর বাপ তুলে পাঁচ কথা তাঁকে শুনিয়ে দিল। দেবযানী বললেন—আমরা তোদের গুরুবংশ। তোর বাবা আমার বাবার শিষ্য সেই সূত্রে তুই আমার শিষ্যর মত—শিষ্যা ভূত্বা মমাসুরি। এসব গুরুগিরি শর্মিষ্ঠার সহ্য হল না। সে বললে—শিষ্যা! দিন-রাত দেখছি—উঠতে-বসতে তোর বাবা দাস-বাঁদীর মত আমার বাবার কাছে তোষামুদি করে যাচ্ছে—আসীনঞ্চ শয়ানঞ্চ পিতা তে পিতরং মম। তুই হলি সেই তোষামুদে, যাচক এবং আমার বাবার কাছ থেকে টাকা-খাওয়া বাপের মেয়ে। আর আমি! আমি হলাম গিয়ে তার উল্টো।[৩]

শর্মিষ্ঠা রাগের চোটে দেবযানীকে একটি কুয়োয় ফেলে দিলেন এবং তার নিশ্চিত মৃত্যু জেনেই বাড়ি ফিরলেন।

সৌভাগ্য একেই বলে। মৃগয়াশ্রান্ত পিপাসু যযাতি রাজা কুয়োয় জল খেতে এসেই দেখেন কুয়োর মধ্যে আগুনপানা এক মেয়ে। রাজা প্রশ্ন করলেন—কে তুমি মেয়ে? মাজা তামার মত লাল লাল কি সুন্দর নখগুলি তোমার, সোনার মত গায়ের রঙ, কি হয়েছে তোমার, কেমন করেই বা কুয়োয়-পড়লে? রমণীর মুখ কিংবা, অন্যান্য অঙ্গ বাদ দিয়ে যযাতি যে দেবযানীর নখের প্রশংসা করলেন, তার কারণ বুঝতে পারছেন তো? বিপন্ন দেবযানী কুয়োর মধ্যে থেকে হাতখানি উঁচিয়ে কেবলই 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে কাঁদছিলেন অতএব রাজারও চোখ প্রথমেই পড়েছে দেবযানীর আঙুল আর নখের ওপর। দেবযানী দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের পরিচয় দিয়ে বললেন—আমি তাঁরই কন্যা। দেবযানী ভাবলেন—তিনি বামুনের মেয়ে, রাজা ক্ষত্রিয়—যদি বেশি পিতৃপরিচয়ে রাজার দ্বিধা হয়, পতিতোদ্ধারে বিঘ্ন হয়, তাই রীতিমত অঙ্ক কষে বললেন—এই সেই দখিন হাতখানি আমার, যে হাতের তাম্ররুচি নখগুলির প্রশংসা করছিলে তুমি—এষ মে দক্ষিণো রাজন্ পাণিস্তাম্র নখাঙ্গুলিঃ—তুমি আমাকে এই হাত ধরেই কুয়ো থেকে তোল।[৪] রাজা দেবযানীর হাত ধরে কুয়োর বাইরে নিয়ে এলেন এবং ব্রাহ্মণকন্যা জেনে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে গেলেন।

রাজা বিদায় নিতেই দেবযানী প্রথমে শর্মিষ্ঠার সঙ্গে হিসেব চুকিয়ে নিলেন।

অসুররাজ বৃষপর্বার নগরে তিনি ঢুকলেনই না। লোক পাঠিয়ে শুক্রাচার্যকে ডেকে এনে তাঁকে শর্মিষ্ঠার গা-জ্বালানো কথাগুলি শোনালেন। বললেন—তুমি আগে বল শর্মিষ্ঠা যা বলেছে তা ঠিক কিনা ? সে বলেছে—তুমি দৈত্যরাজের মোসাহেব—দৈত্যানামসি গায়নঃ।[৫] বলেছে—আমি হলাম সেই মেয়ে, যার বাবা তোষামুদে, যাচক এবং তার বাবার নুন খায়—স্তুবতো দুহিতা নিত্যং যাচতঃ প্রতিগৃহ্নতঃ।[৬] রাগে অপমানে দেবযানী বললেন—তুমি সত্যি করে বলো পিতা। আমি শর্মিষ্ঠাকে বলেছি—সত্যিই যদি আমি তোষামুদে কিংবা যাচক পিতার মেয়ে হই, তা হলে তাকে আমিও দাসীভাবে প্রসন্ন করব। শুক্রাচার্য দৈত্যগুরু এবং কিঞ্চিৎ মেজাজী মানুষ। উল্টোপাল্টা কথা, দেবযানীর প্রতিক্রিয়া—এত সব ঘটনায় প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেলেও পরিষ্কার বললেন—ঠিক উল্টোটাই সত্য দেবযানী ! তুমি হচ্ছ সেই বাপের মেয়ে যাকে অন্যেরা তোষামোদ করে, সে কারও তোষামোদ করে না—অস্তোতুঃ স্তূয়মানস্য দুহিতা দেবযান্যসি।[৭] আমার ক্ষমতার কথা জানেন স্বয়ং দৈত্যরাজ বৃষপর্বা, জানেন দেবরাজ ইন্দ্র আর জানেন পৃথিবীর রাজা নহুষপুত্র যযাতি। শুক্রাচার্য নানারকম জ্ঞান-বিজ্ঞানের তত্ত্ব স্মরণ করে দেবযানীকে বললেন—এমন শিষ্যের বাড়িতে আর এক দণ্ডও বাস নয়, বিশেষত বৃষপর্বার মেয়ের কথার জ্বালা আমার একটুও সহ্য হচ্ছে না। শুক্রাচার্য দৈত্যরাজ বৃষপর্বাকে সোজা সব জানিয়ে বললেন—আর তোমার রাজ্যে এক মুহূর্তও নয় বাপু ! তোমাকে আমি সবান্ধবে ত্যাগ করলাম—ত্যক্ষ্যামি ত্বাং সবান্ধবম্।[৮]

দৈত্যরাজ প্রমাদ গণলেন। ঘটনার অগ্রপশ্চাৎ কিছুই তিনি জানেন না। তবু গুরুকে বারংবার অনুনয় করলেন, পায়ে ধরলেন, শেষে বললেন—আপনি না থাকলে সমুদ্দুরের জলে ডুবে মরতে হবে আমাকে। অটল শুক্রাচার্য বললেন—তুমি সমুদ্রের জলেই প্রবেশ কর, অথবা যেদিক ইচ্ছে চলে যাক তোমার অসুরবাহিনী, মেয়ের অপমান আমি সহ্য করব না—দুহিতুর্নাপ্রিয়ং সোঢুং শক্তো'হং দয়িতা হি মে ॥[৯]

দৈত্যরাজ এবারে খানিকটা বুঝলেন, বুঝলেন—ব্যাপারটা বাপের নয়, মেয়ের। শুক্রাচার্য নিজেও সে ইঙ্গিত দিয়েছেন—ভাল চাও তো, আমার মেয়েকে তুষ্ট কর—দেবযানী প্রসাদ্যতাম্।[১০]

ওই এত্তটুকুন মেয়ে তার কাছে কারণ না জেনে ক্ষমা চাওয়া ! প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় দৈত্যদের রাজা দেবযানীর কাছে নত হতে পারলেন না, আবারও তাই শুক্রাচার্যকেই বললেন—এই অসুরদের যা ধন-সম্পত্তি, হস্তী অশ্ব রথ—যা আছে সব আপনার। শুক্র বললেন—সব বুঝলাম, কিন্তু 'দেবযানী প্রসাদ্যতাম্'। দেবযানী দারুণ হিসেবী এবং অঙ্ক-কষা মেয়ে। তিনি বললেন—বাবা ! এই যে দৈত্যরাজ বলছেন সব তোমার, সে কথা আমি কিন্তু তেমন করে বুঝি নে, উনি নিজে পরিষ্কার করে বলুন সে কথা—রাজা তু বদতু স্বয়ম্। দৈত্যরাজ এবার দেবযানীর দিকে মুখ ফেরাবার অবসর পেলেন, বিনা দ্বিধায় জানালেন দেবযানী যা চান তাই হবে, তিনি যা চান তাই পাবেন। রাজা, রাজ্য, পিতা, পরিবার—সবার সুখের জন্য, সবচেয়ে বড় কথা—দৈত্যদের হিতকামী গুরু ব্রাহ্মণ শুক্রাচার্য যাতে রাজ্য ছেড়ে চলে না যান—তার জন্যও রাজার দুলালী

শর্মিষ্ঠা দেবযানীর ইচ্ছেমত তাঁর দাসী বনে গেলেন।

হিসেবী, অঙ্ককষা দেবযানীর একটা হিসেব শেষ হল। কিন্তু মজা হল, জীবনের ক্ষেত্রে যাঁরা অঙ্ক কষে চলেন তাঁদের অনেক সময় ফলে ভুল হয়। বৃহস্পতিপুত্র কচের বেলায় দেবযানীর অঙ্ক মেলেনি। এবারে কুয়ো থেকে উঠে আগে নিজের বিপন্ন অস্তিত্বই শুধু শুধরে নেননি, পুনশ্চ অঙ্কে মন দিয়েছেন। মহারাজ যযাতিকে তিনি ভোলেননি, ভোলেননি যে, সে মানুষটা দেবযানীর তামার মত লাল আঙুলের প্রশংসা করেছিল। ভোলেননি যে, শর্মিষ্ঠার সঙ্গে বোঝাপড়ার তাগিদে সেই ক্ষণিকের অতিথিকে একটুও যত্ন করা হয়নি, তার দখিন হাতের রসজ্ঞকে আদর-যত্ন দূরে থাকুক, একটু ধন্যবাদ পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। দেবযানী তাই প্রতিদিনই প্রায় সেই বনে যান—মৃগয়া-রসিক রাজা আবার যদি পিপাসু হয়ে সেইখানে আসেন। অনেকদিন পর দেবযানী তাঁর এক হাজার দাসী নিয়ে এবং অবশ্যই দাসীকৃতা শর্মিষ্ঠাকে নিয়ে সেই জায়গাটায় এসে উপস্থিত হলেন। সখীদের হাসাহাসি, হাল্কা পানীয়—পিবন্ত্যো মধুমাধবীম্—খাওয়া-দাওয়া, আলসে ফলে কামড়—তার মধ্যে 'পুনশ্চ নাহুষো রাজা' যযাতি এসে পৌঁছোলেন। ঠিক সেই জায়গায়—তমেব দেশং সংপ্রাপ্তঃ—শ্রান্ত, জলার্থী। যযাতি দেখলেন, হাজার রমণীর মধ্যে স্বপ্নসুন্দরীর মত দুই মেয়ে। তার মধ্যে একজন বসে আছেন, আরেকজন তাঁর পা টিপে দিচ্ছেন—শর্মিষ্ঠয়া সেব্যমানং পাদসংবাহনাদিভিঃ।[১১] যযাতি রাজা। শতেক রাজরমণীর ঘোরে তিনি দেবযানীকে ভুলেই গেছেন হয়তো। কিন্তু শর্মিষ্ঠাকে দেখেও তাঁর দাসী বলে মনে হয়নি, তাই দুজনেরই নাম, গোত্র জিজ্ঞাসা করলেন। নামের সঙ্গে গোত্র জিজ্ঞাসা মানেই শুভ ইঙ্গিত আছে কোন। শর্মিষ্ঠা হাজার হলেও রাজার মেয়ে, তার গোত্র দেবযানীর পক্ষে বিপজ্জনক বলেই কথা বললেন দেবযানী, কারণ তিনি রাজাকে ঠিক চিনেছেন। যদিও না চেনার ভান করছেন। দেবযানী প্রথমে জাঁকিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন। তারপর শর্মিষ্ঠাকে দেখিয়ে বললেন—ওটি আমার সখী এবং দাসী। 'সখী' কথাটায় যদি আবার কোন সম্মানের আভাস পান রাজা, তাই দাসীত্বের ভাগই যে শর্মিষ্ঠার মধ্যে বেশি সেটা প্রমাণ করার জন্য দেবযানী বললেন—ও আমার সখী এবং দাসী, আমি যেখানে যেখানে যাব, সেখানে সেখানেই ও আমার সঙ্গে সঙ্গে যাবে—ইয়ঞ্চ মে সখী দাসী যত্রাহং তত্রগামিনী।[১২] সৌজন্যবশে রাজার সামনে শর্মিষ্ঠার একটু ঠুনকো পরিচয়ও দিলেন দেবযানী। বললেন—ও দানবরাজ বৃষপর্বার মেয়ে।

মনে মনে রাজার শর্মিষ্ঠাকে পছন্দ হয়েছিল। তাই তাঁর সম্বন্ধেই যযাতির কৌতূহল স্বাভাবিক। সেই কৌতূহলেই রাজা বললেন—সে আবার কি কথা? এই সুন্দরী রমণী, অসুর-রাজার মেয়ে—অসুরেন্দ্রসুতা সুভ্রূঃ...কন্যেয়ং বরবর্ণিনী—সে তোমার দাসী হল কি করে? দেবযানী আসল কথার ধারে-কাছে গেলেন না। ঘটনা, প্রশ্ন এবং কৌতূহল—এই তিনের মধ্যেই অন্তরীক্ষ লোকের অভিসন্ধি মিশিয়ে দেবযানী বললেন—সবই কপাল, রাজা! সবই কপাল। কপালের এলাকায় আর কোন প্রশ্ন নয়, রাজা! দেবযানীর কথার সুরে গুরুগিরি ছিল, রাজাকে তিনি বললেন—মেলা কথা বোল না এ ব্যাপারে—মা বিচিত্রাঃ কথাঃ কৃথাঃ, তার চেয়ে বরং বল তুমি কে, কোত্থেকে আসছ, কেনই বা আসছ?

দেবযানী চিনেও না চেনার ভান করলেন। রাজা পরিচয় দিলেন, মৃগয়াশ্রান্তিতে জলপিপাসার কারণ দেখালেন। প্রত্যুত্তরে দেবযানী তাঁর একশ কন্যা-দাসীর সঙ্গে শর্মিষ্ঠার সঙ্গে নিজেকেও রাজার কাছে নিবেদন করে বললেন—তুমি আমার সখা হও, স্বামী হও—সখা ভর্তা চ মে ভব। কচের সঙ্গে বাল্যের প্রেমে দেবযানীর অভিশাপ ছিল। কিন্তু এখন তিনি অভিজ্ঞা যুবতী। দেবযানী বামুনের মেয়ে নন শুধু, গুরু শুক্রাচার্যের কন্যা। বুঝি এই কারণেই সেকালের রীতিতে তিনি স্বামীর দাসী হতে চাননি, তাঁকে সখার মত চেয়েছেন।

ঠিক এই রকম একটা জায়গায় মহাভারতের মান্য টীকাকার নীলকণ্ঠ আর থাকতে পারেননি। শুষ্ক টীকাকার পর্যন্ত বুঝেছেন যে, মহারাজ যযাতির তাৎক্ষণিক সমস্যা ছিল দুটি। এক, দেবযানীর থেকে দৈত্যকুমারী শর্মিষ্ঠা তাঁর বেশি মনপসন্দ। দুই, দেবযানীকে সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করলে তাঁর রাগ হবে এবং সেই রাগ তাঁর পিতা শুক্রাচার্যের মধ্যেও সংক্রামিত হবে। ফল রাজার পক্ষে ভয়ানক হতে পারে। যযাতি তাই দেবযানীর প্রস্তাব শুনে প্রথমে বললেন—আমি তোমার যোগ্য নই কন্যে, কোথায় তুমি ব্রাহ্মণ-গুরুর মেয়ে, আর কোথায় আমি ক্ষত্রিয়, এ বিয়ে হয় না দেবযানী—অবিবাহ্যা হি রাজানো দেবযানি পিতুস্তব। দেবযানী বললেন—তাতে কি হয়েছে, বামুনের সঙ্গে ক্ষত্রিয়ের, ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে বামুনের কত বিয়ে হয়েছে। বামুন-ক্ষত্রিয়ের বর্ণসংকর সমাজের বেশ চলে—সংসৃষ্টং ব্রহ্মণা ক্ষত্রং ক্ষত্রেণ ব্রহ্ম সংহিতম্।[১৩] কত উচ্ছিন্ন ক্ষত্রিয়বংশ ব্রাহ্মণদের সরসতায় সজীব হয়ে উঠেছে ; তাছাড়া সেরকম করে ধরতে গেলে তুমিও রাজা, ব্রাহ্মণ ঋষির ছেলে। ঋষি বুধের কল্যাণে ইলার গর্ভে জন্মালেন পুরুরবা, তার দু'পুরুষ পরেই তো তুমি। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে তুমি আমার ঋষি, ঋষিপুত্র সব, তুমি আমায় বিয়ে কর না গো।

'বিয়ে কর না গো'—এই শব্দগুলিতে সংস্কৃত আছে—অঙ্গ বহস্ব মাম্। 'বহস্ব' অবশ্যই বিয়ে করা বোঝায়, কিন্তু আসল অর্থ তো বহন করা। দেবযানী বুঝতে পারছিলেন না যে, রাজা শব্দটা বহন করা অর্থেই গ্রহণ করছিলেন, অথচ বোঝাটি মাথা থেকে নামাতেও পারছিলেন না। রাজা দেবযানীর গলা-ধরা প্রণয়বচন শুনে যুক্তির কথায় এলেন। বললেন—চতুর্বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে এক জায়গা থেকেই, সেই পরম পুরুষই আমাদের সবার মূল। তবু কি জান, তুমি বামুন ঘরের মেয়ে, তোমাদের পালনীয় ধর্ম আলাদা, শৌচ-শুদ্ধি আচারও আলাদা রকমের। আবার আমরা ক্ষত্রিয়। আমাদের ধর্মবোধ ভিন্ন, শুদ্ধির বিচারও ভিন্ন ধরনের, রুচিও ভিন্ন—পৃথগ্‌ধর্মাঃ পৃথক্‌শৌচাঃ—কাজেই এ বিয়ে হয় না। দেবযানী এবার মোক্ষম প্রশ্ন তুলে রাজাকে ফেলে দিলেন প্যাঁচে। আমি আগেই বলেছি, রাজাকে তিনি ঠিকই চিনেছিলেন এবং এখন তাঁর নাম শুনে পরিচয় পেয়ে নিশ্চিন্ত দেবযানী সেই পুরোন কথার জালে ফেলে দিলেন রাজাকে। দেবযানী বললেন—তুমি এত ধর্ম-কর্ম করছ, তুমি তোমার হাতের ধর্মটা কি মেনেছ ! সেই যে তুমি আমার হাত ধরে কুয়ো থেকে টেনে তুললে, সেই কথা মনে রেখেই আমি তোমায় স্বামীত্বে বরণ করেছি। আমার মত ভদ্রঘরের মেয়েদের হাত কি স্বামী ছাড়া অন্য কেউ ধরে—কথং নু মে মনস্বিন্যাঃ পাণিমন্যঃ পুমান্ স্পৃশেৎ। রাজা তবু ব্রাহ্মণ জাতির উদ্দেশে বহু সম্মান

জানালেন, তাঁরা ক্রুদ্ধ হলে সাধারণ মানুষের কত বিপদ হতে পারে সে সব জানিয়েও রাজা রেহাই পেলেন না। দেবযানী পিতা শুক্রকে সব বলে, এমনকি হাত ধরার কথাও উল্লেখ করে রাজার প্রতি তাঁর প্রণয় বাঞ্ছা ব্যক্ত করলেন। কন্যার কথায় শুক্রাচার্য বিনা দ্বিধায় ক্ষত্রিয় যযাতির সঙ্গে দেবযানীর বিয়ে দিয়ে দিলেন। শুধু সাবধান বাণী তাঁর এই ছিল যে, "আমার মেয়ের সঙ্গে দাসী হিসেবে এই বৃষপর্বার মেয়ে শর্মিষ্ঠাও যাচ্ছে। তুমি যেন বাপু তাকে আবার আদর করে বিছানায় তুলো না—সম্পুজ্য সততং রাজন্ মা চৈনাং শয়নে হ্বয়েঃ।[১৪]

শুক্রাচার্যের ইচ্ছায় এবং দেবযানীর উপরোধে ক্ষত্রিয় যযাতি প্রতিলোম বর্ণসংকরের ঢেঁকি গিললেন। অর্জুনের গীতোক্ত বক্তৃতা অনুসারে যযাতির নরকবাসের খবর কিছু পাওয়া যায়নি। তবে হ্যাঁ, এই পৃথিবীতেই নরকের দ্বার পর্যন্ত তিনি ঘুরে এলেন, কিন্তু তার কারণ অন্য এক স্বর্গসুখ। দেবযানী তো বিয়ের পর সোজা এসে ঢুকলেন যযাতির অন্তঃপুরে। প্রেমানন্দে তাঁর দিন কাটতে লাগল, পুত্রাদিও লাভ হল। ওদিকে অশোকবনের উপান্তে ঘর বানানো হল শর্মিষ্ঠার থাকার জন্য। কত কাল চলে গেল, শর্মিষ্ঠা শুধু এখন যুবতী নন, নবীন যৌবনের অকারণ অবহেলা তাকে পীড়া দেয়। রাজার ওপর তাঁর যে খুব আসক্তি ছিল তা মনে হয় না, কিন্তু তিনি ভাবলেন—দেবযানী ভাল আছে বলে আমি খারাপ থাকব কেন? তার যৌবন সফল হচ্ছে, আমার যৌবন বৃথা—বৃথাহং প্রাপ্তযৌবনা। সে পুত্র লাভ করেছে, আমার পুত্র নেই। শর্মিষ্ঠা ভাবলেন—যেমন করে দেবযানী তাঁকে বরণ করেছে, তেমনি করে আমিও তাঁকে বরণ করব—যথা তয়া বৃতো ভর্তা তথৈবাহং বৃণোমি তম্। শর্মিষ্ঠার একটাই সংশয়, রাজার সঙ্গে যদি একবার নির্জনে, দেবযানীর চোখের আড়ালে দেখা হত। মহাভারতকার লিখেছেন শর্মিষ্ঠা এইরকম সংশয় করছেন, আর রাজা সেই সময়েই যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হলেন অশোকবনিকার উপান্তে। আমরা বলি, এত নাটকীয়তা ভাল নয়। শর্মিষ্ঠার প্রতি রাজা পূর্বাহ্নেই আকৃষ্ট ছিলেন, রাজার ঘরের মেয়ের জন্য রাজার বেদনাবোধও ছিল। অশোকবনের এদিক-ওদিক তিনি মাঝে মাঝেই আসতেন বলে আমাদের বিশ্বাস। আজকে উতলা বাতাসে শর্মিষ্ঠার ছটফটানি দেখে তিনি ধরা দিয়েছেন মাত্র। নইলে শর্মিষ্ঠা যখনই বলেছেন—রূপে, চরিত্রে কি কৃষ্টিতে আমাকে তো তুমি জান রাজা—যযাতি তখনই বলেছেন—তোমার মধ্যে এক ফোঁটাও অসুন্দর নেই—রূপঞ্চ তে ন পশ্যামি সূচ্যগ্রমপি নিন্দিতম্—তুমিই সবচেয়ে সুন্দর।

পূর্বে আকর্ষণ না থাকলে এমন কথা আসে না। কিন্তু মুশকিল হল শুক্রাচার্যকে নিয়ে, যিনি অনেক আগেই বুঝেছিলেন যে শর্মিষ্ঠার ওপরে রাজার লোভ হতে পারে। রাজা বললেন—সবই তো বুঝলাম, কিন্তু শুক্রাচার্য যে বলেছিলেন—বৃষপর্বার মেয়ে শর্মিষ্ঠাকে আবার তোমার সঙ্গে শোবার জন্য ডেকে বোস না যেন—তার কি হবে! শর্মিষ্ঠা হাজার হলেও মেয়ে। যযাতি যেদিন প্রথম দেবযানীকে শর্মিষ্ঠার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন সেদিনই দৈত্যরাজার কন্যা মনে মনে জানেন যে যযাতি তাঁকে মন দিয়ে ফেলেছেন। তিনি এও জানেন যে দেবযানীর সঙ্গে রাজার যে বিয়ে হয়েছে তার মধ্যে প্রেম নেই একটুও, আছে শুধু অভিশাপের ভয়। কিন্তু অভিশাপের ভয় দেখিয়ে কি

আর অন্তর্হৃদয়ের গতিবেগ রুদ্ধ করা যায়। যযাতি মজেই ছিলেন, তাঁকে আরও মজানোর জন্য শর্মিষ্ঠা বললেন—তুমি জান না রাজা, অন্তত পাঁচটা ব্যাপারে মিথ্যে বললে তো দোষ নেই কোন। ধর তুমি একজনের সঙ্গে ঠাট্টা করছ, তা সেই ঠাট্টার কথায় তো মিথ্যে থাকে, তাতে কি দোষ হয় ? তেমনি মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করার সময় কিংবা একজনের প্রেমে পড়েও যে মানুষ বলে—আমি ওকে ভালবাসি না—এসব মিথ্যেতে দোষ নেই কোন। লক্ষ কথার বিয়ের মধ্যেও মিথ্যে থাকে হাজারটা, তাতেও দোষ নেই—ন নর্মযুক্তং বচনং হিনস্তি ন স্ত্রীষু রাজন্ ন বিবাহকালে।[১৫] নীলকণ্ঠ টীকাকার আবার পদাবলীকারদের মত শর্মিষ্ঠার পক্ষ নিয়ে বলেছেন—বরঞ্চ যে মেয়ে সপ্রেমে আহ্বান জানাচ্ছে, তাকে ত্যাগ করাটাই অন্যায়।[১৬]

শর্মিষ্ঠার যুক্তিটা হল—তাঁর এবং দেবযানীর ব্যবহার এবং উদ্দেশ্য অন্তত একটি জায়গায় এক। দুজনেই যেখানে রাজার কাছে নিজেদের নিবেদন করেছেন, সেখানে 'দেবযানী আমার বউ আর তুমি কেউ নও'—এটা বলাটাই শর্মিষ্ঠার মতে মিথ্যাচার কেননা সেকালের দিনে বিয়ের সময় কন্যার সঙ্গে যে দাসী আসত, সে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বর-পুরুষের বিবাহিতা স্ত্রী না হলেও ভোগ্যা হত, অর্থাৎ স্ত্রীর মতই ব্যবহার পেত। তাদের ছেলেমেয়েরাও কেউ অসম্মানের দায়ে পড়ত না। বিদুর, যুযুৎসু—এরাই তার বড় উদাহরণ। শর্মিষ্ঠা তাই বললেন—তুমি আমার সখীর স্বামী মানেই তো আমারও স্বামী। যেদিন আমার সখীর সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়ে গেল, ঠিক সেই দিন থেকে আমার সঙ্গেও তোমার বিয়ে হয়ে গেছে, রাজা—সমং বিবাহমিত্যাহুঃ সখ্যা মে'সি বৃতঃ পতিঃ।[১৭]

রাজা যযাতি গলতে থাকলেন। তাঁর হৃদয় অর্ধেক ধরা দেওয়াই ছিল শর্মিষ্ঠার কাছে। সেখানে শর্মিষ্ঠার যুক্তিতে তিনি প্রায় সম্পূর্ণ ধরা দিয়ে বললেন—তাহলে তুমিই বল কি করব—ব্রূহি কিং করবানি তে—অর্থাৎ রাজার নিজের আর কোন যুক্তি নেই। শর্মিষ্ঠা বললেন—স্ত্রীলোকের কিংবা দাসী-বাঁদীর কি নিজের বলতে কিছু আছে ? আমি দেবযানীর খাই, পরি ; কিন্তু দেবযানীর সমস্ত অধিকারই তো তোমার। এই যুক্তিতে দেবযানী তোমার যতখানি প্রণয় নিবেদনের যোগ্য, আমিও ঠিক ততটাই—সা চাহঞ্চ ত্বয়া রাজন্ ভজনীয়ে ভজস্ব মাম্। শর্মিষ্ঠাকে এতদিন পরে এমন যুক্তিগ্রাহ্যভাবে লাভ করে রাজা যযাতি তাঁকে দেহ-মন সব দিলেন। মহাভারতকার ঠিক এই মুহূর্তে শর্মিষ্ঠার একটু রূপ বর্ণনা করেছেন। না, সে বর্ণনায় মহাকাব্যের আড়ম্বর জোটেনি কোন। কবি শুধু বলেছেন, রাজার সঙ্গে শর্মিষ্ঠার প্রথম সমাগমে শর্মিষ্ঠার মুখের হাসিটি হয়ে উঠেছিল মিলনমধুর—শর্মিষ্ঠা চারুহাসিনী। এই সমাগমের তৃপ্তি একবারেই শেষ হয়ে যায়নি। একে একে তিনটি পুত্র জন্মাল শর্মিষ্ঠার : দ্রুহ্যু, অনু এবং পুরু। অনেক চাপাচুপি, মিথ্যে, এড়িয়ে যাওয়া, জবাব, জবাবদিহির পর শর্মিষ্ঠা দেবযানীর কাছে ধরা পড়ে গেলেন। আর কি, বাপের আহ্লাদী মেয়ে দেবযানী পিতা শুক্রাচার্যের কাছ থেকে যযাতির জন্য সেধে অভিশাপ নিয়ে এলেন। যযাতির জন্য হাজার বছরের জরার অভিশাপ বরাদ্দ হল। কিন্তু মজা হল, যে দেবযানী স্বামীর জন্য এত বড় সর্বনাশের ব্যবস্থা করলেন, রাজা কিন্তু সেই দেবযানীকে

আরও আরও ভোগ করার জন্য জরারোধের উপায় খুঁজতে লাগলেন। যযাতি বললেন—দেবযানীর ব্যাপারে এখনও আমার যৌবন সফল হয়নি, আপনি দেখুন, যাতে জরা আমার শরীরে প্রবেশ না করতে পারে। শুক্রাচার্য বললেন—যা বলেছি তা হবেই। তবে তুমি যদি তোমার জরা অন্য কারও দেহে সংক্রামিত করতে পার, তাহলে তুমি তোমার যৌবন ফিরে পাবে আবার।

আমরা জানি শুক্রাচার্যের এই বিবেচনা দেবযানীর যৌবনের দিকে লক্ষ রেখেই। রাজা বলেছিলেন, "আমার যে ছেলে জরা নেবে সে শুধু পুণ্য, কীর্তি—এ সবই নয়, রাজ্যও. পাবে সেই"। মহামতি শুক্রও নিজের মেয়ের যৌবন-সাফল্য কামনায় রাজার যুক্তি মেনে নিলেন, কিন্তু দেবযানীর দুই পুত্র যদু এবং তুর্বসু ওই জরা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। অস্বীকার করলেন শর্মিষ্ঠার প্রথম দুই ছেলে দ্রুহ্যু এবং অনুও। শেষে শর্মিষ্ঠার শেষ সন্তান পুরু সানন্দে পিতার জরা গ্রহণ করে পিতৃকার্য সাধন করলেন। সেকালের হিসেব মত এক হাজার বছর চলে গেল। মহারাজ যযাতি দেবযানীর সঙ্গে অনেক যৌনসুখ ভোগ করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে কামনা শুধু আগুনে ঘি পড়ার মত বেড়েই চলে, কমে না। আপন সন্তান পুরুর কাছে এই সত্য স্বীকার করে যযাতি জরা ফিরিয়ে নিলেন এবং যৌবন ফিরে পাওয়া পুত্রকে রাজ্যে অভিষেক করতে চাইলেন।

এই 'পলিটিক্স' আরম্ভ হয়ে গেল। রাজ্যের সমস্ত ব্রাহ্মণ-সজ্জনেরা সাধারণ প্রজাদের সঙ্গে দল পাকিয়ে ধর্মনাশের রব তুললেন। ব্রাহ্মণেরা বললেন—আপনি শুক্রাচার্যের নাতি এবং দেবযানীর গর্ভে আপনার বড় ছেলে যদুকে বাদ দিয়ে শর্মিষ্ঠার ছেলে পুরুকে রাজা করছেন কি করে? তাও সে আবার সবার ছোট। বামুনের ধারায় বড় ছেলেকে বাদ দিয়ে শর্মিষ্ঠার ছোট ছেলেকে রাজা করা একেবারেই অধর্ম। রাজা যযাতি এবার শুক্রাচার্যের কথাই ফিরিয়ে দিলেন। তাঁর যুক্তি হল—যে ছেলে পিতার ইচ্ছে বজায় রাখার জন্য হাজার বছরের জরা আপন দেহে স্বীকার করতে পারে, সেই ছেলেই রাজ্য পাবার উপযুক্ত। তাছাড়া শুক্রাচার্যও বলে দিয়েছিলেন—তোমার যে ছেলে জরা গ্রহণ করবে তাকেই রাজ্য দেবে তুমি—পুত্রো বঃ ত্বানুবর্তেত স রাজা পৃথিবীপতিঃ।[১৮] কাজেই যযাতির রাজ্যে ছোট ছেলেই রাজা হবে—সে শর্মিষ্ঠার ছেলেই হোক আর যেই হোক।

আসলে শুক্রাচার্যের অঙ্কে গোলমাল হয়ে গেল। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন—দেবযানীর বড় ছেলেই যযাতির জরা স্বীকার করে নেবে। কিন্তু দেবযানীর ছেলেরা নিজের যৌবন নিয়েই এত ব্যস্ত যে, বাবার যৌবন নিয়ে তাঁরা কেউ মাথা ঘামাননি। অন্যদিকে যযাতি শুক্রাচার্যের কাছে নিজেকে যতই দেবযানীর যৌবনলুব্ধ বলে বর্ণনা করুন না কেন, সেটা ছিল দেবযানীকে দেখিয়ে জরা মোক্ষের অভিসন্ধি। তাঁর আসল ভালবাসাটা অসুররাজ নন্দিনী শর্মিষ্ঠার ওপরেই ছিল এবং তাঁর ছেলেকেই তিনি রাজ্য দিয়েছিলেন। অর্থাৎ শর্মিষ্ঠার ওপর রাজার যে ভালবাসা তাঁর দৃষ্টিলগ্নেই জন্ম নিয়েছিল, বশংবদ পুত্রের কারণে সে ভালবাসা আরও বেড়ে গেছে।

আমরা যে বড় ঘটা করে ক্ষত্রিয় রাজা যযাতি আর অসুররাজ বৃষপর্বার মেয়ে শর্মিষ্ঠার প্রেমকাহিনী বর্ণনা করলাম, তার কারণ আছে। মনে রাখা দরকার—কৌরব-পাণ্ডবের বংশ-ধারায় প্রথমেই তাহলে অসুর রক্ত ঢুকেছে এবং ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডুর মধ্যে যে ছোটভাই রাজা হলেন—এটাও তাহলে নজিরবিহীন কোন ঘটনা নয়। গীতার মধ্যে বর্ণসংকর নিয়ে অর্জুন যত মাতামাতি করেছেন, সেটা নিতান্তই বালকসুলভ, কারণ তাঁরই পূর্বতন রাজচক্রবর্তী পুরু মহারাজের কথা তাঁর জানা ছিল। আরও বালকসুলভ এই জন্যে যে, এই রাজবংশের মাথামুণ্ডু জোড়া দিলে অর্জুন কেন, কারও পক্ষেই সেটা স্বস্তিকর হবে না। পরবর্তী কালের এক রসিক কবি তো এমন মন্তব্য করেছেন যে, বাবা! আর যাই কর নদী, ঋষি আর ভরত বংশ—নদীনাঞ্চ ঋষীণাঞ্চ ভারতস্য কুলস্য চ—এই তিনের মূল কখনও খুঁজতে যেও না—মূলান্বেষো ন কর্তব্যঃ—খুঁজতে গেলে বিপদে পড়বে। এই শ্লোকটির অর্থ অনেকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। যেমন স্বয়ং পঞ্চানন তর্করত্ন, তাঁর গরুড় পুরাণের বঙ্গানুবাদে।[১৯] কিন্তু আমরা জানি পাণ্ডব-কৌরব, কৃষ্ণ ঠাকুর, ব্যাসদেব, ভরদ্বাজ—এত সব মহামতি পুরুষের বংশমূল খুঁজতে গেলে হয় দেব-দ্বিজে ভক্তি একেবারে রসাতলে যাবে, নয়তো প্রত্যেকের আপন বংশমূল সম্বন্ধে সংকর-নিশ্চয় দৃঢ়তর হবে।

শুধু ওই মহারাজ পুরু থেকে ভরত পর্যন্ত গেলেই দেখবেন পাণ্ডব-কৌরবের রক্তে আরও কত রকমের রক্ত মিশেছে। অসুরের রক্ত, ঋষির রক্ত, রাজার রক্ত, বেশ্যার রক্ত, সবই আছে। রক্তের মিশেলটা প্রথমে বলে নেওয়া দরকার এই জন্যে যে, পরবর্তী কালের পাণ্ডব-কৌরবের 'পলিটিকসে'র সঙ্গে এই রক্তানুসন্ধান জড়িত। যযাতি মহারাজের তিন পুরুষ আগে পুরূরবা স্বর্গবেশ্যা উর্বশীর বাহুবন্ধনে ধরা দিয়ে তাঁরই গর্ভে ছেলে পেয়েছিলেন, যার নাম আয়ু। আয়ুর ছেলে নহুষও খুব বড় রাজা ছিলেন। স্বর্গরাজ্য জয় করে ইনি ভাবলেন—আমি যখন এতই পেলাম, তাহলে ইন্দ্রের স্ত্রী ইন্দ্রাণী শচীই বা আমার ভোগ্যা হবে না কেন? ঐশ্বর্যের মোহে তিনি তখনকার সমাজমুখ্য ব্রাহ্মণদের নিযুক্ত করলেন নিজের পাল্কি বওয়ার কাজে। স্বর্গসুন্দরী শচীর লোভ একেবারেই সামলাতে না পেরে পাল্কি-বেহারা বামুন অগস্ত্যের মাথায় লাথি মারেন—পাল্কি তাড়াতাড়ি বইবার জন্য। ফলে অভিশাপ, বিজন বনে অজগর হয়ে বসেছিলেন, শেষে যুধিষ্ঠিরের করুণায় মুক্তি লাভ করেন। নহুষের পরেই আমাদের যযাতি, যাঁর কথা আমরা এতক্ষণ বলেছি এবং আরও একটু বলতে হবে।

বস্তুত যযাতি রাজার বংশধরদের দিয়েই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস পরিষ্কারভাবে তৈরি হয়ে যায়। অনেক পণ্ডিত এমনও বলেছেন যে, যযাতির হাজার বছরের জরার গপ্পোটা অন্যভাবে ধরলে ক্ষতি কি? তাঁদের ধারণা, এই যে দেবযানীর ছেলে যদু, তুর্বসু কিংবা শর্মিষ্ঠার অন্য ছেলেরা দ্রুহ্যু কিংবা অনু—এঁরা সবাই যথেষ্ট বড় হয়ে গিয়েছিলেন। অন্যদিকে জরাগ্রস্ত বুড়ো যযাতি তখনও

শারীরিকভাবে যথেষ্ট সুস্থ। তিনি রাজ্য চালনার ব্যাপারে তখনও পুত্রদের সাহায্য নেন না। ছেলেরাও তাতে অসন্তুষ্ট। তাঁরা চাইতেন যযাতি এবার ছেড়ে দিন, আর কত? হয়তো একসময় এই ছেলেরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণেও মন দিয়েছিল, ফলে যে ছেলে একমাত্র পিতৃপক্ষপাতী অর্থাৎ পুরু, তিনিই পিতার রাজ্য পেলেন এবং তাঁর মাধ্যমেই যেন আসল বংশের ধারাটি চলতে থাকল। পণ্ডিতের বুদ্ধিদৃষ্টি যাই হোক, বাস্তবটা ছিল অন্যরকম। বাস্তবে যযাতির অন্য ছেলেরাও রাজ্য পেলেন, তবে যযাতির আপন ভূখণ্ডে নয় যযাতি কি তাঁর অন্য ছেলেদের নির্বাসন দিয়েছিলেন? যযাতির আপন স্বাধীন রাজ্যে পুরু রাজা হলেন বটে, কিন্তু তাঁর অন্য ছেলেদের বংশ এবং রাজ[illegible]মাও ভারতযুদ্ধের পূর্ববর্তী রাজনৈতিক মানচিত্রে অত্যন্ত গুরুতর।

মহাভারত বলেছে যে, দেবযানীর গর্ভে যযাতির প্রথম ছেলে যদু থেকেই বিখ্যাত যদুবংশ বা যাদবদের সৃষ্টি—যদোস্তু যাদবা জাতাঃ।[২০] যাদবেরা রাজত্ব করতেন চর্মন্বতী, বেত্রবতী আর শুক্তিমতী নদীর জল-ধোয়া অঞ্চলে অর্থাৎ এখনকার দিনের চম্বল, বেতোয়া এবং কেন নদীর অববাহিকা অঞ্চলে। দেশের নাম বলতে গেলে মথুরা, ভরতপুর থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণে টিকমাগড় ছত্তরপুর পর্যন্ত ছিল যদুবংশীয়দের আধিপত্য। যযাতির দ্বিতীয় ছেলে তুর্বসুর থেকে নাকি যবনদের সৃষ্টি আর শর্মিষ্ঠার গর্ভে যযাতির পঞ্চম ছেলে অনু থেকে সৃষ্টি হলেন ম্লেচ্ছরা। সোজা কথায় তুর্বসুর রাজত্ব ছিল যবন দেশে আর অনুর ম্লেচ্ছ দেশে। পণ্ডিতেরা অবশ্য বলেছেন যে তুর্বসু শব্দটার সঙ্গে যেহেতু তুরানি, তুর্কি—এগুলোর মিল আছে তাই তুর্বসুই ছিলেন ম্লেচ্ছদের আদিপুরুষ আর যবন শব্দটার সঙ্গে যেহেতু 'আইওন' শব্দের মিল আছে, অতএব অনুই ছিলেন যবনদের রাজা। অর্থাৎ পণ্ডিতদের মতে তুর্বসু থেকে যবনদের এবং অনু থেকে ম্লেচ্ছদের উৎপত্তির কথা না বলে, উল্টে বলা উচিত অনু থেকে যবন আর তুর্বসু থেকে ম্লেচ্ছ। যবন আর ম্লেচ্ছ নিয়ে আমরা মাথা ঘামাব না। কারণ এঁরা ছিলেন ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত দেশবাসী।

যদুবংশের যাদবেরা যেমন ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমে জায়গা করে নিয়েছিলেন, তেমনি দ্রুহ্যর ছেলে ভোজেরাও জায়গা করে নিয়েছিলেন যমুনার পশ্চিম পার থেকে চম্বলের উত্তর পর্যন্ত। বলতে পারেন—যাদবে আর ভোজে একটু যেন মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে। আমরা বলব, এ মাখামাখি পূর্বেও ছিল, পরেও হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞাতি শত্রুতাও হয়েছে যথেষ্ট। পরবর্তী সময়ে যাদবেরা কিংবা ভোজেরা একে অন্যের বংশের বড় মানুষদের নামে আপন বংশমাহাত্ম্য খ্যাপন করেছেন বটে, তবে সূক্ষ্মভাবে দেখলে দেখবেন—যাদবেরা অনেক সময় ভোজবংশীয়দের দেখতে পারতেন না, আবার ভোজবংশীয়েরাও যাদবদের দেখতে পারতেন না। এই জ্ঞাতিশত্রুতার শেষ নমুনা ভোজবংশীয় কংসের সঙ্গে যদুবংশীয় কৃষ্ণের লড়াই। এসব কথা পরে আবার আসবে, আপাতত দেখুন, ভারতবর্ষের মাঝখানে বাঁকা তলোয়ারের মত যমুনার 'কনভেক্স' দিকটা অর্থাৎ পশ্চিম পার পর্যন্ত, যেখানে যাদব আর ভোজেরা রাজত্ব করছিল। কৌটিল্য লিখেছেন—ঠিক রাজা, রাজত্ব, এই সব শব্দে যা বোঝায় যাদব-ভোজেদের তা ছিল না। তিনি ভোজ-যাদবকুলের পরবর্তী পুরুষদের নাম

উল্লেখ করে বলেছেন যে, এঁদের রাজ্যগুলি ছিল 'রিপাবলিক' বা 'করপোরেশনে'র মত, যেমন বৃষ্ণিসংঘ, অন্ধকসংঘ।[২১] এই দৃষ্টিতে স্বয়ং কৃষ্ণ-বাসুদেব ছিলেন 'সংঘমুখ্য'।[২২] একটি প্রাচীন মুদ্রায় অবশ্য 'সংঘ' শব্দটার বদলে 'গণ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।[২৩] সত্যি কথা বলতে কি যাদব-ভোজেদের মধ্যে এই সংঘরাজ কিংবা গণরাজের ব্যাপারটা ছিল, যা কিন্তু যযাতির মূল ভূখণ্ডে ছিল না। অবশ্য এ সব অনেক পরের কথা।

হস্তিনাপুর, ইন্দ্রপ্রস্থ এসব তখন কোথায়? পুরু, অর্থাৎ, যযাতির স্বীকৃতি-দেওয়া আসল রাজা তখন রাজত্ব করছিলেন 'প্রতিষ্ঠান' বলে এক ভূখণ্ডে। এই 'প্রতিষ্ঠান' কিন্তু সাতবাহন রাজাদের রাজধানী পৈঠান নয়, জয়চন্দ্র বিদ্যালংকারের মতে এই 'প্রতিষ্ঠান'কে বড়ো জোর এলাহাবাদের নিকটবর্তী 'পিহান' গ্রামের সঙ্গে একাত্ম করা যেতে পারে।[২৪] পুরুর পিতা-পিতামহ যেমন রাজচক্রবর্তী রাজা ছিলেন, পুরুও ছিলেন তেমনি। মহাভারত এবং পুরাণের প্রমাণে কাশী থেকে আরম্ভ করে অযোধ্যার পশ্চিমে এবং সরস্বতী নদীর উত্তর-পশ্চিম পর্যন্ত সম্পূর্ণ মধ্যদেশ তাঁর অধিকারে ছিল। আর ছিল রাজধানী প্রতিষ্ঠানের মণ্ডলবর্তী পশ্চিম, দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব ভূখণ্ড। কিন্তু যযাতিপুত্র পুরু যত বড় চক্রবর্তী রাজাই হোন না কেন, তাঁর মৃত্যুর পর অন্তত নয়-দশ পুরুষ পর্যন্ত কোন বড় রাজা ছিলেন না। ফলত মহাভারত কিংবা পুরাণগুলি এমন অনেক রাজার নাম দিয়ে এই ফাঁক পূরণ করেছে, যা এককে জায়গায় এককে রকম। পণ্ডিতেরা অনেকেই মনে করেন যে; সূর্যবংশের মান্ধাতার ক্ষমতা লাভের পর থেকেই পুরুবংশীয়দের রাজ্যপাট আক্রান্ত হতে থাকে।[২৫] পুরুবংশে পুরুর পরেই নাম করতে হবে মহারাজ দুষ্যন্তের, সেই দুষ্যন্ত, যাঁকে নিয়ে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কবিকীর্তি অভিজ্ঞান শকুন্তলের গ্রন্থনা। কিন্তু দুষ্যন্তের নাম করার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু আরেক বিপদ শুরু হয়। ব্যাপারটা ভেঙেই বলি।

সূর্যবংশে রামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ মান্ধাতা এবং সগরের পরাক্রমে পুরুর বংশধরেরা রাজ্যপাট হারান। এই সময়ে বরপ্রঞ্চ যদু, তুর্বসু এবং অনুর বংশধরেরা অনেক বেশি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। দুষ্যন্ত, যাঁকে আমরা সবাই পুরুবংশের নামী পুরুষ বলে মনে করি, সেই দুষ্যন্তও কিন্তু মানুষ হয়েছিলেন তুর্বসুবংশের মরুত্ত রাজার কাছে। দেখা যাচ্ছে যযাতি অভিশাপ দিয়ে নিজের ছেলেদের যতই আলাদা করে রাখুন না কেন, পরবর্তী বংশধরেরা সে কথা মনে রাখেননি। প্রয়োজনে তাঁরা একে অন্যকে যথেষ্ট দেখেছেন। তুর্বসুর ধারায় জন্মেছিলেন যে মরুত্ত রাজা, তিনি 'রেওয়া' অঞ্চলের পার্বত্য ভূখণ্ডগুলির অধীশ্বর ছিলেন এবং তাঁর কোন বংশধর পুত্র ছিল না, ছিল শুধু এক কন্যা, নাম সম্মতা। মরুত্ত রাজার রাজ্যে দুই মহামান্য ব্রাহ্মণ ছিলেন—বৃহস্পতি এবং সংবর্ত, দুই ভাই। ভাইতে ভাইতে অবশ্য বনত না। বড় ভাই বৃহস্পতির টাকার লোভ ছিল এবং দক্ষিণা-টক্ষিণা নিয়ে বোধহয় দুই তপস্বী ব্রাহ্মণে নিরন্তর ঝগড়া হত। মহাভারত লিখেছে, ছোট ভাই সংবর্ত আর বড় দাদার তাড়না সহ্য করতে না পেরে সমস্ত টাকা-পয়সা ছেড়ে-ছুড়ে উলঙ্গ হয়ে বনে চলে গেলেন—অর্থান্ উৎসৃজ্য দিগ্‌বাসা বনবাসমরোচয়ৎ। এদিকে বড় ভাই বৃহস্পতি মহত্তর ঐশ্বর্যের লোভে দেবরাজ ইন্দ্রের পুরোহিত হলেন এবং মরুত্ত রাজার যজ্ঞাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করতে অস্বীকার

করলেন। নানাজনের পরামর্শে তুর্বসুবংশীয় মরুত্ত সংবর্তকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে পৌরোহিত্য সঁপে দিলেন তাঁর হাতে। সেই পৌরোহিত্যে মরুত্ত এত খুশি হলেন যে, নিজের মেয়ে সম্মতাকে দক্ষিণা হিসেবে দান করলেন সংবর্তের হাতে। হরিবংশ বলেছে এই সম্মতাই দুষ্যন্তকে পুত্র হিসেবে লাভ করেন। এখন, সম্মতা সংবর্ত ঋষির ঔরসেই দুষ্যন্তকে লাভ করেন, নাকি অন্য কোন উপায়ে—সে কথা সমস্ত পৌরাণিক গ্রন্থগুলিতেই অস্পষ্ট, কিন্তু দুষ্যন্তের খ্যাতি ছিল পুরুবংশীয় বলেই। এমন হতে পারে যে, পুরুবংশের কোন অখ্যাত পুরুষের হাতে সম্মতাকে দান করেন সংবর্ত এবং তারই ফলে দুষ্যন্ত পৌরব। কিন্তু মরুত্ত যেহেতু নামী রাজা ছিলেন, অথচ তিনি অপুত্রক, তাই দুষ্যন্তকে তিনিই পুত্র-নির্বিশেষে লালন পালন করেন— দুষ্যন্তং পৌরবং চাপি লেভে পুত্রম অকল্মষম্। ফল হল এই যে, যযাতিপুত্র তুর্বসুর বংশধারা লুপ্ত হয়ে গেল এবং তুর্বসুর বংশ একাত্ম হয়ে গেল পৌরব বংশের সঙ্গে—পৌরবং তুর্বসোর্বংশঃ প্রবিবেশ নৃপোত্তম।[২৬]

দুষ্যন্তের জন্মকাহিনী যতই রহস্যাবৃত হোক, পুরু রাজার পরে তিনিই যে একমাত্র গৌরবময় পুরুষ ছিলেন এবং পুরুবংশের দশ-এগারো জন অখ্যাত পুরুষের পরে একমাত্র দুষ্যন্তই যে সে বংশের আশা-ভরসা ছিলেন সেটা বোঝা যায় মহাভারতের একটি শব্দেই। মহাভারত বলেছে যে, দুষ্যন্ত ছিলেন পৌরবদের শিবরাত্রির সলতে—পৌরবাণাং বংশকরো দুষ্যন্তো নাম বীর্যবান্।[২৭] ক্ষমতায় বলবুদ্ধিতে এবং রাজনীতিতে দুষ্যন্তের একান্ত পারদর্শিতাতেই মান্ধাতা-সগরের দ্বারা উৎখাত পিতৃভূমি আবার দুষ্যন্তের হাতে আসে। ঐতিহাসিক পারজিটার মন্তব্য করেছেন—The Pawrava claimant then was Dusyanta, for the Pawrava realm had been overthrown since Mandhatri's time, and Dusyanta had been adopted as heir by Marutta of Turvasu's line, but after Sagara's death he re-established the Pawrava dynasty. মজা হল দুষ্যন্ত অনেককাল বাইরে বাইরে ছিলেন বলেই হোক কিংবা পুরুবংশের অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়েছিল বলেই হোক, প্রতিষ্ঠানে বোধহয় আর দুষ্যন্তের রাজধানী ছিল না, যদিও তিনি উত্তর ভারতের বিশাল ভূখণ্ড আপন সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন।

যে দুষ্যন্তের নিজের পিতৃ-পরিচয় কি, তার ঠিকানা নেই, সেই দুষ্যন্ত কিন্তু কণ্বমুনির আশ্রমে মোহময়ী শকুন্তলাকে দেখে তাঁর জাত বিচার করতে লাগলেন। এদিকে শকুন্তলাকে দেখে তিনি প্রেমে পড়ে গেছেন, ওদিকে ভাবছেন মুনির এমন রূপবতী কন্যা জন্মাল কি করে? দুষ্যন্ত একসময় প্রশ্নই করে বসলেন শকুন্তলাকে—হ্যাঁগো কন্যে এমন সুন্দর চেহারা তোমার, এমন গুণের মেয়ে তুমি, তোমার পিতৃপরিচয় কি—এবং রূপগুণোপেতা কুত স্ত্বমসি শোভনে? প্রথম পরিচয়ে শকুন্তলা বললেন—আমি মহর্ষি কণ্বের মেয়ে। কিন্তু দুষ্যন্ত সেকথা বিশ্বাস করবেন কেন! তিনি উল্টে বললেন—মহর্ষি কণ্ব ঊর্ধ্বরেতা পুরুষ, ব্রহ্মচারী! তাঁর আবার মেয়ে হবে কি করে? শকুন্তলা এবার সত্য পরিচয় দিয়ে বললেন—মহর্ষি মহাতেজা বিশ্বামিত্র একমসয় গভীর তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। দেবরাজ তাঁর তপস্যায় উদ্বিগ্ন হলেন। ইন্দ্রত্ব চলে যাওয়ার আশঙ্কায় তিনি শেষে

স্বর্গবেশ্যা মেনকাকে ধরলেন। ইন্দ্র বললেন—তুমি তোমার রূপ, যৌবন, মাধুর্য, হাসি, কটাক্ষ—যা দিয়ে পার বিশ্বামিত্রকে ভোলাও। তাঁর তপস্যা ভেঙে যাক তোমার উন্মাদক রূপ দেখে। মেনকা বললেন—সবই তো বুঝলাম, কিন্তু ওই রাগী মুনি, তেমনি কড়া তাঁর স্বভাব। নিজে ক্ষত্রিয় থেকে বামুন হয়েছেন, আর শত কীর্তি স্থাপন করেছেন নিজের তপোবলে। তাঁর সামনে গিয়ে ছলাকলা দেখালে আমি মরব না ? তুমি আমায় বাঁচানোর ব্যবস্থা কর, আমি যাচ্ছি। সহায় হোন আমার বায়ু দেবতা, সহায় হোন ভালবাসার দেবতা মন্মথ, আমি যাচ্ছি।

তাই ঠিক হল। মেনকা গিয়ে বিশ্বামিত্রকে সামান্য সম্ভাষণ করেই তাঁর সামনে নানা কায়দা করতে থাকলেন। এমন সময় বায়ু দেবতা জোরাল হাওয়ায় মেনকার পরনের কাপড় একেবারে উড়িয়ে নিয়ে গেলেন। এই সব স্বর্গবেশ্যা অপ্সরাদের কাপড় দেহের সঙ্গে কিভাবে সংলগ্ন থাকে জানি না, তবে মেনকার কাপড় একেবারে উড়েই গেল। উড়ন্ত কাপড়খানি ধরতে গিয়েই যেন মেনকা মাটিতে পড়ে গেলেন এবং তপ-উপবাস ক্লিষ্ট মুনির সামনে একেবারে বিবৃতা হয়ে পড়লেন। বেশ্যাদের বোধহয় মুখ দেখে বয়স বোঝা যায় না, কারণ বসনের অন্তরালে মেনকাকে দেখে বিশ্বামিত্র হয়তো তার রূপ-যৌবন বুঝতে পারছিলেন না ; এবারে পারলেন—অনির্দেশ্যবয়োরূপাম্ অপশ্যদ্ বিবৃতাং তদা। আর কি, বিশ্বামিত্র মোহিত হলেন, মেনকাও তাই চাইছিলেন। দুজনে পরস্পর রতিতে আসক্ত হলেন। অনেক কাল রসে-রমণে কেটে গেল, তবু বিশ্বামিত্রের মনে হল যেন এই একদিন হয়েছে—যথৈক দিবসং তথা। মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হল। মালিনী নদীর তীরে বিজন বনে মেনকা গর্ভ মুক্ত করে স্বর্গের দিকে রওনা দিলেন। আত্মজা কন্যার ওপর মেনকারও মায়া নেই, আর মেনকার গর্ভোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বামিত্রেরও বোধ হয় মায়া-মোহের মুক্তি ঘটেছিল। শ্বাপদসংকুল বনে পাখিরা অসীম মমতায় যখন শকুন্তলাকে ঘিরে রয়েছে, সেই সময় আহ্নিক করতে গিয়ে শকুন্তলাকে পেলেন কণ্ব। সেই থেকে তিনি কণ্বের মেয়ে বলেই পরিচিত।

এই সম্পূর্ণ কাহিনী নিজের মুখে নির্দ্বিধায় জানালেন মহাভারতের শকুন্তলা। দ্বিধা হবার কথাও নয়। মা স্বর্গবেশ্যা বলে সেকালে কারও লজ্জা হত না। উর্বশী, মেনকা, রম্ভা অনেক অনেক বড় মানুষের মা, তাতে তাঁরা সমাজে কেউ অপাত্র ছিলেন না। তবে এই স্বর্গবেশ্যাদের সম্বন্ধে আমাদের একটা কল্পনা আছে। পাঠক সেটা মানবেন কিনা জানি না। এই যে বনবাসের সময় উর্বশীকে পূর্বপুরুষের স্ত্রী বলে অর্জুন তাঁর ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করলেন এবং বৃহন্নলা হবার অভিশাপ পেলেন—এই ঘটনাটা কি ভেবে দেখেছেন ? উর্বশী ছিলেন অর্জুনের বহু পূর্বপুরুষ পুরুরবার স্ত্রীকল্পা, বিশ পঁচিশ পুরুষ পরে সেই উর্বশী কি উর্বশীই আছেন বলে আপনারা মনে করেন ? আমাদের ধারণা—লৌকিক পৃথিবীতে যেমন চলচ্চিত্র জগতের বিখ্যাত নায়ক-নায়িকাদের নামে ছেলে-মেয়েদের নামকরণ করেন বাবা-মা, যেমন বয়স্ক লোকেরাও অনেক সময় সমতুল্য কাজ করে বিখ্যাত মানুষের নামে চিহ্নিত হন তেমনি রূপ-মর্যাদা সম্পন্ন স্বর্গবেশ্যারাও পূর্বখ্যাতা উর্বশী, মেনকা, রম্ভার উপাধি লাভ করতেন। আর পুরাকালে যেখানে এই মর্ত্যজগতের গণিকারাই রূপে-গুণে-বৈদগ্ধ্যে সমাজের শ্রেষ্ঠা মহিলা বলে

গণ্য হতেন, সেখানে স্বর্গবেশ্যারা তো আরও অনেক গুণে সরেস। সুযোগ পেলে মুনি, ঋষি, দেবতা, মানুষ—কেউই তাঁদের সঙ্গসুখ কিংবা স্বর্গসুখ থেকে বঞ্চিত হতে চাইতেন না। তবে অর্জুন উর্বশীকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষের বধূকল্পার সমাসনে আসীনা সমান পদমর্যাদার মহিলা বলে। এই মর্যাদাবোধ, সূক্ষ্মরুচি অর্জুনের ছিল, যার জন্য স্বয়ং রতি-যাচিকা উর্বশীকে তিনি বলেছিলেন—আমি যে মেনকা, রম্ভা—সবার মধ্যে তোমার দিকে বেশি করে তাকিয়েছিলাম, তার কারণ আমার মন চলে গিয়েছিল সেই সুদূর অতীতে, মনে হয়েছিল এই উর্বশীই তো প্রসিদ্ধ পৌরব বংশের জননী—ইয়ং পৌরববংশস্য জননী মুদিতেতি হ।[২৮]

অর্জুনের এই কথার প্রতিক্রিয়া হিসাবে স্বর্গবেশ্যা উর্বশীর কিন্তু একবারও পুরুরবার কথা মনে পড়েনি। বরঞ্চ উল্টে উর্বশী বলেছিলেন, আমরা বাপু সবার কাছেই মুক্ত। পুরুবংশের ছেলে, নাতি—এখানে এলে সব সমান—পূরোর্বংশে হি যে পুত্রা নপ্তারো বা ত্বিহাগতাঃ।[২৯] কিন্তু মহাভারতের উদাত্ত নায়ক উর্বশীর আসনে বসা উর্বশীকে মাতৃস্থানেই রেখেছিলেন, সম্মান দিয়েছিলেন পুরুবংশের জননী বলে। দুঃখ লাগে অর্জুন মেনকার কথাটা বলেননি বলে। অবশ্য মেনকা তাঁর কাছে রতি-প্রার্থনাও জানাননি। কিন্তু এই মেনকাও তো অর্জুনের ভাবধারায় প্রসিদ্ধ ভারতবংশের জননী। যাই হোক—সেই পুরুরবার আমলে পৌরববংশে যে স্বর্গবেশ্যার রক্ত মিশেছিল, সেই রক্ত বিশুদ্ধ হতে না হতেই আবার মেনকার রক্ত মিশল। দুষ্যন্ত যখন রাগের মাথায় নিজের বিবাহিতা পত্নী শকুন্তলাকে চিনেও চিনতে না পেরে গালাগালি দিয়েছিলেন, তখন স্পষ্টই শকুন্তলাকে বলেছিলেন—তোর মা মেনকা হল বেশ্যা—মেনকা নিরনুক্রোশা বন্ধকী জননী তব—তার মেয়ে বলে তোর কথাগুলোও ঠিক বেশ্যার মত—পুংশ্চলীব প্রভাষসে।[৩০] বোঝা যাচ্ছে—সময়ান্তরে স্বর্গবেশ্যাও বেশ্যার অসম্মানই পেয়েছেন এবং পৌরবজননী উর্বশীর সমগোত্রীয়া বলে আলাদা কোন সম্মান তো দূরের কথা, অনুপস্থিত অবস্থায় শুধুই তিরস্কার পেলেন মেনকা।

তবে মহাভারতের শকুন্তলাও কালিদাসের শকুন্তলার মত আধেক কথায় শরম-জড়িতা হবার পাত্রী নন। তিনি দুষ্যন্তকে এমন গালাগালি দিতে থাকলেন, যা আমাদের সতী-সাধ্বী স্ত্রীলোকদের বিব্রত করবে। অনেকক্ষণ এটা-ওটা বলার পর শকুন্তলা ছেলেকে দেখিয়ে (পাঠক! মহাভারতের শকুন্তলা ছেলে সর্বদমনকে বেশ বড়সড় করেই নিয়ে এসেছিলেন) বললেন—রাজা! সত্য ত্যাগ কর না। এত কথার পরেও যদি তোমার মন মিথ্যের দিকেই পড়ে থাকে, তাহলে আমি নিজেই চলে যাচ্ছি এখান থেকে। তোমার মত মানুষের সঙ্গে আমি কোন সম্বন্ধই রাখতে চাই না—তাদৃশে নাস্তি সঙ্গতম্। এবারে নাম ধরে ডেকে শকুন্তলা বলেন—দুষ্যন্ত! অত রাজ্যপাটের গুমোর কোর না। কপালে থাকলে তুমি ছাড়াও আমার এই ছেলে এই বিরাট পৃথিবী রাজ্য হিসেবে লাভ করবে। গমনোন্মুখী শকুন্তলা এতই ক্রোধান্বিতা ছিলেন যে, সেই মুহূর্তেই দৈববাণী নেমে এল—ভরস্ব পুত্রং দুষ্যন্ত—দুষ্যন্ত! তুমি ছেলেকে প্রতিপালন কর। শকুন্তলাকে অপমান কোর না। শকুন্তলা ঠিক বলেছে, তুমিই তার গর্ভাধান করেছ এবং এই ছেলে তোমারই। আমাদের কথায় যেহেতু এর ভরণ-পোষণ করা উচিত, তাই

এই ছেলের নাম হোক ভরত—ভরতো নাম তে সুতঃ।

ভরতের জন্ম সম্বন্ধে এই দৈববাণী মহাভারত থেকে আরম্ভ করে সমস্ত প্রাচীন পুরাণে আছে। দৈববাণী শুনে রাজা দুষ্যন্তে বললেন—আমি নিজেও জানতাম যে, এটি আমারই ছেলে। কিন্তু সভাস্থলে শকুন্তলার কথামাত্র এই ছেলেকে ছেলে বলে মেনে নিলে, সাধারণের নানা আশঙ্কা হত। তারা ভাবত—রাজা আমাদের চোখের আড়ালে ছিল, কে না কে এই চরিত্রহীন মেয়ের সঙ্গে মিলিত হয়েছে, এবং ছেলেটাও হয়তো বা জারজ। তাই তোমাকে এই সর্ব লোকসমক্ষে শুদ্ধ করে নেবার জন্যই তোমার সঙ্গে এমন বিরূপ ব্যবহার করেছি। রাজা প্রচুর ক্ষমা-টমা চেয়ে নিলেন শকুন্তলার কাছে, প্রচুর খাওয়া-দাওয়া, গয়নাগাটি এবং কাপড়চোপড়ের ব্যবস্থা করলেন শকুন্তলার জন্য। তুর্বসুবংশে পালিত পৌরব রাজা দুষ্যন্তর সঙ্গে কণ্বমুনির পালিতা কন্যা শকুন্তলার সম্বন্ধ পুনরুজ্জীবিত হল। সব থেকে বড় কথা—আগন্তুক ছেলেটিকে রাজা সঙ্গে সঙ্গে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। ভরতের রথচক্রের ধ্বনি সেকালের ভারতবর্ষের চতুর্দিকেই শোনা গেছে। মহাভারতকার মন্তব্য করেছেন যে, ভরত ছিলেন চক্রবর্তী রাজা, সার্বভৌম রাজা। তিনি এতটাই কীর্তিমান ছিলেন যে, তাঁর নামেই আজ পর্যন্ত এই বিশাল ভূখণ্ডের নাম ভারতবর্ষ—ভরতাদ্ ভারতী কীর্তি র্যেনেদং ভারতং কুলম্—তাঁর নামেই প্রসিদ্ধ ভরত বংশ।[৩১]

ভরতের সময়েই যে আর্যগোষ্ঠীর মূল পুরুষেরা উত্তর ভারতের বিশাল ভূখণ্ড অধিকার করে নিয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মহাভারত লিখেছে—একটা রাজসূয় যজ্ঞ করতেই লোকের প্রাণ বেরিয়ে যায়, ভরত সেখানে কতগুলি রাজসূয় সম্পন্ন করেছিলেন এবং সেগুলো করেছিলেন কোথায়? সবচেয়ে বড় যজ্ঞটা করেছিলেন যমুনার তীরে, দ্বিতীয়টা সরস্বতীর তীরে এবং তৃতীয়টা গঙ্গার তীরে। এই তথ্য থেকে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে সরস্বতী নদী থেকে আরম্ভ করে একেবারে গঙ্গা পর্যন্ত ছিল মহারাজ ভরতের রাজত্ব। পণ্ডিতদের মধ্যে যাঁরা আরও স্পষ্টবাদী, তাঁরা বলেন যে, পঞ্জাবের যে অঞ্চলে মোটামুটি আর্যদের বসতি তৈরি হয়েছিল, ভরতের আমলে তা বেড়ে একেবারে গঙ্গার পার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তাই বলে ভরতের আমলেও কিন্তু সেই প্রসিদ্ধ হস্তিনাপুর প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভরতের আরও পাঁচ পুরুষ পরে এবং যাঁর নাম এই রাজধানী প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িত তাঁর নামটিই ছিল হস্তী। এই নাম থেকেই হস্তিনাপুর—হস্তী, য ইদং হাস্তিনপুরং স্থাপয়ামাস।[৩২] এতদস্য হাস্তিনপুরত্বম্। হস্তীর কথা পরে আসবে, আগে আমরা মহারাজ ভরতের কথাটা শেষ করে নিই।

এই বিরাট ভারত ভূখণ্ডের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ ভরত শুধু রাজ্যাধিকার নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন না, রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রজার কাছে তাঁর সততা আজও দৃষ্টান্ত হিসেবে আলোচিত হয়। শোনা যায় দূরদর্শনে যে মহাভারত হয়ে গেল, তার প্রথম দিকে বংশগতভাবে রাজশক্তি পরিচালনার বিরুদ্ধে বেশ একখানি ছোটখাট বক্তৃতা সাজানো হয় ভরতের মুখে। কারণ পুত্র হলেও, অযোগ্য ব্যক্তি রাজা হয়ে রাজ্যশাসন করবেন, এই নীতির বিরুদ্ধে ছিলেন ভরত। আমরা খুব বিশ্বস্ত মহল থেকে জেনেছি যে, দূরদর্শনে মহাভারত আরম্ভ হওয়ার সময় মন্ত্রী-পর্যায়ের

একটি বোর্ড নাকি ভরতের মুখ থেকে এই জোরালো বক্তৃতাটি ছেঁটে দেয়। নিন্দুকেরা সন্দেহ করে যে, মহাভারত আরম্ভ হওয়ার সময় ভারতবর্ষের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর পারিবারিক ধারাই নাকি এই বক্তৃতাটি ছেঁটে দেবার মূলে। গণতন্ত্রের রাজত্বে তথাকথিত জনগণের দ্বারা গঠিত প্রধানমন্ত্রীর খুশি-অখুশি নিয়ে যেখানে অন্য মন্ত্রীরা এত চিন্তা করেন, সেখানে সেইকালের দিনে রাজতন্ত্রের ধ্বজাধারী হয়েও ভরত তো তাহলে বিপ্লব করে ফেলেছিলেন বলে মনে হতে পারে।

মহাভারত যে খবর দিয়েছে, তাতে সামান্য ভুল আছে বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। মহাভারত একবার বলেছে—ভরত নাকি কাশীর রাজা সর্বসেনের মেয়ে সুনন্দাকে বিয়ে করেন এবং তাঁরই গর্ভে ভূমন্যুর জন্ম দেন। কিন্তু মহাভারতেরই অন্য এক বিবরণ অনুযায়ী ভরতের তিনটি স্ত্রী এবং তাঁদের গর্ভে তিন তিনটি করে ন'টি ছেলের জন্ম দেন ভরত। ছেলেরা বড় হলে তাদের মতি-গতি দেখে ভরত সিদ্ধান্ত নিলেন যে, ছেলেরা কেউই মানুষের মত মানুষ হয়নি এবং কেউই তাঁর মত নয়—নাভ্যনন্দত তান্ রাজা নানুরূপা মমেত্যুত। ছেলের মায়েরা ভরতের ভাব দেখে ছেলেদের মেরেই ফেললেন। রাজার পুত্রজন্ম বিফল হয়ে গেল। পুত্রকামনায় রাজা অনেক যজ্ঞ করে শেষে মহর্ষি ভরদ্বাজের কাছ থেকে ভূমন্যু বলে একটি পুত্রলাভ করলেন—লেভে পুত্রং ভরদ্বাজাদ্ ভূমন্যুং নাম ভারত।

মহাভারতের ভাব থেকে মনে হতে পারে যেন ভরদ্বাজের ঔরসে নিয়োগপ্রথায় পুত্র পেলেন রাজা। ব্যাপারটা এত সহজ ছিল না। বিশেষত প্রাচীন পুরাণগুলি যেহেতু পুরাতন রাজবংশের কথা, কীর্তি এবং কাহিনী অনেকটাই রক্ষা করেছিল, তাই পুরাণগুলির তথ্য আমাদের খানিকটা মানতেই হবে। হ্যাঁ, এ কথাটা ঠিক যে, মহারাজ ভরত তাঁর জীবৎকালেই রাজ্যের সমৃদ্ধি এবং রাজ্য শাসনের যশ এতটাই লাভ করেছিলেন যে, আদর্শ রাজধর্মের ন্যায়-নীতি অনুযায়ী নিজের ছেলেদেরই তিনি রাজ্য শাসনের উপযুক্ত মনে করেননি। মায়েরা অকালকুষ্মাণ্ড ছেলেগুলিকে মেরে ফেলেছিলেন, এ খবরটা বাড়াবাড়ি হয়তো, কিন্তু রাজপুত্র হওয়া সত্ত্বেও যে ছেলেরা আপন পিতার কাছেই রাজ্য পাবার অনুপযুক্ত বিবেচিত হয়, সেই ছেলেরা যে বীরপ্রসবা মায়েদের কাছে মৃত বলেই গণ্য হয়, সেটা বোঝানোর জন্যই বুঝি এই মৃত্যু ঘটানোর কথা বলা হয়েছে। যাই হোক, মোদ্দা কথা হল, মহারাজ ভরত বংশ-রাজত্বে বিশ্বাস করতেন না। উপযুক্ত রাজ্য শাসকের জন্য তিনি খোঁজভাঁজ আরম্ভ করলেন। মহাভারতে এবং পুরাণগুলিতে এই সংকটমুহূর্তে পুত্রকামনায় ভরতের যজ্ঞকল্পনার কথা আছে, কিন্তু আমরা বুঝি ভরত একটি উপযুক্ত ছেলে খুঁজছিলেন, যাকে তিনি পুত্রত্বে বরণ করবেন এবং রাজ্য দিয়ে যাবেন। যদি যজ্ঞকথায় বিশ্বাস করি, তাহলে দেখা যাবে যে, ভরতের পুত্রজন্ম বিফল হওয়ার পর তাঁর যজ্ঞকর্মে সন্তুষ্ট হয়ে মরুদ্‌গণ মহর্ষি বৃহস্পতির ছেলে মহর্ষি ভরদ্বাজকে ভরতের পুত্রত্বে স্থাপন করেন। ছেলে পেয়ে ভরত খুব খুশি হলেন। বাস্তবে পুত্রজন্ম বিফল হওয়া সত্ত্বেও পুত্রলাভ করলেন বলে সে পুত্রের নাম হল 'বিতথ' অর্থাৎ বিতথ ভরদ্বাজ ; বিতথ মানে বিফল। মহর্ষি ভরদ্বাজ জন্মলগ্নে ব্রাহ্মণ

ছিলেন, ভরতের কাছে দত্তক হিসেবে তিনি ক্ষত্রিয় হয়ে গেলেন—ব্রাহ্মণ্যাৎ ক্ষত্রিয়ো' ভবৎ, তিনি দ্বিপিতৃক অর্থাৎ দুজনকে তাঁর বাবা বলে ডাকার কথা—একজন তাঁর জন্মদাতা বৃহস্পতি, আরেকজন তাঁর পালক পিতা ভরত। এ খবর বায়ু পুরাণের।

কিন্তু কথা হল, যে পুত্রটিকে ভরত দত্তক হিসেবে পেলেন সেই ভরদ্বাজের নামই 'বিতথ', নাকি তাঁর ছেলের নাম 'বিতথ' ? তারও ওপরে আরেক চিন্তা হল—মহর্ষি ভরদ্বাজ নিজেই প্রসিদ্ধ ভরত বংশে রাজা হয়ে বসলেন, নাকি তাঁর ছেলে রাজা হলেন ? এ সব প্রশ্ন এবং বিভিন্ন পুরাণের লিপি প্রমাদে পণ্ডিতদের মাথা ঘুরে গেছে। মৎস্য পুরাণ লিখেছে—'তারপর বিতথ নামে ভরদ্বাজ রাজা হলেন' ততস্তু বিতথো নাম ভরদ্বাজো নৃপো' ভবৎ। কিন্তু তার দু লাইন পরেই আছে "বিতথ জন্মালে পরে মহারাজ ভরত স্বর্গত হলেন এবং পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে মহর্ষি ভরদ্বাজও স্বর্গস্থ হলেন।" বায়ু পুরাণের তথ্য এবং ভাষাও প্রায় একই রকম। কিন্তু ফাঁক একটা থেকেই যাচ্ছে। এই ফাঁকটা পরিষ্কার করে দিয়েছে হরিবংশ এবং অন্য পুরাণের লিপি প্রমাদও তাতে দূর হয়ে গেছে। ওই যে একটু আগে মৎস্য পুরাণের ভাষায় বলেছি—তারপর বিতথ নামে ভরদ্বাজ রাজা হলেন—তা মোটেই নয়। আসলে হবে—তারপর বিতথ নামে ভরদ্বাজের ছেলে হল—ভরদ্বাজসুতো' ভবৎ। অথবা যদি মৎস্য পুরাণের কথাটাই রাখি তাহলে হবে বিতথ নামে ভরদ্বাজ বংশের রাজা হলেন—ভারদ্বাজো নৃপো' ভবৎ। এরপর হরিবংশ দেখলেই বোঝা যাবে—ছেলে বিতথকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করে মহর্ষি ভরদ্বাজ বনের পথে পা বাড়ালেন। এইটাই স্বাভাবিক। ভরতও মারা গেলেন, ভরদ্বাজও মারা গেলেন, নাটক এত তাড়াতাড়ি শেষ হলে চলে ? সোজা কথায় সিদ্ধান্ত হল মহর্ষি ভরদ্বাজের ব্রাহ্মণ বংশ পৌরব-ভরতের কুলে সংক্রামিত হল আর পণ্ডিতেরা তখন পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির থেকে আরম্ভ করে অনেকেরই ব্রাহ্মণ্য ব্যবহারের তাৎপর্য খুঁজে পেলেন—

The fact that Bharat's successors in the Pawrava line were really of brahmanic origin is of the highest importance, and helps to elucidate many peculiar features in their history.

পণ্ডিতেরা যেটাকে 'brahmanic origin' ভেবে পুলকিত হচ্ছেন সেটাকে কিন্তু আমরা জারজের 'অরিজিন'ও বলতে পারি। কারণ এই যে ভরদ্বাজ ভরতের পুত্রত্বে কল্পিত হলেন, ইনি কিন্তু পরিষ্কার জারজ সন্তান। পুরাণগুলি সে কথা লুকায়নি একটুও। দেবতা মরুদ্‌গণ ভরদ্বাজকে যেখানে ভরতের বংশে অনুপ্রবিষ্ট করেছেন, তার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু আগে বা পরে বায়ু এবং মৎস্য পুরাণ স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, পরে ঋষি হোন আর যাই হোন এই ভরদ্বাজ কিন্তু মহর্ষি বৃহস্পতির জারজ সন্তান। কথাটা এইরকম—সেকালে উশিজ বলে এক ঋষি ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম মমতা। বায়ু পুরাণের মতে মমতার স্বামী উশিজ মারা গিয়েছিলেন। অন্যমতে তিনি অন্যত্র বেড়াতে গিয়েছিলেন। উশিজের ভাই হলেন বৃহস্পতি। উশিজ মারাই যান আর বেড়াতেই যান, তাঁর স্ত্রী ছিলেন আসন্নগর্ভা। গর্ভবতী রমণীর সৌন্দর্যবাহুল্যে মোনালিসা প্রমাণ কিনা জানি না,

বৃহস্পতি বৌদিদির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বললেন—তুমি এক্ষুনি দারুণ করে সেজে গয়নাগাঁটি পরে আমার সামনে এস তো দেখি আমি তোমার সঙ্গে মিলিত হব—অলংকৃত্য তনুং স্বাং তু মৈথুনং দেহি মে শুভে। দেবগুরুর কথা শুনে মমতা-বৌদি বললেন—ও আবার কি কথা ! আমার পেটে তোমার দাদার ছেলে রয়েছে—অন্তর্বত্নী অস্মি তে ভ্রাতুঃ—তার ওপরে পেট যে একেবারে ভরা পেট—মহাগর্ভো রোচতে'তি বৃহস্পতে। আর এ পেটের ছেলেও তো আর যেমন—সেমন নয়, পেটের মধ্যেই সে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করছে। আর এখন তুমি এই সব করতে চাইছ, এ কি ধম্মে সইবে—ধর্মশ্চৈব বিগর্হিতঃ। মমতা এবার অনুনয়ের সুরে বললেন—বৃহস্পতি ! আমি গর্ভবতী, আর তুমি যা চাইছ তাও নিষ্ফল হবার নয় কারণ তুমি অমোঘবীর্য, অতএব এখন তুমি আমার সঙ্গে এ সব করতে পার না—ন মাং ভজিতুমর্হসি। তুমি বরং আমার এই সময়টা পার হয়ে যেতে দাও, তারপর তুমি যা চাও তাই হবে—অস্মিন্নেব গতে কালে যথা বা মন্যসে বিভো।

মমতার এত অনুনয়ের কথা শুনেও দেবগুরু বৃহস্পতি নিজেকে দমিত রাখতে পারলেন না। তিনি বললেন—দেখ বৌদি ! তুমি আমাকে জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা কর না—বিনয়ো নোপদেষ্টব্যঃ ত্বয়া মম কথঞ্চন। এই বলেই বৃহস্পতি জোর করে মমতাকে জাপটে ধরে মৈথুনের উপক্রম করলেন—ধর্ষমানঃ প্রসহ্যৈনাং মৈথুনায়োপচক্রমে। এবারে মমতার গর্ভস্থ শিশু বলাৎকারে উদ্যত বৃহস্পতিকে বাধা দিয়ে বলল—খুড়োমশাই ! আমি পূর্বাহ্নেই এই গর্ভে জায়গা করে নিয়েছি, এদিকে আপনার এই উপক্রমও ব্যর্থ হবার নয়, কিন্তু এই গর্ভে তো দুজনের স্থান সংকুলান হবে না—নাবকাশ ইহ দ্বয়োঃ। গর্ভস্থ ছেলের ছোট মুখে বড় কথা শুনে বৃহস্পতি অত্যন্ত খেপে গেলেন। তাঁর উন্মাদনার চরম মুহূর্ত সমুচিতভাবে সার্থক না হওয়ায় বৃহস্পতি অভিশাপ দিলেন—সমস্ত জীবের সুখাবহ চরম এই মুহূর্তে তুই যখন আমাকে বাধা দিলি, তাই তুই অন্ধকার নিয়েই জন্মাবি অর্থাৎ অন্ধ হবি। আমাদের ধারণা বৃহস্পতির ধর্ষণের ফলেই মমতার অন্ধপুত্র জন্মাল এবং তাঁর নাম হল দীর্ঘতমা। কিন্তু ওদিকে কি হল ? বৃহস্পতি মমতাকে ছাড়লেন বটে কিন্তু তাঁর আনন্দজনিত তেজ পতিত হল ভূমিতে এবং তার থেকে জন্মাল এক শিশু। মমতার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁকে ধর্ষণ করার ফলে বৃহস্পতির পরাবৃত্ত তেজ থেকে শিশুটি জন্মাল বলে মমতার কোন মমতা হল না শিশুটির প্রতি। উল্টে তিনি রেগে বৃহস্পতিকে বললেন—এই জারজ ছেলেকে তুমিই মানুষ কর—ভর দ্বাজম্—আমি বাড়ি চললাম—ভর দ্বাজং বৃহস্পতে।[৩৩] 'দ্বাজ' মানে জারজ। জারজটাকে মানুষ কর—মমতা স্পষ্টই সেকথা উচ্চারণ করে বললেন। মমতা চলে গেলেন ধর্ষণে অপমানিতা হয়ে। অন্যদিকে বাধা বিপত্তিতে ঠিক রতিসুখ যাকে বলে তা যেহেতু বৃহস্পতির অনুভবে আসেনি, অতএব তিনিও রেগে ছেলে ছেড়ে চলে গেলেন আরেক দিকে। মাতৃপিতৃহীন জারজ ভরদ্বাজ অকারণ অবহেলায় উন্মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে রইলেন, একা।

ঠিক এই সময়েই বুঝি মহারাজ ভরতের যজ্ঞাদি ক্রিয়া চলছিল। দেবতা প্রীত হয়ে মাতৃপিতৃহীন ভরদ্বাজকে এনে দিলেন ভরতের হাতে। দেবতার দান, সে

জারজ কি ঔরস, তা দেখবার দরকার হল না, কারণ তার প্রধান পরিচয়—দেবগুরু বৃহস্পতির ব্রাহ্মণ পুত্র মহারাজ ভরতের কাছে দত্তক দেওয়া হয়েছে। নিয়ম অনুসারে তিনি এখন ক্ষত্রিয়, পুরাণকার অবশ্য ভরদ্বাজকে বলেছেন—দো-আঁশলা-দ্ব্যামুষ্যায়ন, কারণ তাঁর বংশের ছেলেরা ক্ষত্রিয়ও বটে, ব্রাহ্মণও বটে—ক্ষত্রিয়গুলি ভরতের বংশে আর ব্রাহ্মণগুলি বুঝি ভরদ্বাজের বনগমনের পর, বনে বনেই।[৩৪] যাই হোক ভরতের বংশে ভরদ্বাজ মুনি একটি পুত্রের জন্ম দিয়েই তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন, যার নাম আমরা আগে বলেছি, বিতথ। এই বিতথের ছেলে হলেন ভূমন্যু যাকে মহাভারতকার একবার সরাসরি ভরতের ছেলে বানিয়েছেন, দ্বিতীয়বার ভরদ্বাজের ছেলে বানিয়ে দিয়েছেন। এই ভূমন্যুর নাতিই হলেন হস্তী, তিনি হস্তিনাপুর প্রতিষ্ঠা করেন।

হস্তিনাপুরের প্রতিষ্ঠা মানেই কিন্তু আমরা ভারত যুদ্ধের অনেক কাছাকাছি চলে এসেছি। হস্তিনাপুরের প্রতিষ্ঠা মানেই কিন্তু বুঝতে হবে যে, আর্যদের মূল প্রস্থান পঞ্জাব অঞ্চলের সীমানা ছাড়িয়ে উত্তর ভারতের অনেক দূর পর্যন্ত অর্থাৎ একেবারে গঙ্গার পশ্চিম পর্যন্ত পাকাপাকিভাবে চলে এসেছেন। পাকাপাকিভাবে এইজন্য যে, রাজা হিসেবে অন্যের ভূখণ্ড দখল করে ভোগ করা এবং শাসন করার চেয়ে, নিজের নামে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা অনেক বড় কৃতিত্ব। হস্তী তাই করেছেন। কিন্তু পৌরব-ভরত বংশের আরও বাড়-বাড়ন্ত দেখার আগে আমাদের উত্তর ভারত ছাড়াও ভারতবর্ষের চার দিকটাও একটু নজরে রাখতে হবে, না হলে রাজনীতির খেলাটা পরিষ্কার বোঝা যাবে না। মনে রাখতে হবে সরস্বতী-দৃষদ্বতীর জল-ধোয়া মূল আর্যাবর্তের পরিধি এখন গঙ্গা-যমুনা ছাড়িয়ে আধুনিক মিরাট পর্যন্ত চলে এসেছে, কারণ বেশির ভাগ পণ্ডিতেরাই হস্তিনাপুর অঞ্চলকে মিরাটের কাছাকাছি একটি জায়গার সঙ্গে এক করে ফেলেছেন। এখন আমাদের দেখতে হবে, অন্য জায়গাগুলোতে কি হচ্ছে?

॥ ৩ ॥

পৌরব-বংশেরই জ্যাঠতুতো যদুবংশ যে মথুরা, ভরতপুর থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণে টিকমাগড় পর্যন্ত তাঁদের রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছিলেন, সে কথা আমরা আগে বলেছি। আমরা বংশ-পরম্পরার কূটকচালিতে মন দেব না। শুধু বলব—যাদবদের মধ্যে প্রথম বড় রাজা ছিলেন শশবিন্দু, যিনি চক্রবর্তী রাজা ছিলেন বলে পৌরাণিকেরা মনে করেন। বস্তুত তিনি বোধ হয় ইক্ষ্বাকুবংশীয় মান্ধাতার সঙ্গে একযোগে পৌরবদের রাজ্যখণ্ড অনেকটাই অধিকার করে নিয়েছিলেন। কারণ মান্ধাতার স্ত্রী ছিলেন ওই যাদব শশবিন্দুর মেয়ে। এঁরা দুজনেই পৌরববংশের শ্রীহীনতার কারণ হতে পারেন। পৌরববংশে দুষ্যন্ত পর্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য রাজা না থাকাটাই তার প্রমাণ এবং দুষ্যন্তের পূর্ববর্তী পৌরব রাজাদের রাজ্যপাট শশবিন্দুর দাপটে বিনষ্ট হয়েছিল বলেই হয়তো দুষ্যন্ত তুর্বসুবংশের মরুত্ত রাজার কাছে মানুষ হয়েছিলেন—এমনটাও হতে পারে। এ সবই অবশ্য নানা তথ্যের ওপর নির্ভর করে পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন মাত্র।

অপরদিকে সম্রাট শশবিন্দুকে যদুবংশের একমাত্র বিরাট পুরুষ বলে মনে করাটাও ভুল হবে। কারণ যদুবংশের শাখা-প্রশাখা বিভিন্ন বংশে ছড়িয়ে গিয়েছিল। পৌরববংশের মূল ধারাটি আমরা যদি বা কোনক্রমে চিহ্নিত করতে পারি, যদুবংশে সেটা সম্ভবই নয়। এঁদের শাখা-প্রশাখা এত বেশি যে, কয়েক পুরুষ পরেই এঁদের নিজেদের মধ্যে বিয়ে-সাদিও হয়েছে। স্বয়ং পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই এ ব্যাপারে আমাদের বড় প্রমাণ। তাঁর দুই পাটরানী রুক্মিণী এবং সত্যভামা এক অর্থে পরিষ্কারভাবে সম্পর্কে তাঁর বোন। যাই হোক, এ সব পরের কথা পরে হবে, আগে বোঝা দরকার যে, কেমন করে যাদবদের ধারায় এক একটি বংশ এক এক জায়গায় রাজত্ব গেড়ে বসেছিল।

আমরা যে শশবিন্দুর কথা বলেছি, ইনি যদুবংশের একটি বিশেষ ধারায় বিখ্যাত পুরুষ মাত্র। এই রকমভাবে যদুবংশের এক রাজা বিন্ধ্যপর্বতের পশ্চিম-পূর্বে নর্মদার অর্ধেক তীরভূমি অধিকার করে নেন, যার নাম মাহিষ্মতী। এই হৈহয় বংশের ধারাতেই জন্মেছিলেন কার্তবীর্যার্জুনের মত পুরুষ যিনি লঙ্কেশ্বর রাবণের যুবক বয়সের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। রাবণ এঁর কাছে যুদ্ধে হেরে যান। এই বংশেই জন্মেছিলেন তালজঙ্ঘ, যাঁর পূর্ববংশ হলেন হৈহয় পুরুষেরা। হৈহয়েরা কাশী থেকে আরম্ভ করে উত্তর ভারতের অনেক অংশই দখল করেছিল, যদিও এসব বিজয় কাহিনী পুরুবংশীয় দুষ্যন্তের পূর্ববর্তী। মোটামুটি দক্ষিণ মালবের বিস্তৃত ভূমিতেই কিন্তু ছিল হৈহয়দের প্রতিষ্ঠা। এইখান থেকেই তারা কাশী এবং উত্তর ভারতের নানা জায়গা দখলে আনবার চেষ্টা করে। আবার যদুবংশের যে ধারায় শশবিন্দু জন্মেছিলেন, সেই ধারাতেই পরবর্তী সময়ে এক রাজা জন্মান যাঁর নাম জ্যামঘ। জ্যামঘের ভাইয়েরা বিদেহ নগরীর রাজত্বভার পেয়েছিলেন। তাঁদের রাজধানী ছিল মিথিলা। এঁরা রাজ্য পেয়ে জ্যামঘকে বিতাড়িত করেন। শেষ পর্যন্ত বনবাসী ব্রাহ্মণদের সঙ্গে থেকে শক্তি সঞ্চয় করে জ্যামঘ নিজের জন্য একটি রাজ্য সংগ্রহ করার কাজে নামেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই জ্যামঘ নর্মদা নদীর ওপরের দিকটা দখল করে ছত্তিশগড় ছাড়িয়ে সাতপুরা পার্বত্যমালার নিম্নভূমি অধিকার করে ফেলেন। এখনকার কেন নদীর প্রাচীন নাম ছিল শুক্তিমতী—এই শুক্তিমতীর উৎসভূমির কাছাকাছি তাঁর স্থায়ী বসবাসের জায়গা হয়।

জ্যামঘের কথাটা একটু বেশি করে বলছি এই জন্য যে, তাঁর সঙ্গেই গাঁথা রয়েছে বিদর্ভ বা আধুনিক বেরারে যাদবদের ছড়িয়ে যাবার ইতিহাস। জ্যামঘের স্ত্রীর নাম ছিল শৈব্যা। এই শৈব্যা কিন্তু অত্যন্ত তেজস্বনী মহিলা ছিলেন, এতটাই তেজস্বনী যে, তাঁর নিজের সন্তান ধারণের ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও জ্যামঘ দ্বিতীয়বার একটি বিয়ে করে উঠতে পারেননি। অথচ সেকালের দিনে এরকম অবস্থায় দ্বিতীয়বার বিবাহই ছিল স্বাভাবিক। হরিবংশ কিংবা বায়ু পুরাণ তাই শৈব্যার বিশেষণ দিয়েছে 'শৈব্যা বলবতী সতী', এতটাই বলবতী যে, রাজা অন্য স্ত্রীলোকের দিকে দৃষ্টি দিতে ভয় পেতেন। মোদ্দা কথা যদুবীর জ্যামঘ বৌকে অত্যন্ত ভয় পেতেন। যাই হোক, একবার যুদ্ধজয় করার পর বিজিত রাজার এক কন্যাকে দেখে মুগ্ধ হলেন তিনি। মেয়েটি তৎকালীন চিহ্নিত আর্যগোষ্ঠীর কন্যা নাও হতে পারে, কারণ মেয়েটির নাম ছিল উপদানবী। আমাদের

ধারণা—মেকলা কিংবা সাতপুরা পার্বত্যমালার যে সব অঞ্চল জ্যামঘ নিজের অধিকারে আনেন, সে সব অঞ্চল আগে অনার্য নাগদের কিংবা অন্যান্য পার্বত্য উপজাতির দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। উপদানবী এই সব অঞ্চলের মেয়েও হতে পারে। কিন্তু উপদানবীকে পাওয়ার পরেও জ্যামঘ কিন্তু বৌয়ের ভয়ে তাঁকে বিয়ে করে ফেলতে পারেননি। তিনি তাঁকে রথে চড়িয়ে নিজের রাজধানীতে নিয়ে এলেন। ভাবলেন, যদি বা মেয়েটিকে দেখে 'বলবতী' শৈব্যার মন গলে এবং পুত্রার্থে রাজাকে বিবাহের অনুমতি দেন। কিন্তু শৈব্যা সেসব কিছুই বললেন না, বরঞ্চ মেয়েটিকে রাজার সঙ্গে আসতে দেখে নিশ্চয়ই তিনি রাগে কট্‌মট্‌ করে তাকিয়েছিলেন। নইলে সেই মুহূর্তে রাজার কথাবার্তা সব উল্টোপাল্টা হয়ে গেল এবং অত্যন্ত ভয়ে, সংকোচে শৈব্যাকে তিনি বললেন—ভার্যাম্‌ উবাচ সন্ত্রাসাৎ—এই দ্যাখ তোমার ছেলের বৌ নিয়ে এসেছি। শৈব্যা বললেন—কার ছেলের বৌ ? শৈব্যার ছেলেই নেই, তাতে ছেলের বৌ! রাজা বুঝলেন, ভয়ে তাঁর কথাবার্তা সব গণ্ডগোল হয়ে গেছে, তবু বাঁচবার আশায় মুহূর্তের জল্পনায় জ্যামঘ বললেন—ভবিষ্যতে তোমার গর্ভে যে ছেলে হবে, তারই সঙ্গে বিয়ে দেব এই মেয়ের—যস্তে জনিষ্যতে পুত্র স্তস্য ভার্যা ভবিষ্যতি।[৩৫]

শোনা যায়, পরিণত বয়েসেও শৈব্যার একটি ছেলে হল এবং তা হল উপদানবী নামে সেই মেয়ের কপালজোরে। ছেলের নাম বিদর্ভ। ছেলে তার বৌয়ের থেকে বয়সে কম হলেও এ বিয়েতে কোন বাধা হয়নি। নতুন এক রাজ্য বিদর্ভ (বেরার) যদু জ্যামঘের দখলে এল, তারই প্রতীকে এই গল্পের অবতারণা কিনা জানি না, তবে ঐতিহাসিক দিক থেকে এর মূল্য অপরিসীম। বিদর্ভ মানে আরও একটু দক্ষিণে, অর্থাৎ বিন্ধ্য-নর্মদা পেরিয়ে তাপ্তী নদীর ওপার পর্যন্ত যাদব-বংশধরদের দখলে চলে এল। বিদর্ভের রাজধানীর নাম কুণ্ডিনপুর। পরবর্তী সময়ে দেখব—সুন্দরীশ্রেষ্ঠা রুক্মিণী এই কুণ্ডিনপুরের মেয়ে। আমাদের ধারণা—যদুবীর জ্যামঘ পূর্বেই বিদর্ভ দখল করেছিলেন এবং এই নতুন রাজ্যের নামেই তাঁর ছেলের নাম বিদর্ভ। আসল কথা, বিদর্ভ তো কোন নতুন রাজ্য নয়, কারণ আমরা পুরাণগুলির অনেক পূর্বে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বিদর্ভের নাম শুনেছি ; জৈমিনীয় ব্রাহ্মণের কাছে জেনেছি যে, বিদর্ভে নাকি 'মাচল' নামে একধরনের শিকারী কুকুর পাওয়া যেত, যে কুকুর বাঘ পর্যন্ত মেরে ফেলতে পারত—বিদর্ভেষু মাচলাঃ সারমেয়াঃ অপীহ শার্দূলান্‌ মারয়ন্তি।[৩৬] এও সেই বিদর্ভ। রাজা এটি দখল করেছেন এবং আপন বিজয়ের স্মারক হিসেবে ছেলের নাম রেখেছেন বিদর্ভ। বিদর্ভের দুই ছেলের ছেলে, ক্রথ-কৌশিক (কৈশিক)। এই দ্বিতীয় পুত্র কৌশিকের ছেলে চেদি থেকেই চেদি দেশের সৃষ্টি। এই চেদি কিন্তু আর কিছুই নয়, সেই যে রাজ্যজয়ের প্রথম কল্পে জ্যামঘ শুক্তিমতী কিংবা কেন নদীর ধারে আপন বসত গেড়েছিলেন, চেদি কিন্তু সেই মূল জায়গাটা। আসলে জ্যামঘের রাজ্য এখন অনেক বড় হয়ে গেছে, ফলে তাঁর মূল বাসস্থানটির শাসনভার বর্তাল তাঁর দ্বিতীয় নাতি চিদি কিংবা চেদির ওপর। চেদির ঐতিহাসিক মূল্য এখন বোঝা যাবে না, তা বোঝা যাবে ভারতযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে শিশুপাল যখন চেদিরাজ হিসেবে বিখ্যাত হবেন এবং তাঁর নিজের গাঁয়ের মেয়ে কুণ্ডিনপুরের লক্ষ্মীমতী রুক্মিণীকে নিয়ে যখন অন্যান্য যাদবদের সঙ্গে তাঁর

লড়াই লাগবে। যাদবদের বিষয়ে একটা কথা আপাতত বলেই আমরা অন্য প্রসঙ্গে যাব। লক্ষণীয় বিষয় হল, পঞ্জাব থেকে আরম্ভ করে সরস্বতী-দৃষদ্বতীর মধ্যভূমি আর্যাবর্তের মূল সীমারেখা যদি পৌরবদের ছত্রছায়ায় হস্তিনাপুর অর্থাৎ দিল্লির কাছাকাছি পৌঁছে গিয়ে থাকে, তাহলেও সেটা কোনমতেই উত্তর ভারতের সীমানা পেরোয়নি অর্থাৎ কোনমতেই পৌরবেরা গঙ্গা-যমুনার ওপারে এসে দক্ষিণের দিকে যেতে পারেননি। বরঞ্চ দক্ষিণ দিকে একছত্র আধিপত্য ছিল যাদবদের। আরও একটা দেশের লোকেদের কথা আমাদের বলতে হবে যাঁরা যাদবদের সমসাময়িক অথচ তাঁদের সমানে সমানে বেড়ে উঠেছিলেন। এটি হল মৎস্যদেশ।

এখনকার 'পিংক সিটি' বা জয়পুর দেখে যাঁরা বাহা বাহা করেন, তাঁরা জানবেন এই জয়পুর হল মৎস্যদেশের রাজধানী বিরাট, মহাভারতের বিরাট। অর্থাৎ পাণ্ডবেরা দিল্লি থেকে গিয়ে জয়পুরে লুকিয়ে ছিলেন, দুর্যোধনেরা শত চেষ্টাতেও তাঁদের ধরতে পারলেন না। এমন একটা জায়গা, যা এখনও যেমন সুন্দর, তখনও তেমনি। নইলে দেখুন মহাভারতের বিরাট-রাজার নামই আমরা জানি না, রাজধানীর নামেই তাঁর নাম—বিরাট। তবে হ্যাঁ, তাই বলে দেশটা তো আর তত ছোট নয়, মৎস্যদেশের মধ্যে ছিল আলোয়ারের খানিকটা এবং ভরতপুরেরও খানিকটা, যে ভরতপুরের খানিকটা বোধহয় যাদবদের ভাগেও পড়েছিল। আর জয়পুর তো আছেই একেবারে রাজস্থানের কেন্দ্রবিন্দুতে। কৌরবদের রাজত্ব হস্তিনাপুরের দিক থেকে এটি দক্ষিণে আর যাদবনগরী মথুরার দিক থেকে মৎস্যদেশ পশ্চিমে। দক্ষিণে এটি চম্বল পর্যন্ত নেমে গেছে, আর পশ্চিমে এর সীমানা সরস্বতী পর্যন্ত। এই হল মৎস্যদেশের ঠিকানা। আমরা ভারতবর্ষের একেবারে পশ্চিম সীমান্তের কথাটা মোটামুটি বলেছি, বলেছি দক্ষিণের কথাও, উত্তরের কথা তো বটেই। কিন্তু পূর্বের কথা মোটেই বলিনি। এবারে সেটা বলতেই হবে।

প্রথমেই মনে রাখবেন বাংলা-বিহার-ওড়িশার অবস্থা এখন যেমন খারাপ, তখন ততটা ছিল না। মজাটা হল, তখনও তাদের খারাপ মনে করা হত যথেষ্ট, কিন্তু খারাপ বলে তাদের দূরে রাখার উপায় ছিল না। খারাপ কতটা মনে করা হত, তার প্রমাণ এই দেশগুলির জন্মের উপাখ্যানেই। এই যে একটু আগেই বিদর্ভের জন্ম দিলেন পুরাণকারেরা কিংবা চেদিদেশের জন্ম দিলেন, কই সেখানে তো কোন মালিন্যের স্পর্শমাত্র নেই। কৃষ্ণের জন্মস্থান তো মথুরা নয়, পণ্ডিতেরা আরও সৌন্দর্য-নিষেক করে বলেন 'মধুরা'—মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম—মধুরাপতির সকলি মধুর। কিন্তু কই এমনটি তো বাংলা বিহার ওড়িশা কিংবা আসামের ভাগ্যে জোটেনি। আমরা বাংলা কিংবা বিহারী ভাষায় নাকি এমন কিচ কিচ করেছি যা উত্তর ভারতীয় প্রভুদের কাছে পাখির ভাষার মত শুনিয়েছে। আসলে পৌরাণিকেরা সবাই উত্তর ভারতীয় এবং দক্ষিণ ভারতীয়দের সঙ্গে তাঁদের মাখামাখি বেড়েছে রাজনীতির তাগিদে। কিন্তু পূর্বদেশীয়দের কাছে উত্তর ভারতীয়দের সে দায় নেই। কাজেই আমাদের অর্থাৎ আমাদের দেশগুলির জন্ম হয়েছে বিকৃতকাম এক অন্ধ ঋষির থেকে। তবু ভাল—ঋষির নামটি ঋগ্‌বেদে পাওয়া যায় এবং সে ঋষির একটা প্রতিবাদী মন

ছিল, যা এখনও বাংলা দেশের বৈশিষ্ট্য।

ভণিতার কোন প্রয়োজন নেই। সকলেরই নিশ্চয় সেই উশিজপত্নী মমতার কথা মনে আছে, যে মমতা দেওর বৃহস্পতিকে ধর্ষণে বাধা দিতে গিয়ে বিফল হন। মনে আছে নিশ্চয়ই যে, মমতার গর্ভস্থ সন্তান গর্ভে থেকে বৃহস্পতির ধর্ষণ এবং বীর্যপতনের বাদ সেধেছিল প্রতিবাদ করে এবং ফলত তাঁকে অন্ধ হয়ে জন্ম নিতে হয়েছিল। তাঁর নামও হয়েছিল দীর্ঘতমা। দীর্ঘতমা জন্মের পূর্বেই পিতা ভিন্ন পর পুরুষের ধর্ষণ উপলব্ধি করেছিলেন বলেই কিনা জানি না, কিন্তু জন্ম থেকে তিনি বিকৃতকাম। পৌরাণিকেরা বলেছেন যে, ছোটবেলা থেকেই মৈথুনের ব্যাপারে দীর্ঘতমার কোন পাত্রাপাত্র জ্ঞান ছিল না। মৈথুন বলতে তিনি বুঝতেন ষাঁড় আর গরুর সম্পর্ক—অনাবৃত গোধর্ম। গোধর্ম প্রয়োগ করার জন্য তিনি প্রথমে বেছে নেন তাঁর দাদার বৌ গৌতমীকে। সময় অসময়ের জ্ঞান নেই, পাত্রাপাত্র জ্ঞান নেই হঠাৎ করে অন্ধ দেওরকে জড়িয়ে ধরতে দেখে ভাই-বৌ তো প্রথমেই তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলেন। কিন্তু দীর্ঘতমার ষাঁড়ের অভ্যাস যাবে কোথায়? তিনি ষণ্ডবৎ আবার নতুনতর উত্তেজনায় হাজির হলেন ভাই-বৌয়ের সামনে। ভাই বৌ এবার বললেন—পেয়েছ কি তুমি, এখনও ষাঁড়ের মত দাঁড়িয়ে আছ যে—অনড়্বানিব বর্তসে। কার সঙ্গে কি ব্যবহার করতে হবে জান না—গম্যাগম্যং ন জানীষে, শুধু ষাঁড়ের বুদ্ধিতে মেয়ের মত ভাইবৌকে খারাপভাবে চাইছ—গোধর্মাৎ প্রার্থয়ণ্ সুতাম্।

গৌতমপত্নীর একটাই সুবিধে ছিল—দীর্ঘতমা চোখে দেখতে পেতেন না। তিনি তাই জোর করে তাকে ধরে বেঁধে একটা বড় কাঠের ওপর শুইয়ে ভাসিয়ে দিলেন জলে। পণ্ডিতদের ধারণা এই ধর্ষণ এবং প্রতিহিংসার ঘটনাটা ঘটেছে বৈশালী নগরীতে, পাটলিপুত্র থেকে যে নগরী আরও খানিকটা উত্তর-পশ্চিমে। এই বৈশালীতেই ছিল বৃহস্পতি, ভরদ্বাজ, সংবর্ত, দীর্ঘতমা—এই সব অঙ্গীরস বামুনদের স্থায়ী ঠিকানা। এই বৈশালী থেকে দীর্ঘতমাকে গঙ্গায় ফেলে দেওয়াটা তাই কোন আশ্চর্য ব্যাপার নয়। পারজিটার সাহেবের ভাষায়— **Hence he was expelled and set adrift in the Ganges. He was carried down stream to the Eastern Anava kingdom and was welcomed by King Bali. This incident finds support in the Rigveda (1.58. 3,5) where he speaks of having been delivered from bodily hurt and from danger in the rivers: and it is not inprobable, because these Angirasa rishis were living, as mentioned above, in the kingdom of Vaisali, so that he might easily have been put on a raft in the Ganges there and have drifted some seventy miles down to the Monghyr and Bhagalpur country which was the Anava realm.**[৩৭]

পারজিটার সাহেব যাকে 'আনব রেল্‌ম্' বলছেন, সে কথাটার একটু ব্যাখ্যা দরকার। আসলে অনু থেকে আনব বা আনবিক ঠিক যেমন পরমাণু থেকে

পারমাণব বা পারমাণবিক। এই অনুর কথা আপনাদের মনে থাকা উচিত। এ অনু হলেন সেই অনু, যিনি যযাতি রাজার ঔরসে শর্মিষ্ঠার গর্ভে জন্মেছিলেন—অর্থাৎ যদু, তুর্বসু, কিংবা পুরুর ভাই। পৌরাণিকদের মতে তিনি পিতার অভিশাপ লাভ করেছিলেন এবং মূল ভূখণ্ড থেকেও চ্যুত হয়েছিলেন। বাস্তুচ্যুত অনুর বংশধরেরা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যান এবং এই ভাগ হয় অনু থেকে সপ্তম পুরুষে মহামনসের দুই ছেলে উশীনর এবং তিতিক্ষুর আমলে। উশীনর তাঁর বংশধরদের নিয়ে পঞ্জাবের পূর্ব সীমান্তে চলে যান এবং তিনি এতই বড় মাপের রাজা ছিলেন যে, একসময় তাঁর ছেলে বিখ্যাত শিবি রাজা একমাত্র উত্তর পশ্চিম সীমান্ত ছাড়া গোটা পঞ্জাবটাই প্রায় দখল করে নেন। মহাভারতে যে মদ্ররাজ শল্যের কথা পড়ি কিংবা রামায়ণে যে কেকয় দেশের মেয়ে কৈকেয়ীর কথা শুনি—তাঁরা সব এই অনুর বংশে শিবি রাজার প্রতিষ্ঠা-করা রাজ্যের ছেলে-মেয়ে। এই শিবি রাজা নিজের জাতভাই দ্রুহ্যুবংশীয়দের সঙ্গে লড়াই করতেও ছাড়েনেনি, ফলে দ্রুহ্যুরা আরও পশ্চিমে গান্ধারে চলে যান ; এই গান্ধারের ছেলে হিসেবেই আমরা পরে শকুনিকে পাব। উশীনরের ভাই তিতিক্ষু, তাঁর সহ্যশক্তি বেশি বলেই তিনি তিতিক্ষু কিনা জানি না, সেই তিতিক্ষু চলে এলেন আধুনিক বিহারের পূর্বদেশে। আর্যপট্টিতে তাঁর খুব একটা পাত্তা ছিল না এবং তাঁর বংশধরের নাম দেখুন পৌরাণিক রাক্ষসরাজ বলির নামে চিহ্নিত। যাই হোক এই বলি দীর্ঘতমাকে নদী থেকে টেনে তুলে নিয়ে এলেন রাজবাড়িতে।

পুরাণগুলি যতই বলুক যে, এই বলি প্রহ্লাদের নাতি, আপনারা বিশ্বাস করবেন না, কারণ এ বলি সে বলি নন। যাই হোক, রাজ বাড়িতে এনে বলি দীর্ঘতমাকে একটি বিশেষ অনুরোধ করেন। রাজার পুত্র ছিল না, অতএব পুত্র পাবার জন্য রাজা দীর্ঘতমাকে আহ্বান জানালেন নিয়োগপ্রথায় তাঁর স্ত্রীর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করার জন্য। আমাদের ধারণা—দীর্ঘতমাকে অনুরোধ করার কোন প্রয়োজন ছিল না, দু-এক দিন রাজবাড়িতে থাকলে আপনিই তিনি গোধর্মবশে রাজরানীর কাছে উপস্থিত হতেন। যাই হোক, দীর্ঘতমার প্রতি নিযুক্তা হয়েও রাজরানী সুদেষ্ণা কিন্তু তাঁকে অন্ধ আর বুড়ো জেনে কাছে গেলেন না, পাঠিয়ে দিলেন নিজের শূদ্রা পরিচারিকাকে। গোধর্মী ঋষির কাছে শূদ্রা, রাজরানী সব সমান। তিনি শূদ্রার গর্ভে অনেকগুলি পুত্রেরর জন্ম দিলেন। মজা হল, তখনকার দিনে তো আর অত জাত মেনে ছেলেপিলে হত না, অতএব এরা প্রত্যেকেই ব্রহ্মবাদী, ধর্মজ্ঞ ঋষি বলে পরিচিত হলেন। আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কেননা জেলেনীর গর্ভে জন্মেও পরাশরের পুত্র বেদব্যাস যেমন ঋষি, শূদ্রার গর্ভে জন্মেও দীর্ঘতমার ছেলে কাক্ষীবান তেমনই ঋষি। আবার এই পৌরব রাজবংশ, ইক্ষ্বাকু রাজবংশ এই সব মার্কামারা ক্ষত্রিয় রাজবংশে জন্মেও তাঁদের বংশধরেরা দলে দলে ব্রাহ্মণ হয়ে গেছেন, আর পৌরাণিকেরা তাঁদের নতুন বিশেষণ দিয়েছেন—ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ। শৌনক কি গার্গ্য, সাংকৃত্য কি মৌদগল্য—এই ধরনের ক্ষত্রোপেতব্রাহ্মণ। এই ধরনের বর্ণমাহাত্ম্য থেকে দীর্ঘতমার শূদ্রা-সম্ভব ছেলেদের বরং জাত অনেক উঁচু। কিন্তু এঁদের জাত যাই হোক, রাজা বলি এই ছেলেগুলোকে দেখে ভাবলেন—ওগুলি বোধ হয় তাঁরই ছেলে। মনি

দীর্ঘতমাকে তিনি বললেন কি—কি ? এগুলো আমারই তো ? মুনি বললেন—মোটেই নয় । তোমার কথামত নিয়োগটা মেনেছি বটে, তবে সেটা ছিল শূদ্রা দাসী, তোমার বৌ আমার কাছে আসেনি, অন্ধ বলে, বুড়ো বলে তার ঘেন্না হয়েছে, তাই সে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল তার শূদ্রা পরিচারিকাকে ।

বলি রাজা এত সব কিছুই জানতেন না । পত্নী সুদেষ্ণাকে তিনি ভীষণ ভর্ৎসনা করলেন এবং আবার কুসুমে রতনে চন্দনে তাঁকে সাজিয়ে পাঠিয়ে দিলেন মুনির কাছে—পুনশ্চৈনাম্ অলংকৃত্য ঋষয়ে প্রত্যপাদয়ৎ । ঋষি এবার নিয়োগপ্রথার নিয়ম মত নিজের গায়ে আচ্ছা করে দই-লবণ এবং মধু মেখে নিলেন। নিয়োগপ্রথার এই নিয়ম । যাতে সঙ্গমের সময় অপরিচিতার কোন মোহ না হয় নিযুক্ত পুরুষটির প্রতি, সেই জন্যই এই দই, লবণ আর মধু মাখার ব্যবস্থা । মনুসংহিতায় অবশ্য জ্যাবজ্যাবে করে ঘি মাখার ব্যবস্থা আছে । কিন্তু দই-ঘি গায়ে মেখে যতই বিকর্ষণের ব্যবস্থা শাস্ত্রে থাকুক না কেন, মানুষ ইচ্ছে করলে তার মধ্যেও কাম চরিতার্থ করার ব্যবস্থা করে নেয় । দীর্ঘতমা বিকৃতকাম গোধর্মী মানুষ । তিনি রানী সুদেষ্ণাকে বললেন—আমার সর্ব অঙ্গ—নীচ থেকে ওপর পর্যন্ত এক ফোঁটা ঘেন্না না করে চাটতে থাক, রানী—লিহ মাম্ অজুগুপ্সন্তী আপাদতলমস্তকম্ । সুদেষ্ণা সব শুনলেন, রাজরানীর সূক্ষ্ম রুচি বিসর্জন দিয়ে অসহায়ের মত তিনি মুনির দেহ চাটতে থাকলেন । চাটতে চাটতে সবই সম্পূর্ণ হল, কিন্তু লজ্জায় ঘেন্নায় রানী বুড়ো দীর্ঘতমার গুহ্য স্থানগুলি আর চাটতে পারলেন না । সত্যিই তো আর কত ? বিকৃতকাম মুনি কিন্তু হেঁই হেঁই করে উঠলেন এবং তাঁর ওই অঙ্গ বাদ দেওয়ার জন্য বানীকে একটা ছোট-খাট অভিশাপও দিয়ে দিলেন । রানী সুদেষ্ণা অনুনয় করে বললেন—আমি যথাসাধ্য আপনার তুষ্টি বিধান করার চেষ্টা করেছি, আপনি প্রসন্ন হোন । মুনি এবার একটু সন্তুষ্ট হলেন, এতক্ষণ রাজরানীর জিহ্বার লেহনে তাঁর খানিকটা কাম-তুষ্টি হয়েছে বইকি । সেই তুষ্টির রেশেই তিনি আশীর্বাদ করলেন—মিষ্টি হাসির সুন্দরী গো—তুমি যেহেতু আমার লিঙ্গটি ছাড়া আর সব অঙ্গই লেহন করেছ—প্রাশিতং যৎ সমগ্রেষু ন সোপস্থং শুচিস্মিতে—অতএব, পাঁচ পাঁচটি চাঁদের মত ছেলে পাবে তুমি । ছেলে হল—এই ছেলেরাই নাকি অঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম এবং বঙ্গ । দেশের নামে ছেলেদের নামের ব্যাপারটা অনেকটা সেই বিদর্ভের মতই । আমাদের ধারণা, এই রাজ্যগুলি আগেই ছিল । বলি রাজা তাঁর পাঁচ ছেলেকে পাঁচ রাজ্যে অভিষিক্ত করেছিলেন মাত্র । কিন্তু ছেলেরা যতই লায়েক হোক না কেন তারা কিন্তু দানব রাজার ছেলে বলেই পরিচিত, ভারতবর্ষের পূর্বখণ্ডে এই কলঙ্ক সার্বজনীন । এদের মধ্যে অঙ্গ দেশের তবু কিছু জাত ছিল, জাত ছিল কলিঙ্গেরও, কিন্তু বঙ্গ, পুণ্ড্র কিংবা সুহ্ম দেশের মানুষজনকে কেউ মানুষ বলে মনে করত না। পরবর্তী সময়ে অঙ্গ রাজ্যটা মগধের অন্তর্ভুক্ত হলেও রামায়ণ-মহাভারতের সময়ে এই রাজ্যের পৃথক অধিষ্ঠান ছিল । পারজিটারের মতে অঙ্গ হল এখনকার মুঙ্গের এবং ভাগলপুর জেলা, উত্তরদিকে বড়ো জোর এর সীমানা কোশী নদী পর্যন্ত এবং পূর্ণিয়া জেলার পশ্চিম দিকটাও ছিল অঙ্গভূমির মধ্যে । কোশী নদীর উপরে বিভাণ্ডক মুনির আশ্রম ছিল, যে আশ্রমে তাঁর ছেলে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে ভুলিয়েছেন অঙ্গরাজ্যের বেশ্যারা । মনে পড়ছে না,

সেই রামায়ণের ঘটনাটা ? দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞের জন্য যে ঋষ্যশৃঙ্গকে আনা হয়েছিল। অঙ্গরাজ্যের রাজা দশরথবন্ধু লোমপাদ যাঁকে বেশ্যা দিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে এসে শান্তার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। রামায়ণের এই ভৌগোলিক সূচনা থেকেই পারজিটারের ধারণা হয়েছে যে, কোশী নদী পর্যন্ত এই রাজ্যের সীমানা। অন্য ঐতিহাসিকেরা অবশ্য বলেন যে, পারজিটারের মুঙ্গের, যা নাকি মহাভারতের আমলের মোদাগিরি এবং কৌশিকী-কচ্ছ এই দুটি জায়গা মহাভারতের অঙ্গরাজ কর্ণের রাজ্যভুক্ত ছিল না, অতএব অঙ্গরাজ্য ছিল মগধ আর রাজমহল পার্বত্য অঞ্চলের মাঝখানে।

অঙ্গরাজ্যের ভৌগোলিক সীমা যাই হোক, মনে রাখতে হবে অঙ্গ, পুণ্ড্র, কলিঙ্গ বঙ্গ-সুহ্মের মানুষেরা মূল আর্যপ্রস্থান পৌরবদের এবং অন্যদিকে যাদবদের সুনজরে ছিলেন না। আমরা মূল জায়গাটায় অর্থাৎ যদি সেই হস্তিনাপুরে আবার ফিরে আসি, তাহলে প্রথমেই স্মরণ করতে হবে যে, পুরু-ভরতবংশের কুলতিলক হস্তী হস্তিনাপুর প্রতিষ্ঠা করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা হস্তিনাপুর থেকে বিদায় নিয়ে যাদবদের রাজ্যে চলে গিয়েছিলাম। আবার যাদবদের ঘরে বিদর্ভ, চেদি এই সব পুত্রনাম বা রাজ্যনাম শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা আবার অন্য প্রসঙ্গে চলে গিয়েছি। এখানে যেটা বলার দরকার, সেটা হল—ভরতবংশের অধস্তনেরা যেরকম এক জায়গায় জমাটভাবে রাজত্ব করছিলেন, যাদবেরা কিন্তু তা করেননি। যাদবদের মধ্যে দেখব, মথুরাতেও তাঁদের রাজত্ব, বিদর্ভতেও তাঁদের রাজত্ব, মধ্যদেশ চেদিরাজ্যেও তাঁদের রাজত্ব। অথচ এক যাদববংশের সঙ্গে আরেকজনের তেমন মিল নেই। ফলে মাঝে মাঝে এঁদের এক এক বংশে প্রচণ্ড মার খেতে হয়েছে এবং এমনও হয়েছে যে, সে মার খেতে হয়েছে আপন জ্ঞাতিগুষ্টি পৌরব-ভরতবংশীয়দের কাছেই। শতপথ ব্রাহ্মণের মত পুরোনোগ্রন্থে দেখছি—মহারাজ ভরত যদুবংশীয় বীর সাত্ত্বতকে প্রচণ্ড মার দিয়েছেন এবং যে সাত্ত্বত অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য তৈরি হচ্ছিলেন, তাঁর যজ্ঞের ঘোড়া পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছেন ভরত। ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী বিনা দ্বিধায় এই কাহিনী মেনে নিয়েছেন (পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অব অ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়া, পৃ ৮০, ১২৫) কিন্তু এখানে একটা বিচার করার বিষয় আছে। পুরুবংশ এবং যদুবংশের রাজ-অনুক্রম বিচার করলে দেখা যাবে মহারাজ ভরতের সময় সাত্ত্বতের জন্মই হতে পারে না। ভরত অনেক আগের মানুষ। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। আমরা আগেই বলেছি যে, কোন বংশে যদি এমন বিখ্যাত মানুষ জন্মান, যাঁর কীর্তি-শ্রুতি দিগন্ত-প্রসারী, তাঁর নামে বংশের অধস্তন এবং উর্ধ্বতন সব পুরুষই চিহ্নিত হন। এর প্রমাণ আছে ভূরি ভূরি। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। বস্তুত ভরতের হাতেই সাত্ত্বতবংশীয়রা (এঁরা অবশ্যই সাত্ত্বতের উর্ধ্বতন পুরুষ) কোন সময় মার খেয়েছিলেন। এটা হতেই পারে, কারণ মথুরায় যাদবদের বসতি ছিল এবং ভরতের রাজ্য ছিল তার পাশেই। সাত্ত্বতের পরবর্তী বংশধরেরা যেহেতু পরে মথুরার অধিপতি ছিলেন, অতএব ভরতের হাতে মার খাওয়াটাও সাত্ত্বতের ওপরে চেপে গেল। মোদ্দা কথা হল—সাত্ত্বতের পরিচয় আমরা দিইনি, এখন দিতে হবে এবং তার চেয়েও বড় কথা হল যাদবদের সঙ্গে ভরতবংশীয়দের যে এককালে বিবাদ-বিসংবাদ ছিল এটা জলের মত পরিষ্কার।

বর্তমান প্রবন্ধের সবচেয়ে 'ক্রুসিয়াল' জায়গায় এখন আমরা উপস্থিত। দেখুন, যে হস্তীকে আমরা হস্তিনাপুরে দেখেছিলাম সেই হস্তীর তিন ছেলে। তিন ছেলের মধ্যে বড়জনকেই আমাদের দরকার, তাঁর নাম অজমীঢ়। পাঠক! আপনাকে একটু ধৈর্য ধরে অজমীঢ়ের বংশ পরিচয় শুনতে হবে, না শুনলে আপনি ভারতযুদ্ধের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট কিছু বুঝতে পারবেন না। অজমীঢ়ের তিন বৌ—নীলিনী, কেশিনী এবং ধূমিনী। অজমীঢ়ের ঔরসে নীলিনীর গর্ভে যে বংশধারাটা চলল, এই বংশেই চার পুরুষের মধ্যে পাঁচটি দুর্দান্ত ছেলে জন্মাল—মুদ্‌গল, সৃঞ্জয়, বৃহদিষু, যবীনর এবং কৃমিলাশ্ব। এই পাঁচজনই রাজ্যরক্ষার ব্যাপারে উপযুক্ত এবং যথেষ্ট সমর্থ বলে, তাঁদের নাম হয় পাঞ্চাল। 'অলং' মানে সমর্থ, পাঁচটা রাজ্যের সুরক্ষায় সমর্থ বলেই এঁদের নাম পঞ্চাল—অলং সংরক্ষণে তেষাং পঞ্চালা ইতি বিশ্রুতাঃ।[৩৮] এই পঞ্চালের রাজ্যই হল পাঞ্চাল, আধুনিক নামে যে রাজ্যগুলিকে উত্তরপ্রদেশের ম্যাপে পাওয়া যাবে উত্তর-পশ্চিম কোণে, অর্থাৎ এখনকার বেরিলি (রায়বেরিলি নয় কিন্তু), বুদাউন, ফরুক্কাবাদ, রোহিলখণ্ডের লাগোয়া জেলাগুলি এবং গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী খানিকটা অংশ। হস্তিনাপুরের হস্তীর বংশধারা অজমীঢ়ের চার পুরুষ পরেই উত্তরপ্রদেশের এক বড় অঞ্চল পাঞ্চাল দখল করে নিল। পাঠক! আবার মনে রাখবেন অজমীঢ়ের ঔরসে নীলিনীর গর্ভসূত্রে পাঞ্চালরাজ্যের প্রতিষ্ঠা। আর এই অজমীঢ়ের তৃতীয়া পত্নী ধূমিনীর গর্ভে জন্ম নিলেন ঋক্ষ—যিনি প্রসিদ্ধ কৌরববংশের প্রতিষ্ঠাতা কুরুর ঠাকুরদাদা। অবশ্য কুরুর বাবাও খুব কম বিখ্যাত লোক নন, তাঁর নাম সংবরণ—ঋক্ষের ছেলে, অজমীঢ়ের নাতি। সেই সংবরণ, যিনি ঈপ্সিতা রমণীর জন্য দারুণ তপস্যা করেছিলেন। কল্পনা বিলাসী কবিদের তো আর ইতিহাসের দায় নেই! নইলে সংবরণের বিশ পুরুষের বড় বৃদ্ধা মাতামহী দেবযানী তাঁর প্রেমিক কচের মন পাওয়ার জন্য তাঁর কাছে খোকার খোকা সংবরণের উদাহরণ দিয়েছেন—

পত্নীবর মাগি
করেননি সম্বরণ তপতীর আশে
প্রখর সূর্যের পানে তাকায়ে আকাশে
অনাহারে কঠোর সাধনা কত?

সংবরণের কথা আমাদের একটু বলতেই হবে কারণ তাঁরই বংশে পৌরব-ভরতবংশের মূল ধারাটি চলছিল। একটি বিশেষ কারণে সংবরণের কাহিনী আমাদের কাছে প্রয়োজনীয়। মহাভারতের পাণ্ডবেরা যখন দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে যাবার জন্য প্রায় তৈরি হয়েছেন, তখন এক গন্ধর্বের সঙ্গে অর্জুনের খটাখটি বাধে। অর্জুন জেতেন এবং গন্ধর্ব তাঁকে 'তাপত্য' বলে সম্বোধন করেন। 'তাপত্য' মানে তপতীর বংশধর। অর্জুন বললেন—'তাপত্য' কেন, কৌন্তেয় বললেই বেশ হত—কৌন্তেয় হি বয়ং সাধো। তখন গন্ধর্ব অর্জুনদের সংবরণ এবং তপতীর প্রেমকাহিনী শোনালেন। কোন এক হরিণের পেছন পেছন ধাওয়া করতে গিয়ে সংবরণের ঘোড়াটি মারা যায়। নির্জন বনে নিরুপায় রাজা

তপতী, সূর্যকন্যা তপতীকে দেখে মুগ্ধ হন। রাজাও একা, তপতীও একা। রাজা ভাবলেন—যেন সোনার প্রতিমা বন আলো করে দাঁড়িয়ে আছে। রাজার চক্ষু সার্থক হল—যেন তিন ভুবন মন্থন করে এমন রূপের সৃষ্টি করেছেন বিধাতা, যেন সূর্যের কিরণ-জাল ছিঁড়ে পড়েছে ভুঁয়ে। প্রথমে তো রাজার মন, চোখ এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন আপন রূপে স্তম্ভিত করে ফেললেন তপতী, তারপর ক্রমে রাজার মনের বিকার আরম্ভ হল—কামবাণেন পীড়িতঃ। সংবরণ বললেন কে তুমি সুন্দরী! তোমার মত এমন সুন্দর চেহারা আমার জীবনে আমি দেখিনি, তুমি কে, কার মেয়ে, এমন একা এই বনে কি করে এলে?

রমণী উত্তর দিল না, উল্টে মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের মত ঘন বনে হারিয়ে গেল। শত্রুপাতন রাজা অজ্ঞান হয়ে নিজেই পড়ে গেলেন মাটিতে। তপতীরও বোধহয় মনে কিছু হয়েছিল, অন্তত মায়া তো বটেই। অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতেই 'পীনায়তশ্রোণী' রমণী এসে রাজাকে মধুর স্বরে ডেকে তুলল। রাজা আশ্বস্ত হলেন, মূর্ছা ভেঙে কামপীড়িত রাজার চোখে যা পড়ল, তা হল—দদর্শ বিপুলশ্রোণীং তামেবাভিমুখে স্থিতাম্। দুজনে দেখা হল বটে, তবে সমস্যা মিটল না। তাই তপস্যা, সূর্যপূজা, দেবতার তুষ্টি, ঋষি বশিষ্ঠের মধ্যস্থতা এবং শেষে বিয়ে এবং কুমারসম্ভব—মহারাজ কুরুর জন্ম। অর্জুন বুঝলেন তিনি 'তাপত্য' কেন। কিন্তু অর্জুনের বোঝার থেকেও, যেটা আমাদের বেশি বোঝা প্রয়োজন, তা হল অজমীঢ়ের এক স্ত্রীর বংশধারায় যেমন পাঞ্চালদের জন্ম, তেমনি অন্যতরার বংশধারায় কুরু কিংবা কৌরবদের জন্ম অর্থাৎ এক অর্থে পাঞ্চাল এবং কৌরবেরা কিন্তু ভাই ভাই। কিন্তু ভাই ভাই হলে হবে কি, এই সংবরণেরই বৈমাত্রেয় ভাই পাঞ্চালেরা তাঁর জীবৎকালেই তাঁকে হস্তিনাপুর থেকে তাড়িয়ে ছেড়েছিল। মহাভারতের আদিতেই এ কথা জানিয়ে বলা হয়েছে—সংবরণের সময়ে হস্তিনাপুরের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। অনাবৃষ্টি, মড়ক তো লেগেই ছিল, তার ওপরে জুটেছিল পাঞ্চালদের ভয়। আসলে মহাভারতের তপতী-সংবরণের সংবাদ থেকে জানতে পারি যে রাজার 'হনিমুনের' সময়টা বড়ো বেশি হয়ে গিয়েছিল। অমন 'বিপুলশ্রোণী' 'চারুসবার্নবদ্যাঙ্গী' ভার্যা লাভ করে সংবরণ বারো বচ্ছর সেই বনে 'হনিমুন' করে গেলেন, সেই যে বনে তাঁদের প্রথম দেখা হয়েছিল। প্রজাপালক রাজার এত বিলাস কি রাজ্যের সহ্য হয়? ব্যাধি, মারী, অনাবৃষ্টির কথা ছেড়েই দিলাম, এই সুযোগে পাঞ্চালেরা চতুরঙ্গ বাহিনী নিয়ে ভরতবংশের রাজ্য হস্তিনাপুর আক্রমণ করলেন—অভ্যাযাৎ তত্র পাঞ্চাল্যো বিজিত্য তরসা মহীম্। 'তরসা' মানে হঠাৎ করে। এই হঠাৎ আক্রমণের বিপর্যস্ত হয়ে সংবরণকে সপুত্র, সপরিবারে হস্তিনাপুর থেকে পালিয়ে গিয়ে সিন্ধুনদীর গিরিগুহা আশ্রয় করতে হয়েছিল। মহাভারতের ঋষি খবর দিয়ে বলেছেন যে, বহুকাল ধরে সংবরণকে ওই সিন্ধুনদীর ধারে ধারে পার্বত্য অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে, এবং তিনি যখন সপুত্র রাজ্য থেকে তাড়িত হয়েছিলেন তখন নিশ্চয়ই কৌরবদের বংশকর কুরুকেও ছোটবেলাটা কাটাতে হয়েছে ওই অঞ্চলেই। বোঝা যাচ্ছে পাঞ্চালদের শক্তি বাড়ছিল এবং এক সময় তাঁরা পৌরব-ভরত-এবং কুরুবংশীয়দের রাজত্ব দখল করে নিয়েছিলেন। কি করে সংবরণ স্বরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেন, সে আরেক কথা। মহাভারত বলেছে যে,

সংবরণের এই দুরবস্থায় বশিষ্ঠ মুনি তাঁর সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন এবং তাঁরই পৌরোহিত্যে পুনরায় হস্তিনাপুর উদ্ধার করেন। আমাদের মনে হয়—পৌরোহিত্য না বলে মন্ত্রিত্ব বলাই ভাল, কারণ তাঁরই মন্ত্রণায় শক্তিসংগ্রহ করে সংবরণ আবার ফিরে আসেন নিজের জায়গায়।

সহৃদয় পাঠককুল। মনে রাখবেন ভারতযুদ্ধের বীজ বপন শুরু হয় এইখানেই। পাঞ্চালদের সঙ্গে কুরুপিতা সংবরণের যে যুদ্ধ হয়েছিল, এর ফল পুরাঘটিত বর্তমানের মত সুদূরপ্রসারী হয়েছিল ভারত-যুদ্ধ পর্যন্ত এবং অর্জুনকে যে 'তাপত্য' বলে সম্বোধিত হয়ে সংবরণ-তপতীর প্রেমকাহিনী শুনতে হয়েছিল, সেটাও কিন্তু অর্জুনেরা পাঞ্চালে দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে যাবার পূর্বমুহূর্তে। ঐতিহাসিকতার খাতিরে এই সময়ের সংস্থানটা যথেষ্ট জরুরী। আমরা কিন্তু কতগুলি বিচ্ছিন্ন কথা মূল পর্বে যাবার আগেই সেরে নেব। সংবরণের ছেলে কুরু মহারাজ হস্তিনাপুরে রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার পরেই কিন্তু কুরুবংশের অর্থাৎ প্রাচীন পুরু-ভরত-হস্তীবংশের প্রতিপত্তি আবার বেড়ে গেল। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে পাঞ্চাল রাজার সঙ্গে সংবরণের যুদ্ধ হয় তাঁর নাম নাকি সুদাস। আপনাদের মনে আছে তো—যে পাঁচজন পাঞ্চালে রাজা হয়েছিলেন, তাঁদের প্রথম ছেলের নাম মুদ্গল। এই মুদ্গলেরা কিন্তু বেশির ভাগ ব্রাহ্মণ হয়ে যান, যাঁরা মৌদ্গল ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত। কিন্তু ব্রাহ্মণ হলে কি হবে, এরই নাতি কিন্তু মেনকার (আবার সেই মেনকা—স্বর্গবেশ্যা!) সঙ্গে সহবাস করে যমজ পুত্র-কন্যার জন্ম দিলেন। ছেলের নাম দিবোদাস, আর মেয়ের নাম অহল্যা। এই অহল্যার নাতি আবার এক অপ্সরাকে দেখে বীর্যস্খালন করে বসলেন। তাঁর তেজ গিয়ে পড়ল কতগুলি নলখাগড়া জাতীয় ঘাসের ওপর। এই তেজ থেকেই নাকি জন্ম কৃপ এবং কৃপীর। কুরুবংশের শান্তনু রাজা মৃগয়া করতে গিয়ে ঘাসের ওপর দুটি যমজ পুত্র কন্যা দেখে তাদের নাকি কৃপা করে হস্তিনাপুরে নিয়ে আসেন। তাঁর কৃপাতেই এই যমজ দুটি বেঁচে যায় বলেই, তাদের নাম নাকি কৃপ-কৃপী।

আমার মত দুর্বুদ্ধি মানুষের আবার এই কল্পকাহিনী বিশ্বাস হয় না। আমাদের ধারণা—কৃপ-কৃপী ব্রাহ্মণ-হয়ে-যাওয়া বংশ থেকে জন্মালেও তাঁরা আদতে পাঞ্চাল। অহল্যা নাম্নী মেয়ের বংশলতায় জন্মালেও তাঁর যে পাঞ্চাল রাজ্যের কোন অংশের লোভ থাকবে না, তা কি করে বলা যায়? বিশেষত দিবোদাস নামে ছেলের বংশে যার জন্ম সেই সুদাসের সঙ্গেই তো কুরুবংশীয় সংবরণের বিবাদ বেধেছিল। আমাদের ধারণা, কুরুবংশীয় শান্তনু জেনেশুনেই এই যমজ দুটিকে নিজের ঘরে মানুষ করেন এবং কৃপীর সঙ্গে তিনি যাঁর বিয়ে দেন সেই দ্রোণাচার্য ছিলেন আজন্ম পাঞ্চাল-বিরোধী। মহাভারতের যুদ্ধপর্বে দ্রোণাচার্য-কৃপাচার্যেরা যে কুরুবংশের নুন খাওয়ার সুবাদে দুর্যোধনের পক্ষে থেকে গিয়েছিলেন, সেই কথাটা অত সহজে মেনে নেবেন না। অত সস্তায় রাজনীতির চাল সিদ্ধ হয় না। কৃপাচার্য এবং দ্রোণাচার্য যে কুরুপক্ষে আজীবন যুদ্ধ করে গেছেন তার অন্যতম কারণ- এঁদের মধ্যে কৃপাচার্য পাঞ্চালদের ঘরে জন্মেও কোন কারণে রাজ্য থেকে বিসর্জিত হওয়ায় ভয়ংকর রকমের পাঞ্চাল-বিরোধী ছিলেন, আর দ্রোণাচার্য পাঞ্চালী কৃপীকে বিয়ে করে আগে থেকেই পাঞ্চাল দ্রুপদের বিরোধী গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে সারা জীবন কুরুদের

সেবা করে গেছেন, কারণ কুরুরা পাঞ্চালদের জন্ম-শত্রু।

এসব কথা পরে সময় মত আসবে। এখন পাঞ্চাল সুদাসের কথাটা আগে বলে নিই। মুদ্গলের ছোটভাই সৃঞ্জয়, এই সৃঞ্জয়ই আসলে পাঞ্চাল রাজ্যের সবচেয়ে উপযুক্ত রাজা হয়ে গিয়েছিলেন ; কেননা পরে কুরুকুলপতি ধৃতরাষ্ট্রের মুখে বা অন্য কারও মুখে আমরা বার বার সৃঞ্জয় বংশীয়দের গুণপনা শুনেছি। আসলে কুরুর নামে যেমন কৌরবেরা বিখ্যাত হয়েছিল, সাত্বতের নামে যেমনি যাদবেরা, তেমনি সৃঞ্জয়ের নামে গোটা পাঞ্চাল বংশটাই চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল। সুদাসের নাম সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাণগুলিতে নানা তথ্যপ্রমাদ ঘটেছে। একমাত্র বায়ু পুরাণের তথ্য যেহেতু ঋগ্‌বেদে বর্ণিত তথ্যের সঙ্গে মেলে তাই আমরা সেটাই মেনে নেব। আসলে সৃঞ্জয়ের বংশেই দিবোদাসের জন্ম হয়, সেই বংশেই চ্যবন রাজা—এঁকে কোন কোন পুরাণ বলেছে পঞ্চজন, যদিও আসলে হবে পিজবন।[৩৯] এই চ্যবনের ছেলেই সুদাস, বেদ যাকে বলেছে সুদা, আর মনুসংহিতা একেবারে তার বাপের নামসহ হাজির করেছে—সুদা পৈজবনশ্চৈব। এই সুদার সঙ্গেই কুরুপিতা সংবরণের যুদ্ধ হয় এবং তাঁকে হঠে যেতে হয় সিন্ধুনদীর তীরে পার্বত্য অঞ্চলে। পাঞ্চালদের রাজ্য বেড়ে যায় বহুদূর পর্যন্ত।

মহামুনি বশিষ্ঠ যখন দুর্গত সংবরণের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন নাকি ভরতবংশের সবাই একসঙ্গে তাঁকে মন্ত্রিত্বে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল—অর্ঘ্যমভ্যাহরৎ তস্মৈ তে সর্বে ভারতাস্তদা। আমরা বলি—ভরতবংশীয় বলতে তো শুধু সংবরণ একাই সেখানে ছিলেন, আরও আবার কারা ছিলেন ভরতবংশের ? আসলে 'ভারতাঃ' বলতে এখানে ভরতবংশীয়দের বোঝাচ্ছে না, বোঝাচ্ছে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজাদের কথা যাঁরা সিন্ধু নদীর কাছাকাছি ছিলেন। রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির এক জার্নালে বলা হয়েছে যে, পাঞ্চাল সুদার আক্রমণে তৎকালীন ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম দেশীয় রাজারা একজোট হয়েছিলেন।[৪০] পৌরব সংবরণের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন মথুরার যাদবেরা, যযাতির আরেক ছেলে অনুবংশের ধারায় উশীনর শিবিরা, দ্রুহ্যুরা, যারা গান্ধারে রাজত্ব করছিল, মৎস্যদেশের রাজা, এবং তুর্বসুরা, যারা রেওয়া অঞ্চলে ছিল। এই জোট বাঁধার ব্যাপারে বশিষ্ঠবংশীয় ব্রাহ্মণেরা মধ্যস্থতার কাজ করেছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু হস্তিনাপুর আবার সংবরণের হাতে এসেছিল। সংবরণের ছেলে কুরুর আমলে হস্তিনাপুরের বাড়বৃদ্ধি চূড়ান্ত হয়। কুরু রাজা প্রয়াগ পেরিয়ে তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠা করেন কুরুক্ষেত্র এবং কুরুজাঙ্গলনামক দুটি জায়গায়। মহাভারতের ভাষাতে কুরু রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল সরস্বতী নদীর তীরভূমিতে স্থিত-কাম্যক বন থেকে যমুনার কাছাকাছি খাণ্ডবপ্রস্থ পর্যন্ত—এখনকার থানেশ্বর, মিরাট এবং দিল্লির কাছাকাছি অংশ এবং গঙ্গানদীর ওপর দিকে বিস্তীর্ণ দোয়াব অঞ্চল।

কুরুদের এই যে প্রতিপত্তি বাড়ল, এতে সাময়িকভাবে পাঞ্চালদের ক্ষমতা কমে এল। সুদার নাতি সোমকের আমলে দেখতে পাচ্ছি তাঁদের বংশই লুপ্ত হবার জোগাড় হয়েছিল।[৪১] সোমকের একটি মাত্র ছেলে হয়েছিল, তাঁর নাম জন্তু। এঁকে নিয়ে বেশ মজার একটা গল্প আছে মহাভারতে। আসলে সোমকের ছেলে একটা হলে কি হবে, তাঁর বৌ ছিল একশটা। একশ মায়ের এক ছেলে,

সবেধন নীলমণি, তার আদরও সাংঘাতিক। সমস্ত মায়েরা তাকে চোখে হারায়। একদিন হল কি, একটি পিঁপড়ে সেই বাচ্চা ছেলের কোমরে কামড়ে দিল, কচি মাংস বেশ ফুলে উঠল। তখন কে কাকে দেখে, সেই ছেলেও বিষ-পিঁপড়ের কামড়ে যেমনি কেঁদে উঠল, অমনি তাকে ঘিরে একশ মায়ের চিৎকার আরম্ভ হল। সে চিৎকার এমনই যে, অন্তঃপুর ভেদ করে তা রাজসভায় পৌঁছোল। রাজা খবর নিয়ে সব জেনেও বসে থাকতে পারলেন না, তাঁকে সভাভঙ্গ করে অন্তঃপুরে যেতে হল এবং বাবা-বাছা করে ছেলের চিৎকার থামাতে হল, কারণ রানীদের সম্মিলিত চিৎকার থামানোর এই ছিল একমাত্র উপায়। রাজা সোমক শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ভাবলেন—ধুর! এই এক ছেলে হওয়ার মত দুঃখ আর নেই। একশ রানীর প্রাণ যদি একটি মাত্র পুত্রের প্রতি স্নেহাতুর হয়ে ওঠে, তাহলে তার চাইতে করুণ অবস্থা আর কি হতে পারে—আসাং প্রাণাঃ সমায়ত্তা মম চাত্রৈকপুত্রকে। রাজা শেষে পুরোহিতদের সঙ্গে আলোচনা করে সেই এক পুত্রের মাংস অগ্নিতে উৎসর্গ করে যজ্ঞ করলেন। সোমকের একশ রানীর গর্ভে একশটি ছেলে হল। উৎসন্নকুল পাঞ্চালদের মধ্যে একশ ছেলে হওয়ার এতই মাহাত্ম্য ছিল যে, সোমকের নামেই পাঞ্চাল বংশ চালু হয়ে গেল। দ্রৌপদীর ভাই ধৃষ্টদ্যুম্নকেই মহাভারতে সোমক বংশের প্রবর পুরুষ—ধৃষ্টদ্যুম্নঃ সোমকানাং প্রবর্হঃ—বলে উল্লেখ করা হয়েছে, মহারাজ দ্রুপদকে বলা হয়েছে—সৌমকি র্যজ্ঞসেনঃ, অর্থাৎ সোমকদের ছেলে যজ্ঞ সেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রুপদের কথা আগেই এসে গেল, অবশ্য এঁদের কথা আর দূরেও কিছু নয়। কারণ, যজ্ঞের ফলে এবার যে সোমকের একশ রানীর কোলে একশ ছেলে জন্মাল, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড়টির নাম পৃষত। ইনিই পরবর্তী পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের পিতা।

একটা কথা নিশ্চয়ই এতক্ষণে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, ভরতবংশীয় অজমীঢ়ের মাধ্যমে যে বংশরচনা হয়েছিল, তাদের এক ভাগ মূল ভূখণ্ড হস্তিনাপুর অঞ্চলে রাজত্ব করতে থাকল, আরেক ভাগ, তাঁরাও ভরতবংশীয়ই বটে, রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করল পাঞ্চালে। লক্ষণীয়, মহাভারতে পাঞ্চাল রাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকেও 'ভরতর্ষভ' বলা হয়েছে। মজা হল, কৌরব-ভারতীয়দের সঙ্গে পাঞ্চাল-ভারতীয়দের কিন্তু শত্রুতা লেগেই রইল। ঠিক এইরকম একটা জায়গা থেকে আমাদের আরেকবার হস্তিনাপুরে ফিরে যেতে হবে।

ভরতবংশীয় কুরু রাজা তো নিজের নামে কুরুক্ষেত্র আর কুরুজাঙ্গল প্রতিষ্ঠা করে নিজের কীর্তি স্থাপন করলেন। এদিকে তাঁর যে চারটি পুত্র হল, তার মধ্যে দুজন দুই বংশের প্রবর্তক। কিন্তু তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের বংশটাই বাস্তুচ্যুত হয়ে চলে গেল অন্য জায়গায় এবং কনিষ্ঠপুত্রটির বংশে চার পাঁচ পুরুষ পরেই জন্মালেন মহারাজ শান্তনু, যিনি মূল পুরু-ভরত এবং কুরুবংশের ধারাটি হস্তিনাপুরে ধারণ করে রইলেন। কুরুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বাস্তুচ্যুত হলেন—এমন বলাটা ভুল, বলা উচিত তাঁর বংশের চতুর্থ পুরুষ উপরিচর বসু যাদবদের রাজ্য চেদি দখল করে ফেললেন—সেই চেদি যেখানে যাদব জ্যামঘের বংশধর বিদর্ভের ছেলে গিয়ে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। এদিকে উত্তরে পাঞ্চালদের সঙ্গে, ওদিকে দক্ষিণে যাদবদের সঙ্গেও কুরুদের শত্রুতা আরম্ভ হল। এটা একটা সাংঘাতিক ঘটনা।

কুরুবংশের চতুর্থ এক পুরুষ গিয়ে যে যাদবদের রাজ্য দখল করল, এর পর থেকেই ভারতবর্ষের ইতিহাস রীতিমত লোমহর্ষক হয়ে উঠেছে। উপরিচর বসুর অনেকগুলি ছেলে। তার মধ্যে আছেন বৃহদ্রথ, যাঁর থেকে কয়েক পুরুষ পরেই সেই বিরাট মানুষটার জন্ম হয়েছে, যাঁর নাম জরাসন্ধ। বস্তুত বৃহদ্রথ নিজেই খুব শক্তিশালী রাজা ছিলেন। মূল ভূখণ্ডের আশা ছেড়ে দিয়ে তাঁর বাবা যেমন চেদি দখল করেছিলেন, তেমনি তিনিও মগধ অধিকার করেন। প্রসিদ্ধ বার্হদ্রথ বংশ সেখানেই চলতে থাকে। বৃহদ্রথেরই আরেক ছেলে কুশ বা কুশাম্ব, যার থেকে কৌশাম্বী নগরীর সৃষ্টি। তাঁরই আরেক ছেলে যদু, তিনি করূষ দেশের অধিপতি। করূষ জায়গাটা হল বিহারের শোন নদীর উত্তর পারের উপত্যকা অঞ্চল।

অনেক পৌরাণিকের মতে এই বৃহদ্রথের বাবা উপরিচর বসু স্বয়ংই মগধ দখল করেছিলেন এবং রামায়ণে তাঁর নামেই মগধের নাম বসুমতী। বৃহদ্রথের বংশে জরাসন্ধ রাজা হওয়ার পর থেকেই ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে পূর্ব ভারতের রমরমা বেড়ে গেল। জরাসন্ধ নিজে একবারের তরেও তাঁর পূর্বজ কৌরবদের মূল ভূখণ্ড দখলের চেষ্টা করেননি, যদিও কুরুর কনিষ্ঠ পুত্র থেকে যে বংশধারা হস্তিনাপুরে রাজত্ব করছিলেন, তাঁরা কেউই তেমন উল্লেখযোগ্য ছিলেন না। এমনকি কুলপতি ভীষ্মের পিতা শান্তনু পর্যন্ত সেই দরের রাজা ছিলেন না, যাতে করে জরাসন্ধের পক্ষে তাঁর রাজ্য দখল করে নেওয়ার কোন অসুবিধে হত। কিন্তু জরাসন্ধ সেদিকে যাননি। কারণ এক অর্থে তিনিও যে কৌরব। তিনি বরং মগধকেও এমন এক শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করেছিলেন যাতে সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। জরাসন্ধের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন যাদবেরা, যাদের আমরা কিছুক্ষণ আগেই সাত্বতবংশ পর্যন্ত ঠেকিয়ে রেখেছি। এবারে সাত্বতের বংশ বিভাগ করতেই হবে।

ভরতবংশে অজমীঢ়ের পর থেকে যেমন কুরু এবং পাঞ্চালেরা ভাগ হয়ে গেল, কুরুর পরে যেমন কৌরবেরা এবং বৃহদ্রথেরা ভাগ হয়ে গেল, অনুরূপ ঘটনা যাদব সাত্বতের বংশেও ঘটেছে। সাত্বতের চার ছেলে এবং চার ছেলেই এমন গুণের ছেলে যে, তাঁরা প্রত্যেকেই এক একটা বিরাট বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এঁদের মধ্যে আবার অন্ধক এবং বৃষ্ণি এমন বিখ্যাত যে, তাঁদের থেকেও পৃথক পৃথক বিশাল বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। বেশি কথা বললে গুলিয়ে যাবে। শুধু এইটুকু জানুন যে, অন্ধকের বড় ছেলের নাম কুকুর এবং এই বংশেই কয়েক পুরুষ পরে মহারাজ উগ্রসেন এবং তাঁর ছেলে কংসের জন্ম। উগ্রসেনের দাদার নাম দেবক এবং তাঁর মেয়ে দেবকী কংসের জ্যাঠতুতো বোন, কৃষ্ণের মা। অন্যদিকে অন্ধকের আরেক ছেলের বংশে কৃতবর্মার মত বীরের জন্ম, যিনি ভারতযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত টিকে ছিলেন। সাত্বতের আরেক ছেলে বৃষ্ণির বংশও কম উর্বর নয়। তাঁর আবার দুই বউ—এক বউ গান্ধারের মেয়ে, আরেক বউ মদ্র দেশের। গান্ধারীর গর্ভজাত বড় ছেলের ধারাতেই কৃষ্ণপ্রেয়সী সত্যভামার জন্ম, অন্যদিকে মাদ্রীর ধারায় দ্বিতীয় ছেলে দেবমীঢুষের দু পুরুষ পরেই কৃষ্ণ এবং বলরাম। মাদ্রীর প্রথম ছেলের ধারায় অক্রূর এবং তৃতীয় ছেলের ধারায় সাত্যকি—এঁরা সকলেই ভাইবোন।

সাত্বতবংশের অধস্তন পুরুষেরা অনেকগুলি ভাগে ভাগ হয়ে যাওয়ায় এঁরা কে

কোথায় রাজত্ব করছিলেন বলা খুব কঠিন। মথুরায় শৌরসেনী যাদবেরা ছিলেন, একথা মেগাস্থিনিস লিখেছেন, কিন্তু শূর তো হলেন কৃষ্ণের আপন ঠাকুরদাদা। কংস মারা যাবার পর হয়তো সেখানে কৃষ্ণের আপন গুষ্টির প্রতিপত্তি বাড়ে, কিন্তু তাঁর আগে কংসই ছিলেন মথুরার সর্বেসর্বা এবং তিনি ছিলেন অন্ধক-ভোজের বংশধর, যাকে পুরাণকারেরা গালাগালি দিয়ে বলেছেন—ভোজানাং কুলপাংশনঃ—ভোজবংশের কুলাঙ্গার। আমাদের ধারণা, ভোজবংশীয় কংসও মথুরায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন পরে এবং কখন সে প্রতিষ্ঠা হয়েছে তা পরের কথা। আমরা আপাতত ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মত পুরাতন গ্রন্থের প্রমাণে বলব যে, সাত্বতবংশের বেশির ভাগ পুরুষ রাজ্যের লোভে হানা দিয়েছেন দক্ষিণে। ঐতরেয় বলেছে—দক্ষিণ দেশের রাজাদের সবাই 'ভোজ' বলে ডাকে এবং তাঁদের রাজারা সব সাত্বত নামেও প্রসিদ্ধ—দক্ষিণস্যাং দিশি যে কে চ সাত্বতাং রাজানো ভোজ্যায়ৈব তে'ভিষিচ্যন্তে ভোজেত্যেতান্ অভিষিক্তান্ আচক্ষত।[৪২]

সাত্বত-পুরুষদের এই দক্ষিণমুখী অভিযানের প্রথম এবং প্রধান কারণ অবশ্যই কুরুবংশের উর্ধ্বতন পুরুষ ভরত, যিনি সাত্বতদের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া কেড়ে নিয়েছিলেন এবং সে কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। কিন্তু ভোজ কিংবা সাত্বতেরা যত দক্ষিণেই যান, মথুরার অধিকার তাঁরা ছাড়েননি। উপরন্তু বিদর্ভ, চেদি, আনর্ত, অশ্মক—যেগুলিকে আজকের দিনের মধ্যদেশ, মহীশূর, গুজরাটের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ঢুকিয়ে দেওয়া যেতে পারে—এই সব রাজ্যেও যাদবেরা আস্তে আস্তে ঢুকে পড়েন। কিন্তু যাদবদের মধ্যে জাতীয় সংহতির কোন অভাব ছিল না।

সম্পূর্ণ ঘটনাটা যদি সারাৎসারে বলি তাহলে ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়ায়—সম্পূর্ণ যাদব রাজ্যখণ্ড সাত্বতের চার ছেলের মধ্যে ভাগ হয়ে গেল। ভজমান, দেবাবৃধ, অন্ধক এবং বৃষ্ণি—চারজনেই চার জায়গায় রাজ্য পেলেন। ভজমানের রাজ্য সম্বন্ধে মহাভারত-পুরাণে কিছু পাই না এবং তাঁর বংশধরেরাও এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। দেবাবৃধের সঙ্গে যেহেতু রাজস্থানের পর্ণাশা নীদর (এখনকার বনস) নদীর যোগ খুঁজে বার করা যায়, তাই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, তিনি এবং তাঁর বংশধরেরা মার্তিকাবতে রাজত্ব করতেন। মার্তিকাবত আবু পর্বতের এধার-ওধার। অন্ধক রাজত্ব করতেন আসল জায়গাটিতে—অর্থাৎ মথুরায়। অন্ধকের ছেলে কুকুর এবং ভজমান। একেবারে কংস পর্যন্ত কুকুরের বংশধারা চলেছিল এবং অন্ধক-কুকুরবংশজরাই চিরকাল মথুরার অধিপতি। অন্ধকের অন্য ছেলে ভজমানের বংশধরেরা অন্ধক বলেই প্রসিদ্ধ এবং পাণ্ডবদের সময়ে তাঁর বংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ হলেন কৃতবর্মা। বৃষ্ণি রাজত্ব করতেন গুজরাটের দ্বারকায়, কেননা তাঁর বংশের অক্রূরের নাম এই জায়গার সঙ্গে জড়িত। এই সব জায়গা ছাড়াও আছে বিদর্ভ, অবন্তী, দশার্ণ কিংবা মাহিষ্মতী নগরী যেখানে ভোজ-সাত্বতেরা আপন আপন প্রভুত্ব বিস্তার করেছিলেন। অন্ধক, সাত্বত—যত নামই থাকুক, 'ভোজ' শব্দটা সমস্ত যাদবদের প্রায় প্রতিশব্দের মত উপাধি। সেই অর্থে অন্ধকেরাও ভোজ, দেববৃধের বংশজেরাও ভোজ, উগ্রসেন—কংসও ভোজ আবার বিদর্ভদেশের রুক্মিণী-পিতা ভীষ্মক অথবা রুক্মিণীর ভাই রুক্মীও ভোজ। কৌটিল্য, মহাভারত এবং পুরাণগুলিকে বিশ্বাস করলে এ-কথা মানতেই

হবে যে, সাত্বত-ভোজ কিংবা বৃষ্ণিবীরেরা 'কর্পোরেশন' কিংবা 'রিপাবলিক'-এ বিশ্বাস করতেন এবং এইভাবেই তাঁরা সরকার চালাতেন। মনে রাখা দরকার এই সব ছোট ছোট যাদব 'সংঘ'গুলির মধ্যে কায়েমী স্বার্থ বা প্রভুত্বের জন্য রেষারেষি ভালই ছিল। আবার অন্যদিকে বিভিন্ন রাজপরিবারের মধ্যে বিবাহ এবং সময়ে অসময়ে সামাজিক আদান-প্রদানও ছিল। এঁদের অবস্থাটা অনেকটা তুলনা করা যেতে পারে সম্মিলিত ইতালি কিংবা জার্মানীর পূর্বাবস্থার সঙ্গে। এখানে কৃষ্ণের ভূমিকাটা অনেকটা কাভুর কিংবা বিসমার্কের মত। তাঁর বিশেষত্ব হল—তিনি ওই পৃথক পৃথক যাদব সংঘগুলির মধ্যে এক ধরনের জাতীয় সংহতি স্থাপন করতে পেরেছিলেন, অন্তত তাঁর সমসাময়িককালে তো পেরেইছিলেন। কৃষ্ণ এই সংহতি সম্পন্ন করেন কংসপিতা উগ্রসেনকে সামনে রেখে। ঠিক এই ব্যাপারটা যে কৃষ্ণকে দারুণ সুনাম দিয়েছিল এবং জাতীয় রাজনীতিতে কৃষ্ণের পদবী সুস্থির করেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে দুটি জায়গায়। মহাভারতে যেখানে পাশাখেলা চলছে সেখানে মহামতি বিদুর সামগ্রিকভাবে ভোজদের পূর্বতন সমস্যার কথা তুলেছেন। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছেন—মহারাজ! ভোজেদের ঘরের সমস্যা আপনার জানা আছে। আপনার জানা আছে—অন্ধক, যাদব এবং ভোজরা সবাই একযোগে কংসকে ত্যাগ করেছিলেন—অন্ধকাঃ যাদবা ভোজাঃ সমেতাঃ কংসমত্যজন্ (মহাভারত—২. ৬২.৭-৮)। এই যে সমস্ত যাদব কিংবা ভোজ সংঘগুলিকে কংসের বিরুদ্ধে এককাট্টা করে তোলা—এটাই ছিল কৃষ্ণের কাজ। এই কাজটা করার জন্য বর্ষীয়ান উগ্রসেনকে তিনি এমন সুচতুরভাবে ব্যবহার করেছিলেন যে, ইতালির কাভুর কি জার্মানীর বিসমার্ক তাঁকে আভূমি প্রণাম করবেন। এমনকি পরের কাছে বলার সময়েও যেমন উদ্যোগ পর্বেই ধৃতরাষ্ট্রকে কৃষ্ণ বলছেন—উগ্রসেনের ছেলে কংসকে তার বন্ধুজনেরা ত্যাগ করেছিল—পরিত্যক্তঃ স বান্ধবৈঃ। সেই সুযোগে আমি যেমন তাকে শাস্তি বিধান করেছি, তেমনি সেই একই সুযোগে উগ্রসেনকে রাজা বানিয়ে সমস্ত যাদব, বৃষ্ণি, অন্ধকেরা এককাট্টা হয়ে সুখে আছে—সম্ভূয় সুখমেধন্তে (মহাভারত, ৫. ১২৮. ৩৮-৪০)। কাজেই পরবর্তী সময়ে মহামতি কৃষ্ণের বিশেষত্ব হল যে, তিনি এই পৃথক পৃথক যাদব সংঘগুলির মধ্যে একটি সর্বদলীয় সংহতি স্থাপন করতে সফল হন। বৃষ্ণি, ভোজ, সাত্বত, অন্ধক, কুকুর—ইত্যাদি সমস্ত সংঘমুখ্যেরা যে নিজেদের মধ্যে একতাসূত্রে বদ্ধ হন, সেই সূত্রটি হলেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণ হলেন একমাত্র ব্যক্তি, যাঁকে সাত্বত, ভোজ, বৃষ্ণি, কুকুর কিংবা অন্ধক—এই সমস্ত উপাধিতেই ডাকা হয়েছে। পৃথক পৃথক সমস্ত যাদববংশেই তিনি সর্বসম্মত মুখ্যব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন এবং এই সর্বসম্মতি এসেছে প্রয়োজনে, কংস-জরাসন্ধের কারণে।

॥ ৫ ॥

পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির খাণ্ডবপ্রস্থ স্থাপনের সাফল্যে পুলকিত হয়ে যখন সম্রাট হতে চাইলেন, তখন যদুকুলপতি কৃষ্ণ তাঁকে মগধরাজ জরাসন্ধের গল্প

বলেছিলেন। চণ্ডকৌশিক নামে মুনির জবানিতে কৃষ্ণ নিজের বক্তব্যই শোনালেন যুধিষ্ঠিরকে। পুরাণগুলির মতে যদিও জরাসন্ধ বৃহদ্রথের দু-চার পুরুষ পরের প্রজন্ম, কিন্তু মহাভারতের মতে জরাসন্ধ বৃহদ্রথের ছেলে। জরাসন্ধের জন্মলগ্নেই চণ্ডকৌশিক জরাসন্ধকে যে আশীর্বাদ করেছিলেন, সেটা সম্পূর্ণ ফলে গেছে বলে পুরুষোত্তম কৃষ্ণের ধারণা। চণ্ডকৌশিক বৃহদ্রথকে বলেছিলেন—এ ছেলে তোমায় সব দেবে। পৃথিবীতে এমন কোন রাজা থাকবে না, যে এই জরাসন্ধের বলবীর্যের ধারে কাছে যেতে পারবে। সমস্ত ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নৃপতি বলতে যাঁদের বোঝায়, তাঁদেরও সবার মাথার ওপরে থাকবেন জরাসন্ধ—সর্ব মূর্ধাভিষিক্তানাম্ এষ মূর্ধ্নি জ্বলিষ্যতি। সমস্ত আলোকের আধার সূর্যদেব যেমন অন্য সমস্ত কৃত্রিম আলোক ম্লান করে দেন, তেমনি জরাসন্ধের প্রতিভায় অন্যান্য নৃপকুলের প্রতিভা ম্লান হয়ে যাবে। উড্ডীন পতঙ্গেরা যেমন আগুনে ঝাঁপ দেয়, তেমনি সমস্ত সমৃদ্ধ রাজারা একসময়ে জরাসন্ধের আগুনে ঝাঁপ দেবেন, অর্থাৎ তাঁদের নিজেদের কোন অস্তিত্ব থাকবে না, সবাই হবেন জরাসন্ধের আজ্ঞাবহ—অস্যাজ্ঞাবশগাঃ সর্বে ভবিষ্যন্তি নরাধিপাঃ।[৪৩]

মুনি চণ্ডকৌশিকের বক্তব্য শেষ করে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন—হ্যাঁ, জরাসন্ধ তাই করেছেন। তিনি সমস্ত ভারতবর্ষের রাজা মহারাজাকে আপন বশবর্তী করে ফেলেছেন। এটা কৃষ্ণের সিদ্ধান্ত। কৃষ্ণ জানেন যে, জরাসন্ধ বেঁচে থাকতে অন্য কোন রাজার পক্ষে সার্বভৌম চক্রবর্তী সম্রাট হওয়া সম্ভব নয়। কৃষ্ণ এবং যুধিষ্ঠিরের পারস্পরিক আলাপ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহাভারতের কথক-ঠাকুর বৈশম্পায়ন তাঁর শ্রোতা জনমেজয়ের কাছে ঠিক সেই সময়ের পরিস্থিতিটি তুলে ধরলেন, যাতে বোঝা যায় জরাসন্ধের ব্যাপারটা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের থেকেও কৃষ্ণের কাছে বেশি জরুরী। বৈশম্পায়ন বললেন—হ্যাঁ, চণ্ডকৌশিকের আশীর্বাদমত জরাসন্ধ ভালই রাজত্ব করছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি বাসুদেব কৃষ্ণ কংসকে মেরে ফেলায় জরাসন্ধের সঙ্গে তাঁর দারুণ শত্রুতা আরম্ভ হয়ে গেছে—জাতো বৈ বৈরনির্বন্ধঃ কৃষ্ণেন সহ তস্য বৈ।[৪৪] বৈশম্পায়নের মুখ থেকে এইমাত্র যে খবরটা বেরিয়ে এল, সেটা অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য, কিন্তু তার আগে আমাদের একবার জরাসন্ধের রাজধানী মগধে যাওয়া প্রয়োজন।

মগধ জায়গাটা আগে ভদ্রলোকের জায়গা ছিল না। ভদ্রলোক মানে তখনকার মতে আর্য প্রভুরা। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ—এই সব পূর্বাঞ্চলের ভাষাও তাঁদের ভাল লাগত না, আচার-আচরণও নয়। ফলে এ সব জায়গায় এলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত আর্যদের। মূল আর্যগোষ্ঠী থেকে বেরিয়েও জরাসন্ধ যেহেতু মগধে বসতি গেড়েছিলেন সে জন্য তিনি যে অনেক আর্যগোষ্ঠীর বিরাগভাজন হয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার ওপরে তাঁর আরও দোষ, তিনি ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সঙ্গে অত্যন্ত সদ্ভাব রেখে চলতেন, এটা কখনোই উত্তর-ভারতীয় আর্যদের পছন্দ হতে পারে না। কিন্তু তাঁরা পছন্দ করুন, চাই নাই করুন, জরাসন্ধ যে রাজনীতিটা ভাল বুঝতেন সেটা মহাভারতে কৃষ্ণের মুখে জরাসন্ধ প্রশংসাতেই প্রমাণিত।

রাজধর্মবিৎ পণ্ডিতেরা রাজাদের থাকবার জন্য যে রকম জায়গা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন, জরাসন্ধ সেইরকম একটা জায়গায় নিজের রাজধানী প্রতিষ্ঠা

করেন। এখনকার বিহারের দক্ষিণাঞ্চলে পাটনা আর গয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়েই তখনকার মগধ। জরাসন্ধের রাজধানীর নাম গিরিব্রজ, যেটাকে পুরনো রাজগৃহ (এখনকার রাজগিরের কাছে) বলা যায়। মহাভারতে কখনো গিরিব্রজকে রাজগৃহও বলেছে, কখনো বা বলেছে মাগধপুর, আবার কখনো জরাসন্ধের বাবার নামে বার্হদ্রথপুর। জরাসন্ধের মত নামী রাজার রাজধানীকে কি আর একটি মাত্র নামে ডাকা সঙ্গত হয়। গিরিব্রজ এমনই এক রাজধানী যা যে কোন দিক থেকে অতিবড় শত্রুর পক্ষেও দুর্গম—দুরাধর্ষং সমন্ততঃ। পাঁচটা পাহাড় যেন একত্র সংহত হয়ে জরাসন্ধের রাজধনীকে দেবতার মত রক্ষা করছে। পাঁচ পাহাড়ের প্রথমটার নাম 'বইহার'। আমি এটাকে আগে 'বিহার' শব্দ নিষ্পন্ন 'বৈহার' ভাবতাম, বিভূতিভূষণের লবটুলিয়া-বইহারও আমার কাছে স্থান-নাম ছাড়া অন্য অর্থে ধরা দেয়নি। কিন্তু 'বৈহার' কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই মহাভারতকার তার অর্থ দিয়ে বলেছেন—বৈহারো বিপুলঃ শৈলঃ, অর্থাৎ বইহার মানে বড় পাহাড়। এখানে অবশ্য বৈহার, বরাহগিরি, বৃষভগিরি, ঋষিগিরি এবং চৈত্যক—এই পাঁচ পাহাড় ঘিরে আছে জরাসন্ধের নগরী। এই চারদিকে পাহাড়, আর শীতলছায়া বড় বড় গাছ,—পর্বতাঃ শীতলদ্রুমাঃ, পিপ্পলীময় বনরাজি কিংবা লোধ্রফুলের গন্ধ—কোনটাই কিন্তু জরাসন্ধকে কবি করে তুলতে পারেনি। তাঁর বাবার বাবা উপরিচর বসু এক সময় চেদি থেকে যাদবদের খেদিয়ে দিয়ে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার পর থেকেই যাদবদের মধ্যে অসন্তোষ চলছে। যদুবংশের জ্যামঘ রাজা যে শুক্তিমতী নদীর তীরে আস্তানা বানিয়েছিলেন, সেই শুক্তিমতীর তীরেই জাঁকিয়ে বসেছিলেন উপরিচর বসু—পুরোপবাহিনীং তস্য নদীং শুক্তিমতীং গিরিঃ।'[৪৫] 'উপরিচর' নামটা পৌরাণিকেরা অপব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, ওই রাজা নাকি আকাশে উঠে যেতে পারতেন এবং সেই জন্যই তিনি নাকি চৈদ্য উপরিচর। আমরা কিন্তু সাদা বাংলায় বুঝি যে, তিনি চৈদ্য রাজার ওপরে চড়াও হয়েছিলেন বলেই চৈদ্য উপরিচর। বস্তুত বসু রাজার আক্রমণের ধরনেই চেদিবাসী যাদব চৈদ্যদের মনে হয়েছে যেন আকাশ থেকে চড়াও হয়েছিলেন তিনি। এ দুঃখ যাদবরা ভুলবে কি করে ? সেই থেকেই তারা প্যাঁচ কষছিল কিভাবে বসু মহারাজকে জব্দ করা যায়। কিন্তু কপাল মন্দ, জব্দ তো দূরের কথা, তার বদলে তাঁর ছেলে বৃহদ্রথ এবং তাঁরও ছেলে জরাসন্ধ এমন শক্তিমান হয়ে উঠলেন, যে তখন তাদের নিজেদের রাজ্য সামলানোই দায় হয়ে পড়ল। অনেক যাদব জাতভাইরাও ভিড়ে গেল জরাসন্ধের পক্ষে ! কিন্তু কেন ভিড়ে গেল ? আসলে সেইখানেই জরাসন্ধের রাজনীতি।

জরাসন্ধের দুটি মেয়ে ছিল—অস্তি আর প্রাপ্তি। দুজনেই বেশ যৌবনবতী, হরিবংশের ভাষার ব্যঞ্জনায় এঁদের কটিদেশের পশ্চাৎ ভাগে এবং বক্ষদেশে যথেষ্ট স্থূলতা ছিল—পীনশ্রোণীপয়োধরে। জরাসন্ধ নিজের এই মেয়ে দুটিকে দান করলেন মথুরাদেশে ভোজপুংগব কংসের হাতে। আমাদের ধারণা কংস যে মথুরার রাজত্ব পেয়েছিলেন, তাতে জরাসন্ধের হাত ছিল। কেননা যিনি আগে মথুরার রাজা ছিলেন, তিনি হলেন যাদবদের অনুমোদিত পুরুষ উগ্রসেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই যে তাঁর ছেলে কংস মথুরার রাজত্বভার পেলেন, এর পেছনে জরাসন্ধের ইন্ধন ছিল। কেননা হরিবংশ একেবারে স্পষ্ট খবর দিয়ে বলেছে যে,

কংস শৌরসেনী যাদবদের রাজা হয়েছেন যাদবদের সম্মিলিত ইচ্ছাকে অনাদর করে এবং এই অনাদর তিনি করার সাহস পেয়েছেন মগধরাজ জরাসন্ধের মদতে—সমাশ্রিত্য জরাসন্ধম্ অনাদৃত্য চ যাদবান্ ।[৪৬]

ভাবুন একবার, কোথায় মগধ আর কোথায় মথুরা ! কিন্তু সেই সুদূর মগধে বসেই জরাসন্ধ বুঝেছিলেন যে, ভোজ-বৃষ্ণিদের নিজেদের মধ্যে আন্তরিক বিসংবাদ আছে । একটা জিনিস বুঝতে হবে যে কংসের পূর্ববর্তী রাজা এবং পিতা উগ্রসেন ভোজবংশীয় পুরুষ এবং তিনি রাজত্ব চালাচ্ছিলেন । পুরাণগুলি এবং মহাভারত যে কথা ঘুণাক্ষরেও বলেনি, সেটা হল কংসপিতা উগ্রসেনের দাদা কিংবা ছোটভাই হলেন দেবক, কোনভাবেই তিনি রাজা হতে পারেননি । এই দেবক দেবকীসহ তাঁর সাত সাতটা মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন বসুদেবের সঙ্গে, যে বসুদেব তাঁর পালটি ঘর বৃষ্ণি বংশের ছেলে । দেবকের নিজের তো রাজা হওয়ার কোন উপায়ই ছিল না, তাঁর ছেলেদেরও সে সুযোগ ছিল না, কেননা কাল পরিণত হওয়ার আগেই কংস নিজ পিতা উগ্রসেনকে বন্দী করে নিজে রাজা হন । এ দিকে কৃষ্ণপিতা বসুদেবও খুব সাধারণ মানের লোক ছিলেন না । বৈষ্ণবেরা ভাগবত পুরাণ পড়ে বসুদেবকে বড় নিরীহ গোবেচারা লোক মনে করেন । কিন্তু আমরা বেশ জানি বসুদেবের মধ্যে মথুরার রাজা হবার সম্ভাবনা ছিল এবং সেইজন্যই কংসের সঙ্গে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা । এমন হতে পারে যে পূর্ববর্তী রাজা উগ্রসেন বসুদেবকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন, কারণ আমরা কংসের মুখেই শুনেছি যে, কংসের বাবাই বসুদেবকে লালনপালন করে বড় করেছেন । কংস সে কথা বসুদেবকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে—আমার বাবার খেয়ে-পরে তুমি বড় হয়েছ—মম পিত্রা বিবর্ধিতঃ । এমনও হতে পারে যে, উগ্রসেনের বসুদেবপ্রীতি তাঁর নিজপুত্র কংসের থেকেও বেশি ছিল, কারণ হরিবংশের প্রমাণে জানি উগ্রসেন তাঁর এই উদ্ধত পুত্রটিকে পছন্দ করতেন না । এমনও হতে পারে—উগ্রসেনের পর এই বসুদেবের মধ্যে রাজসম্ভাবনা দেখেই তাঁর ভাই দেবক বসুদেবকে সাত মেয়ের বর এক জামাই পছন্দ করেছেন । শুধু তাই নয়, এই মথুরায় বসে স্বয়ং রাজা না হওয়া সত্ত্বেও বসুদেব যে কতটা বড় মানুষ ছিলেন, তা বুঝবেন আরেকটি ঘটনায় । নিজের জ্ঞাতিগুষ্টির মধ্যে দেবক না হয় বসুদেবকে মেয়ে দিয়ে আপন স্নেহবশত বেশি মর্যাদা দিয়েছেন ; কিন্তু হস্তিনাপুরের রাজাধিরাজ পুরু-ভরতবংশীয় শান্তনু রাজার ছোট ভাই বাহ্লিক তাঁর পাঁচ পাঁচটি মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন এই বসুদেবের সঙ্গেই । এ কথাটা যথেষ্ট ভাববার মত । মহারাজ শান্তনু কুরুকুলপতি ভীষ্মের পিতা । শান্তনুর ছোট ভাই বহ্লিক কিংবা তাঁর বংশীয় অধস্তন পুরুষেরা কুরুসভায় ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রিমণ্ডলীতে ছিলেন । কুরুবংশীয় বাহ্লিকের পাঁচ মেয়ের মধ্যে সবার বড় হলেন রোহিণী, বড় ঘটা করে যাঁর পরিচয় দেওয়া হয়েছে পৌরবী বলে, মানে পুরুবংশের মেয়ে—পৌরবী রোহিণী নাম বাহ্লিকস্য আত্মজাভবৎ ।[৪৭] পুরু অথবা কুরুবংশের এই মেয়ের গর্ভেই বসুদেবের ঔরসে কৃষ্ণের দাদা বলরামের জন্ম । মাতৃবংশের ঘরের ঝগড়া বলেই কি বলরাম শেষ পর্যন্ত কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে কোন অংশ নেননি অথবা সেই জন্য কি তাঁর প্রচ্ছন্ন পক্ষপাত ছিল কুরুবংশের নিকষিত দাবিদার কুরুরাজ দুর্যোধনের প্রতি ?

বলরামের প্রসঙ্গ ছেড়ে বসুদেবের কথায় ফিরে আসি। এই যে দেবকের সাতটি মেয়ে ছাড়াও বড় ঘরানার পাঁচটি পৌরবী কন্যা বসুদেবের গললগ্না হলেন, এর মধ্যে রাজসম্ভাবনার অভিসন্ধি ছিল বলেই আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের এ বিশ্বাস জোরদার হওয়ার আরও কারণ আছে, কিন্তু সে কথাও পরে। আপাতত এইটা মনে রাখতে হবে যে, সুদুর মগধ দেশে বসেও জরাসন্ধ ভোজ-বৃষ্ণি-যাদবদের ঘরোয়া বিসংবাদের সমস্ত খবর রাখতেন। উগ্রসেনের উদ্ধত ছেলে কংসকে দিয়ে তাঁর স্বকার্য সাধন হবে বুঝেই জরাসন্ধ কংসের সঙ্গে নিজের দুটি মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁকে রাজ্যলাভে সাহায্য করেছেন। জরাসন্ধের স্বার্থ হল—তিনি সোজাসুজি যাদবদের প্রধান এবং সবচেয়ে পুরাতন ঘাঁটিটি আক্রমণ না করেও তাঁর বশংবদ মানুষটিকে যাদবদের ওপর চাপিয়ে দিলেন এবং এইভাবে তাঁর নিজের আধিপত্যও চাপিয়ে দিতে সফল হলেন যাদবদের ওপর। মজা হল, যিনি মূলত অত্যাচারী এবং প্রখর স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন, তিনি যত বড় রাজাই হোন পরিণামে সফল হন না। রাজা হবার পর থেকে কংসের অত্যাচার বাড়তেই থাকল। অন্যদিকে কৃষ্ণ যতই বলুন জরাসন্ধ অমুক রাজাকে বন্দী করেছেন, একশ রাজাকে গারদে পুরেছেন, আমাদের ধারণা, এগুলি সবই তাঁর সাম্রাজ্যবৃদ্ধির উপায়। তিনি নিজে কখনোই অত্যাচারী রাজা বলে নিন্দিত হননি। কিন্তু কংস অত্যাচারী বলেই সমস্ত গ্রন্থে প্রমাণিত। কংস অসুরও নয়, দানবও নয়, পূর্বজন্মের কালনেমিও নয়, পৌরাণিক খোলস খুলে ফেললেই দেখা যাবে তিনি অত্যাচারী রাজা। জরাসন্ধ এমনটি চেয়েছিলেন কি না বলতে পারব না, কিন্তু মেয়ে কংসকে দেওয়ার ফলে তাঁর দিক থেকে সীমাবদ্ধতা কিছু থাকলেও থাকতে পারে।

ইতিহাসের দৃষ্টিতে হরিবংশ এবং অন্যান্য পুরাণগুলি বিচার করলে দেখবেন, অন্য সমস্ত যাদব-বৃষ্ণিমুখ্যদের মধ্যে কৃষ্ণপিতা বসুদেবের ওপরেই কংসের রাগ সবচেয়ে বেশি, এর কারণ অবশ্যই বসুদেবের মধ্যে সেই রাজসম্ভাবনা, যেটাকে কংস ভয় পেতেন। বসুদেবের ওপর কংসের ব্যক্তিগত ক্রোধ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, সম্ভবত সেই জন্যই বসুদেব কৃষ্ণকে কংসের হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছেন এবং তাঁকে লুকিয়ে রেখেছিলেন ব্রজে। তাঁর পৌরবী পত্নী রোহিণীকে বহু পূর্ব থেকেই বৃন্দাবনে বন্ধু নন্দগোপের ঘরে রেখে দিয়েছিলেন বসুদেব। বলরাম সেখানেই জন্মেছেন, এবং কৃষ্ণকেও সেইখানেই পাঠানো হয়েছে। আরেকটা জিনিস লক্ষণীয়, সেটা হল—হরিবংশ বলেছে যে কংস জরাসন্ধকে আশ্রয় করে যাদবদের একটুও আমল না দিয়ে উগ্রসেনকে বন্দী করেন এবং রাজা হন। এর ফলে যাদবদের মধ্যে চরম অসন্তোষ দেখা দেয়। সমস্ত ভোজ-বৃষ্ণি—অন্ধককুল যে কংসের বিরোধিতায় নেমে পড়ল, তার কারণ ক্রমাগত অত্যাচারে কংস তাঁদের আরও ক্ষেপিয়ে নিয়েছিলেন। বাসুদেব কৃষ্ণ ততদিনে মানুষ হয়ে পড়েছেন এবং তিনি কংসের প্রেরিত অনিষ্টকারী অনেককেই মেরে ফেলছেন। কৃষ্ণের প্রতিপত্তি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে যাদবদের আশা ভরসা সবই বাড়তে থাকে, উল্টোদিকে কংসের ভয়ও বাড়তে থাকে। ঠিক এইরকম একটা অবস্থায়, যখন কৃষ্ণের বিরুদ্ধে কংসের কোন কৌশলই আর খাটল না, তখন মথুরার এক 'স্তিমিত-মূক' রাত্রিতে কংস তাঁর বন্দী পিতা উগ্রসেন থেকে

আরম্ভ করে যদুবংশের সমস্ত মুখ্য নেতাদের ডেকে পাঠালেন তাঁর রাজসভায়। সভায় আহূতদের মধ্যে প্রথম নাম কিন্তু কৃষ্ণপিতা বসুদেব, তারপর আছেন কৃতবর্মা, অক্রূর, ভূরিশ্রবা ইত্যাদি যাদব বীরেরা এবং আছেন কংক—কংসের ছোটভাই। এঁরা সবাই কংসের মন্ত্রী, হরিবংশে স্বয়ং কংসের ভাষানুযায়ী 'রাজমন্ত্রধরাঃ সর্বেঃ'। তার মানে, যে বসুদেবের সঙ্গে কংসের মূল বিরোধিতা, তাঁকেও কিন্তু কংস মন্ত্রিপদে বরণ না করে পারেননি।

রাজসভায় আলোচনার আরম্ভে কংস তাঁর মন্ত্রীদের যথোচিত প্রশংসা করে কৃষ্ণের কথা পাড়লেন এবং প্রথমেই অনুযোগ করলেন যে তাঁর সুযোগ্য মন্ত্রীরা থাকা সত্ত্বেও একটি গোয়ালার ছেলে তাঁর অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছে। কংস আরও বললেন—আসলে আমার কোন সুযোগ্য মন্ত্রীই আজ আমার পাশে নেই, মন্ত্রী থেকেও আজ আমি মন্ত্রীহীন—আত্মীয়-স্বজনও আমার সহায় নয়—অনমাত্যস্য শূন্যস্য। আমরা জানি, কংস রাজাই হয়েছেন এই সব যদুমুখ্যদের বিরোধিতার মুখে, এখন সেই বিরোধিতা আরও বেড়েছে। এই বিরুদ্ধ এবং বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন অবশ্যই বসুদেব। তাই এ কথা সে কথার পরেই কংস বসুদেবেরই মুখোস খুলে দিতে চাইলেন সবার সামনে। কংস বললেন—কাক যেমন মানুষের মাথার ওপরে বসে সেই মানুষেরই চোখ খুবলে নিতে চায়, তেমনি এই বসুদেবও আমারই খাচ্ছে, অথচ আমারই মূলোচ্ছেদ করতে বদ্ধপরিকর—ছিনত্তি মম মূলানি ভুঙ্‌ক্তে চ মম পার্শ্বতঃ।[৪৮] কংসের ধারণা, বসুদেব নিজে না হলেও তাঁর ছেলে রাজা হোক মথুরায়—এটা বসুদেব চান। কংস সে আশায় জল ঢেলে দিয়ে বলেছেন—কংস মরলে, আমারই ছেলে রাজা হবে মথুরায়—হতে কংসে মম সুতো মথুরাং পালায়িষ্যতি—বসুদেব! তোমার এই আশা আমি ছিন্নভিন্ন করে দেব।

কংস যতই বাগাড়ম্বর করুন না কেন, তিনি বসুদেবকে যেভাবে পরবর্তী সময়ে মর্যাদা দিয়ে কথা বলেছেন, তাতে পরিষ্কার বোঝা যায় বসুদেবই ছিলেন কংসের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। কংস বসুদেবের বিশেষণ দিয়েছেন—যদুদের নায়ক বলে, প্রধান বলে—যদুনাং প্রথমো গুরু, যদূনাং যূথমুখ্যস্য। এ ছাড়া বসুদেবের পেছনে যে সমস্ত যাদবেরা একত্রিত হয়েছিলেন, সেটা বোঝা যায় কংসের ভাষাতেই। কংস বললেন—যদুদের বড় ঘরে তোমার জন্ম, তুমি নিজেও বিখ্যাত হয়েছ—কুলে মহতি বিখ্যাতঃ—এবং সেই গৌরবের জন্যই শ্রেষ্ঠ মানুষেরা তোমার কদর করে—পূজতঃ সদ্ভির্মহদ্ভিঃ ধর্মবুদ্ধিভিঃ।

কংসের এই বসুদের-প্রশংসা দু-চার পংক্তির। তার পরেই তাঁর নিন্দা আরম্ভ হয়েছে এবং কি কি ভাবে কংস তাঁকে শায়েস্তা করবেন, সে পন্থাও তাঁকে জানানো হয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় হল, প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা হওয়া সত্ত্বেও উন্মুক্ত রাজসভায় বসুদেবের অনুকূলে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন এক অন্ধক বৃদ্ধ। কংসকে তিনি যা-ইচ্ছে-তাই কথা শোনাতেও কসুর করেননি। হরিবংশে অন্ধক-বৃদ্ধের এই বক্তৃতা প্রমাণ করে যে, বসুদেব একা ছিলেন না। তার ওপরে এই বৃদ্ধের মুখে রাজনীতির চালটা এমনই হল যে, বসুদেবের দুই পুত্র বলরাম এবং কৃষ্ণের ওপরে কংস যে অত্যাচার করছেন, তার প্রথম দায়ও বর্তাল কংসের ওপর।

বক্তৃতা, প্রতিবক্তৃতা, শত্রুতা এবং প্রতিশত্রুতার ফল শেষ পর্যন্ত এই হল যে কংস বাঁচতে পারলেন না। যুদবৃষ্ণিদের সমর্থনপুষ্ট কৃষ্ণ-বলরাম, কংস এবং তার বন্ধুবর্গকে একেবারে যমের বাড়ি পাঠালেন। ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা অবসিংবাদিত হল। তিনি রাজনীতি এতটাই বুঝতেন যে, বসুদেবকেও তিনি রাজা করলেন না—নিজেও রাজা হলেন না। রাজপদের জন্য তিনি ফিরিয়ে আনলেন বন্দী রাজা কংসপিতা উগ্রসেনকে। এর ফলে কংস-গোষ্ঠীর অনেকেই নিশ্চয়ই খুশি হল এবং জনসমক্ষে কৃষ্ণের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হল। কৃষ্ণের মর্যাদা এখন রাজার নয়, রাজকর্তার—কিংমেকারের।

কংসের মৃত্যু মানেই জরাসন্ধের সঙ্গে কৃষ্ণের শত্রুতা আরম্ভ। এই শত্রুতার মধ্যে যাবার আগেই আমাদের একটা কথা খেয়াল রাখতে হবে যে, কৃষ্ণপিতা বসুদেব কুরুরাজ শান্তনুর ভাই বাহ্লিকের মেয়ে বিয়ে করায় নিশ্চয়ই যাদবদের সঙ্গে কৌরবদের সম্পর্ক বেড়েছিল। এ সম্পর্কটা আরও বোধহয় ঘনীভূত হয়েছে যখন স্বয়ং বসুদেবের বোনের বিয়ে হল মহারাজ পাণ্ডুর সঙ্গে। কুন্তী বসুদেবের বোন এবং তাঁর সঙ্গে পাণ্ডুর বিয়ে হয়েছে তাঁর রাজা হবার পর। পাণ্ডু নিজে কুরু বংশের লোক বলেই কুরু বংশের আরেক শাখা-বংশ জরাসন্ধের সঙ্গে তাঁর কোন সরাসরি শত্রুতা হয়নি। কিন্তু পাণ্ডুর রাজত্ব মোটেই বেশি দিন টেকেনি এবং যাদবদের সঙ্গে জরাসন্ধের শত্রুতাও বোধ হয় তার পরে আরম্ভ হয়। পাণ্ডুর সঙ্গে কুন্তীর বিয়ে হওয়ার কোন সুফল যাদবরা পেলেন না। মাঝখানে পাণ্ডু মারা যাবার পর পাণ্ডবেরা ধৃতরাষ্ট্রের রাজহমলে যে-রকম বিপদ-আপদের মধ্যে দিন কাটাতে লাগলেন, তাতে জরাসন্ধের প্রতিপত্তি আরও বেড়ে গেল। কুরুরাজ দুর্যোধন নিজেও জরাসন্ধের ওপর টেক্কা দেওয়ার কোন চেষ্টা করেননি ; অন্তত জরাসন্ধ যত দিন বেঁচেছিলেন, তত দিন দুর্যোধন জরাসন্ধের সহায়তা করেছেন এবং সেটা আরও করেছেন পাণ্ডবেরা যদুবংশের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে।

জামাই কংসের মৃত্যুসংবাদে ব্যথিত এবং ক্রুদ্ধ জরাসন্ধ যে বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে মগধ থেকে সুদূর মথুরায় যাত্রা করেছিলেন, সেই বাহিনীর পুচ্ছভাগে ছিলেন স্বয়ং কুরুরাজ দুর্যোধন এবং তাঁর ভাইয়েরা—দুর্যোধনাদয়শ্চৈব ধার্তরাষ্ট্রা মহাবলাঃ।[৪৯] জরাসন্ধের বাহিনীতে আর যাঁরা কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন, তাঁদের একজনের নাম ক্রথ। ইনি অবশ্যই বিদর্ভের মানুষ, যদিও বিদর্ভ ছিল পূর্বে যাদবদের জায়গা। ছিলেন করূষ দেশের রাজা দন্তবক্র, যাঁর রাজত্ব ছিল শোন নদীর অববাহিকায় করূষ দেশে। করূষ দেশে অবশ্যই যাদবরা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং এই দন্তবক্রের বাবা বৃদ্ধশর্মার সঙ্গে কৃষ্ণপিতা বসুদেবের আরেক বোন পৃথুকীর্তির বিয়ে হয়। করূষের পাশেই চেদি, যে চেদি আগে যাদবদের ছিল, পরে জরাসন্ধের পিতার রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। এই চেদিরাজ শিশুপালের পিতাও কিন্তু বিয়ে করেছিলেন বসুদেবের আরেক বোন শ্রুতশ্রবাকে। তাহলে দেখুন বসুদেবও খুব কম লোক ছিলেন না। জরাসন্ধের পাশের রাজ্য করূষ এবং চেদিতে নিজের বোনেদের বিয়ে দিয়ে এই রাজ্যের রাজাদের নিয়ে তিনি যে জরাসন্ধের বিরুদ্ধে একটা গোষ্ঠী তৈরি করতে চেয়েছিলেন রীতিমত, তা বেশ বোঝা যায়। কিন্তু মজা হল, বসুদেব কিংবা এই

যাদব নায়কের সমস্ত 'স্কিম'গুলিই ব্যর্থ হয়েছে। কৌরববংশে পৃথা-কুন্তীর বিবাহের সুফলটা না হয় ব্যর্থ হয়েছে ভাগ্যদোষে, কিন্তু মগধের পাশেই করূষ আর চেদিতে যে বিয়েগুলো হল, তার সুফলটা বসুদেব কিংবা আরও পরবর্তীকালে কৃষ্ণ যে একটুও পাননি তা কিন্তু জরাসন্ধের রাজনৈতিক বুদ্ধিতেই। যেভাবেই হোক, জরাসন্ধ তাঁর মতাদর্শ এই দুই দেশের রাজা দন্তবক্র এবং শিশুপালের ওপর চাপাতে সমর্থ হয়েছিলেন। বিশেষত হরিবংশের বর্ণনামত শিশুপাল জরাসন্ধের পুত্রকল্প ছিলেন। পুরাণ এবং শাস্ত্রগ্রন্থগুলি দন্তবক্র এবং শিশুপালকে পূর্বজন্মের রাবণ-কুম্ভকর্ণ অথবা হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু সাজিয়ে তাঁদের কৃষ্ণ-বিদ্বেষের কারণ খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু আমরা জানি—জরাসন্ধের ক্ষমতা এবং রাজনৈতিক বুদ্ধি এতই প্রখর ছিল যে, দন্তবক্র-শিশুপাল দু'জনেই জরাসন্ধের অন্ধ পক্ষপাতী হয়ে পড়েন। এর জন্য কোন অজুহাতেরই প্রয়োজন নেই।

কৃষ্ণের বিরুদ্ধে জরাসন্ধের বাহিনীতে আরও যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রথম নাম করতে হয় পৌণ্ড্রক বাসুদেবের। ইনি নামে মোটামুটি অবিভক্ত বাংলার উত্তরার্ধের মানে, পুণ্ড্রবর্ধনের রাজা ছিলেন। হরিবংশের প্রমাণে পৌণ্ড্র বাসুদেব অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ দেশের রাজা ছিলেন, তবে এসব রাজ্যে তাঁরই নিযুক্ত সামন্ত রাজারা রাজ্য শাসন করতেন বলে মনে হয়, কারণ জরাসন্ধের সঙ্গে অঙ্গ কলিঙ্গ এবং বঙ্গদেশের রাজাদেরও দেখতে পাচ্ছি। অবশ্য অঙ্গরাজ্য পুরোটা পৌণ্ড্রকের রাজ্যভুক্ত ছিল বলে মনে হয় না,কারণ বৌদ্ধগ্রন্থ বিধুর পণ্ডিত জাতকে রাজগৃহের মত মগধ-রাজধানীকে অঙ্গরাজ্যের একটি নগরী বলা হয়েছে। আসলে অঙ্গদেশের কিছু অংশ নিশ্চয়ই জরাসন্ধের রাজ্যভুক্ত ছিল, আবার কিছু অংশ হয়তো কৌরব দুর্যোধনেরও বিষয়ভুক্ত ছিল, আবার কিছুটা বা পৌণ্ড্রক বাসুদেবেরও। দুর্যোধন যখন কর্ণকে অঙ্গরাজ্য দান করেন তখন কর্ণের রাজধানী ছিল চম্পা, গঙ্গা আর চম্পা নদীর ওপরেই চম্পা নগরী, এখনকার চান্দন। কানিংহাম সাহেব এখানকার ভাগলপুরের দুটি স্থান চম্পানগর আর চম্পাপুরকে পুরাতন চম্পার কাছাকাছি আনতে চান। চম্পা নদীই ছিল অঙ্গরাজ্যের সঙ্গে মগধের বিভেদরেখা। ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী হরিবংশের প্রমাণে বলতে চেয়েছেন যে, চম্পা নগরীর পূর্ব নামই মালিনী—চম্পস্য তু পুরী চম্পা যা মালিনী অভবৎ পুরা। কিন্তু যেহেতু মালিনীকে এখনকার কোন দেশনামের সঙ্গে একাত্ম করা যায়নি, অতএব সেটিই চম্পা, এমন বলাটা বোধহয় ঠিক হবে না। কারণ মহাভারতের শান্তিপর্বে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যুবক কর্ণ (তিনি তখন অবশ্যই দুর্যোধনদত্ত অঙ্গরাজ্য পেয়েছেন) একবার বৃদ্ধ জরাসন্ধের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করেন। কর্ণের অসাধারণ শক্তি দেখে জরাসন্ধ তাঁকে মগধভুক্ত অঙ্গরাজ্যের 'মালিনী' নগরীটি পারিতোষিক হিসেবে দেন। এখানে পরিষ্কার বলা আছে যে, জরাসন্ধও অঙ্গরাজ্যের মালিক ছিলেন—অঙ্গেষু নরশার্দুল স রাজাসীৎ সপত্নজিৎ।[৫০] কিন্তু তিনি যখন প্রীত হয়ে মালিনী নগরী দান করলেন তখন মহাভারতকার স্পষ্ট করে জানাচ্ছেন যে, এই নগরীটি কর্ণের নতুন প্রাপ্তি, কারণ, তিনি দুর্যোধনের দেওয়া চম্পা নগরীও আলাদাভাব শাসন করছিলেন—পালয়ামাস চম্পাঞ্চ। যাই হোক, অঙ্গরাজের ওপর তখনকার তিন প্রধানের যত মালিকানার দলিল থাকুক,

অঙ্গরাজ জরাসন্ধের সেনাবাহিনীর সঙ্গে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছেন—এইটাই আসল কথা।

জরাসন্ধের সঙ্গে আছেন বিদর্ভ দেশের অধিপতি ভীষ্মক, যিনি রুক্মিণীর পিতা এবং ভীষ্মকের ছেলে রুক্মী যিনি যুদ্ধে পাণ্ডব অর্জুনের সমকক্ষ বলে পরিচিত ছিলেন। ভাগবত পুরাণ পড়লে কারও মনে হতে পারে যে, ভীষ্মক যেন কৃষ্ণের অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু, অন্য প্রমাণে দেখা যায়—ভাগবতের কথা ভাবালুতা মাত্র, ভীষ্মক 'ভোজ' হলেও চিরকাল জরাসন্ধের পক্ষপাতী ছিলেন। দশার্ণদেশের অর্থাৎ এখনকার বুন্দেলখণ্ডের একাংশের রাজা, ইনিও যাদবগোষ্ঠীর মানুষ, কিন্তু তবু জরাসন্ধের পক্ষে যুদ্ধ করতে চলেছেন। জরাসন্ধের পক্ষে আছেন আরেক পরাক্রান্ত নামী রাজা—শাল্ব। তিনি রাজত্ব করতেন মোটামুটি উত্তর-পশ্চিম ভারতের আলোয়াড় অঞ্চলে সৌভ দেশে। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন মদ্ররাজ শল্য, যিনি কাশ্মীরের চন্দ্রভাগা আর ইরাবতীর মাঝখানে রাজত্ব করতেন, আছেন ত্রিগর্ত দেশের রাজা সুশর্মা। তিনিও কাশ্মীরেরই মানুষ, রাজত্ব করতেন বিপাশা আর শতদ্রুর অন্তর্বর্তী ভূমিতে, যদিও অনেকের মতে এটা জলন্ধর। এখনকার কাবুল নদীর তীরবর্তী পেশোয়ার আর রাওয়ালপিণ্ডি জেলা মিলে যে গান্ধার রাজ্য ছিল, তার রাজা শকুনি মামার পিতা ঠাকুর সুবল, তিনিও এসেছেন জরাসন্ধের অনুকূলে। আর আছেন স্বয়ং কাশ্মীর দেশের রাজা গোনর্দ। আসলে হরিবংশ গোনর্দ বললেও আমরা জানি ইনি গোনন্দ।

কাশ্মীররাজ গোনন্দ যে জরাসন্ধের সঙ্গে যাদবদের আক্রমণ করেছিলেন, এটা ঐতিহাসিক ঘটনা। রাজতরঙ্গিণীর লেখক কল্‌হনকে যদি ঐতিহাসিক বলি তাহলে দেখব শুধুমাত্র কাশ্মীররাজ গোনন্দের ঘটনা দিয়েই আমরা মহাভারতীয় রাজনীতির খানিকটা ব্যাখ্যা পাব। কল্‌হন বলেছেন যে, এক সময় বন্ধু জরাসন্ধ কাশ্মীররাজ গোনন্দের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করেছিলেন—সাহায্যার্থম্ আহূতো জরাসন্ধেন বন্ধুনা।[৫১] তাঁর প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে গোনন্দ এসে কৃষ্ণের বাসস্থল মথুরাপুরী অবরোধ করেন। কল্‌হন লিখেছেন যে, শেষ পর্যন্ত গোনন্দ যদুবীর বলরামের কাছে হার স্বীকার করেন। কিন্তু সেটা আমাদের ভাবনা নয়। আমরা শুধু সার কথাটি ধরে বলব যে, মগধের চারপাশের দেশগুলির রাজারা জরাসন্ধের কাছাকাছি হওয়ার দরুন বেশির ভাগই জরাসন্ধের আজ্ঞাবহ ছিলেন, যদিও এর মধ্যে একক ব্যতিক্রম হলেন পুণ্ড্রবর্ধন এবং বঙ্গের রাজা পৌণ্ড্র বাসুদেব। কিন্তু এই যে কাশ্মীর, ত্রিগর্ত, সৌভ, মদ্র ইত্যাদি দেশ, এই সব দেশের রাজার কাছে জরাসন্ধ যুদ্ধকালীন বার্তা পাঠিয়েছিলেন মাত্র। কিন্তু এই সব রাজারা স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও কেউই কিন্তু জরাসন্ধের বিরুদ্ধে যেতে চাননি। খোদ যাদবদের মধ্যে একাংশ, যাঁরা কুরু রাজ্য এবং মগধের দক্ষিণ থেকে আরও দক্ষিণে রাজ্য প্রসারিত করেছিলেন তাঁরা তো সবাই জরাসন্ধের বশংবদই ছিলেন। যাঁরা বশংবদ ছিলেন না, তাঁরাও বেশির ভাগই জরাসন্ধকেই বন্ধু হিসেবে চাইতেন, কৃষ্ণকে নয়। অথবা কৃষ্ণের বিরুদ্ধে তাঁদেরও অভিযোগ ছিল। হরিবংশের যা বর্ণনা, তাতে কৃষ্ণ এবং বলরামের ওপর অলৌকিক ক্ষমতার আরোপ হয়ে যায় বটে, কিন্তু আমরা জানি এই সময় মথুরাবাসী যাদবদের প্রায় একা লড়তে হয়েছিল সমগ্র ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে এবং তাঁরা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ জিতেছিলেন

কাশগড়
অক্সাস নদী
সোগদিয়ানা
পামীর
ব্যাকট্রিয়ানা
কাম্বোজ
কারাকোরাম পর্বত
আরীয়
কাবুল
কুভা নদী
রাজাপুর
ড্রাঙ্গীয়ানা
হেলমন্দ নদী
গান্ধার
তক্ষশীলা
আরাচোশীয়া
কুমু নদী
কেকয়
গোমতী নদী
বিতস্তা নদী
চন্দ্রভাগা নদী
বিপাশা নদী
মদ্র
ত্রিগর্ত
পারুষ্ণি নদী
সরস্বতী নদী
শতদ্রু নদী
সিন্ধু নদ
ব্রহ্মাবর্ত
কুরু
উশীনর
দৃষদ্বতী নদী
ইন্দ্রপ্রস্থ
হস্তিনাপুর
মৎস্য
শূরসেন
পাঞ্চাল
জনকপুর
সৌবীর
মরুভূমি
বিরাট
কাম্পিল্য
বিদেহ
গেড্রোশিয়া
মথুরা
যমুনা নদী
কোশল
কাশীনগর
প্রাগ্‌জ্যোতিষ
অযোধ্যা
বৎস
বৈশালী
পর্ণাশা নদী
চর্মন্বতী নদী
কৌশাম্বী
কাশী
পরিযাত্র
গঙ্গা নদী
পাটলিপুত্র
পুণ্ড্র
লৌহিত্য নদী
চেদি
বারানসী
মগধ
অবন্তী
শুক্তিমতী নদী
রাজগৃহ
চম্পা
আনর্ত
অঙ্গ
কিরাত
ভৃগুকচ্ছ
সুহ্ম
সুরাষ্ট্র
নর্মদা নদী
পায়োষ্ণী নদী
তাম্রলিপ্তি
তাপ্তী নদী
বিদর্ভ
মহানদী নদী
মূলক
সুবর্ণরেখা নদী
তেল নদী
বৈতরনী নদী
কলিঙ্গ
ঋষিকুল্যা নদী
ইন্দ্রাবতী নদী
ভীমরথী নদী
মঞ্জিরা নদী
অশ্মক
গোদাবরী নদী
লাঙ্গুলিনী নদী
অন্ধ্র
কৃষ্ণা নদী

বুদ্ধির জোরে, যদিও জরাসন্ধের উপর্যুপরি চাপে কৃষ্ণকে সবান্ধবে মথুরা ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয় দ্বারকায় এবং এটাও একটা বুদ্ধি।

লক্ষণীয়, আমরা হরিবংশে জরাসন্ধ-বাহিনীর মধ্যে পাঞ্চালদেরও নাম দেখেছি—সেই পাঞ্চালেরা, যাঁরা কুরুবংশেরই শাখা এবং যাঁদের সঙ্গে কুরুদের বিবাদ-বিসংবাদ লেগেই ছিল কুরুর বাবা সংবরণের সময় থেকে। দ্রুপদ জরাসন্ধের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন নিজেকে বশংবদ দেখানোর জন্য, ঠিক যেমন দুর্যোধনও পৃথকভাবে যোগ দিয়েছিলেন একই কারণে। মহাভারতে দেখছি—কৃষ্ণ জরাসন্ধ পক্ষপাতীদের নাম করার সময় যে নামগুলি করেছেন, সে নামগুলি মিলে যাচ্ছে হরিবংশের বর্ণনার সঙ্গে। সেখানে পাঞ্চালদের নাম নেই। কিন্তু এই সঙ্গে কৃষ্ণ আবার অনেকগুলি রাজার নাম করেন যাঁরা, জরাসন্ধের ভয়ে এদিক-ওদিক পালিয়ে যাচ্ছিলেন। এদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ পাঞ্চালের লোকেরাও আছে—দক্ষিণা যে চ পাঞ্চালাঃ। মনে রাখবেন দ্রুপদের বাবা পৃষত কিন্তু ছিলেন উত্তর পাঞ্চালের রাজা এবং পরবর্তী কালে দ্রুপদও তাই। ওলটপালট যা হয়েছে তা পরের কথা। মথুরাবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে জরাসন্ধের নৈতিক জয় হয়েছিল, এবং হরিবংশ যতই বলুন জরাসন্ধের বাহিনী যথেষ্ট মার খেয়েছেন কৃষ্ণ বলরামের হাতে, আমরা তা বিশ্বাস করি না। হ্যাঁ, কিছু খুচখাচ ক্ষতি তাঁরা অবশ্যই করতে পেরেছিলেন কিন্তু জরাসন্ধের তাতে কিছুই হয়নি। দিনের পর দিন বার বার জরাসন্ধের মথুরা অবরোধ করার ফল হয়েছিল এই যে, কৃষ্ণ কংসহন্তা নায়ক হয়েও বড়ো ঝামেলার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। সভাপর্বে রাজসূয় যজ্ঞের পূর্বকল্পে কৃষ্ণ সে কথা স্বীকারও করেছেন। কৃষ্ণ বলেছেন যে, তাঁরা জরাসন্ধের ভয়ে আত্মীয়স্বজন নিয়ে আরও পশ্চিমে পালিয়ে গেছেন—পলায়ামো ভয়াৎ তস্য সসুতজ্ঞাতিবান্ধবাঃ।[৫২] কিন্তু জরাসন্ধের ভয়ে পলাতক কৃষ্ণের হতাশা যেমন কম ছিল না, তেমনি তাঁর বুদ্ধিও কম ছিল না। তখনকার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের সমস্ত কুশীলবদের চরিত্র তিনি এমন সুন্দর পাঠ করে ফেলেছিলেন যে, তাঁর সামনে দরজা খুলে গেল, দরজা খুলে গেল আরেক রাজনৈতিক উত্থানের।

॥ ৬ ॥

পণ্ডিত-সাধারণের মত অনুসারে পঞ্চ পাণ্ডবেরাও কৌরব। মহাভারতের বহু জায়গায় তাঁদের কৌরব বলে ডাকাও হয়েছে। কুরুনন্দন কুরুকুলাত্মজ, কুরুভূষণ এসব উপাধিতে পাণ্ডবেরাও ভূষিত হয়েছেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও শুধু দুর্যোধনেরা বা ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরাই কৌরব নামে সমধিক পরিচিত। পঞ্চপাণ্ডবের পিতা পাণ্ডু রাজা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ছেলেদের কেন সাধারণভাবেই কৌরব নাম জোটেনি—এটা একটা প্রশ্ন। ধৃতরাষ্ট্র রাজা না হলেও কিংবা নামে রাজা হলেও, তাঁর ছেলেদের প্রধান পরিচয় কিন্তু ধার্তরাষ্ট্র নয়, কৌরবই। অন্য দিকে পাণ্ডু রাজা হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র পিতৃপরিচয়েই তাঁরা পাণ্ডব নামে সমধিক পরিচিত হলেন কেন—এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে ভারতবর্ষের জাতি-তত্ত্ব গবেষণার প্রথম উন্মেষে শ্রীযুক্ত এইচ.এইচ. রিজলে, ডঃ হর্নেল এবং গ্রিয়ার্সনের মতাদর্শের ওপর

ভিত্তি করে বলেছিলেন যে, উত্তর ভারতের মানুষেরা মূলত ইন্দো দ্রাবিড়ীয় প্রজাতির। তাঁরা মনে করেন, ভারতবর্ষে প্রথম আর্য সভ্যতা বিকাশের পর তাঁরা যখন পঞ্জাব অঞ্চল থেকে আরম্ভ করে বিহারের গণ্ডকী পর্যন্ত আর্যায়িত করে ফেলেন, সেই সময়ে আর্যদের দ্বিতীয় আরেকটি দল ভারতবর্ষের ভিতরে প্রবেশ করে। এরা কিন্তু আর্যদের পুরা পরিচিত উত্তর-পশ্চিমের দুয়োর দিয়ে ভারতবর্ষে ঢোকেনি, ঢুকেছে অন্য পথে গিলগিট এবং চিত্রল হয়ে। রিজলেদের মতে আর্যদের এই দলটি নিদারুণ পথকষ্টের সম্ভাবনায় নিজেদের সঙ্গে স্ত্রীলোক বেশি আনেনি এবং তত্রস্থ দ্রাবিড়-জাতীয়া মহিলা, যারা পরে আর্যদের চাপে আরও দক্ষিণে চলে গিয়েছিল, সেই দ্রাবিড়ীয়দের বিয়ে করেই সুখে-দুঃখে দিন কাটিয়েছে।

ভারতবর্ষের অনেক পণ্ডিতেরাই এই মত একটু অদলবদল করে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু মজা হল তাঁদের দৃষ্টিতে—আর্যদের এই দ্বিতীয় দলটির সমস্ত গতিবিধির দায় গিয়ে পড়েছে পাণ্ডবদের ওপর। তাঁরা বলেন, আর্যদের এই দ্বিতীয় দলটির ভাষা, ধর্ম কিংবা জাতি তাঁদের প্রথম দলের জাতভাইদের থেকে আলাদা নয়, অর্থাৎ কিনা যাঁরা পঞ্জাব থেকে আরম্ভ করে উত্তরোত্তর পুব দিকে ছড়িয়ে পড়েছে তাঁদের সঙ্গে এই দ্বিতীয় দলের আর্যরা কোনভাবেই অসংবদ্ধ নয়, কিন্তু তাঁরা সভ্যতার দিক দিয়ে তাঁদের পূর্বতনদের মত উজ্জ্বল ছিলেন না, উল্টো দিকে তাঁদের গায়ের জোর, স্ত্রীলোক-সংক্রান্ত শৈথিল্য এবং সমধিক সরলতা কেমন যেন একটু পাশবিক আভাস দেয়। পাণ্ডিতেরা অনেকে বলেন, এই দ্বিতীয় দলের আর্যরাই হল পাণ্ডব। এটা অবশ্য ঠিক যে, মহাভারতের মতেও, পাণ্ডবেরা অনেকানেক ব্রাহ্মণ সহযোগে হিমালয় অঞ্চল থেকে হস্তিনাপুরে উদয় হন। আপনারা বলবেন—পাণ্ডু হস্তিনাপুরের রাজ্যপাট সামলিয়ে 'নিত্যারণ্য' হিমালয়ের গিরিপৃষ্ঠে 'মহাশালবনের' ভিতর একটা সাময়িক অরণ্যনিবাস বানিয়ে দুই বৌয়ের সঙ্গে একটু সুখে কাল কাটাচ্ছেন, আর মুখপোড়া পণ্ডিতদের ওমনি মনে হল—পাণ্ডবেরা সব হিমালয়ের লোক? পণ্ডিতেরা কাঁচুমাচু করে বলবেন—কি আর করা যাবে, এ কথা তো মহাভারতের প্রমাণেই ঠিক যে, পাণ্ডুর ছেলেগুলি হয়েছিল সব ওই হিমালয়ের পৃষ্ঠদেশেই এবং তাঁর সন্তানগুলি কেউই তাঁর নিজের নয়, সবই অন্যের। কারও নাম ধর্ম, কারও নাম বায়ু, কারও নাম ইন্দ্র অর্থাৎ সন্তানগুলি সবই ভগবানের দেওয়া। এই ভগবদ্দত্ত সন্তানদের নিয়ে যে হাজার হাজার বামুন রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে দেখা করে পাণ্ডবদের পুত্রতা বোঝাতে এলেন, হস্তিনাপুরবাসীরা জন্মে তাঁদের দেখেনি কোন দিন। তাদের বুঝি আশ্চর্যও লেগেছিল কিছু। নইলে রাজবাড়িতে নতুন মানুষ ঢুকলে, সাধারণ বালক-বৃদ্ধ-নারীর ভিড় জমতে পারে কিন্তু এখানে তো দেখছি হস্তিনাপুরের সমাজমুখ্য ব্রাহ্মণেরা পর্যন্ত তাঁদের বৌদের নিয়ে রঙ্গ দেখতে এসেছেন, অন্যান্য ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র পুরবাসীদের তো কথাই নেই। তাও যদি বুঝতাম, রাজা পাণ্ডু মারা গেছেন, তাঁর জন্য শোক প্রকট করার জন্য দলে দলে সবাই এল। তা তো নয়, সবাই এসেছে হিমালয়ের পাহাড়ী তপস্বী দেখতে—সদারাঃ তাপসান্ দ্রষ্টুং নির্যযুঃ পুরবাসিনঃ।[৫৩] পণ্ডিতেরা সন্দেহ করেন—সমস্ত পুরবাসীদের এই দৃষ্টি হল সন্দেহের দৃষ্টি, অনভিমত আগন্তুকের ওপর যা দৃষ্টি হওয়া উচিত, এও তাই।

তারও ওপরে কথা হল, ভাষা, ধর্ম, আচার-আচরণে এক বলেই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের সাময়িকভাবে মেনে নিয়েছেন বটে, কিন্তু তারপর থেকেই তিনি তাঁদের প্রতি শত্রুতা আচরণ করেছেন। তার পরের ইতিহাস সবারই জানা। মহামতি রিজলে হয়তো তাঁর 'cultured inhabitants of the middle land'-এর থেকে এই পাণ্ডবীয় আর্য দলকে regarded as comparative barbarians বলবেন ; অন্য পণ্ডিতেরাও হয়তো দ্রৌপদীর একার সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডবদের বিয়ের প্রশ্ন তুলে, ভীমের হাতে দুঃশাসনের রক্তপানের প্রশ্ন তুলে সাধারণ মানুষকে ঝামেলায় ফেলবেন, কিন্তু আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অত শত কঠিনতর প্রশ্নে যাব না, আমরা সাধারণ মানের রাজনীতির দিকে যাব।

আমরা বলব, পাণ্ডবেরা আর্যসমাজের দ্বিতীয় দলই হোন, কিংবা হোন হিমালয়বাসী ধর্মঠাকুর, ইন্দ্রঠাকুর কিংবা অন্য কোন বড় মানুষের পো, মনে রাখতে হবে এঁদের বাবা মারা গিয়েছিলেন, যে বাবা ছিলেন পূর্বে রাজা। রাজা হওয়ার সমস্ত গুণ থাকতেও যে বড় ভাই শুধু নিশ্চক্ষুতার কারণে রাজ্য পেলেন না—ধৃতরাষ্ট্রস্তু অচক্ষুষ্ট্বাদ রাজ্যং ন প্রত্যপদ্যত, সেই ধৃতরাষ্ট্র আপন ভাইয়ের ঔরসে জাত নয়—এমন ছেলেদের পাত্তা দেবেন কেন, তাঁর ছেলেরাই বা তা মানবে কেন ? কিন্তু পাণ্ডবদের সামনে সমস্ত রাজবিরুদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা পথ কেটে নিতে পারলেন শুধু দুটি কারণে। এক ধৃতরাষ্ট্র যদি খুব অল্প বয়সেই পাণ্ডবদের মেরে ফেলতে পারতেন, তাহলেও কথা ছিল। অথচ তিনি তা না করে তাঁদের অস্ত্র-শস্ত্রের শিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়ার সময় দিয়েছেন। সেটা কৌরবসভার বড় মানুষের চাপেই হোক, কিংবা জনগণের চাপে, কিন্তু এই তাঁর প্রথম ভুল। কিন্তু দ্বিতীয় কারণটি বলার আগেই আমাদের একবার পাঞ্চালে যেতে হবে, যে পাঞ্চালেরা চিরকাল কুরু-বিরোধী।

হ্যাঁ, দ্রোণাচার্যও এই কুরু-পাঞ্চালদের চিরন্তন বিরোধের কথা ভালভাবেই জানতেন এবং সেই বিরোধের আগুনে ঘৃতাহুতি দিতেই তিনি এসেছিলেন হস্তিনাপুরে। কথাটা আরেকটু পরিষ্কার করে বলি। দ্রোণ কিন্তু ব্রাহ্মণ এবং তিনি ভরদ্বাজের ছেলে। পাঠকের মনে আছে নিশ্চয়ই যে, দুষ্যন্ত-পুত্র মহারাজ-চক্রবর্তী ভরতরাজার বংশকর কোন পুত্র ছিল না, এবং এই ভরদ্বাজের ছেলেই, যাকে আমরা পূর্বে বিতথ ভরদ্বাজ বলেছি, তিনিই কুরুকুলে রাজা হয়েছিলেন। ঠিক কথা, এ ভরদ্বাজ, সে ভরদ্বাজ নাও হতে পারে, কারণ কোথায় ভরত রাজার সময় আর কোথায় দ্রোণাচার্য। কিন্তু বামুনদের মধ্যে গোত্র বলে একটা কথা আছে, ইনি অঙ্গিরস গোত্রের দ্বিতীয় কোন ভরদ্বাজ। এই ভরদ্বাজও কম লোক কিছু নন, গঙ্গাদ্বারে বসতি করে ইনিও তপস্যা করছিলেন। তপঃশ্রান্ত মুনি একদিন দুপুরবেলায় নাইতে যাচ্ছেন গঙ্গায়, এমন সময় গঙ্গার তীরভূমিতে দেখতে পেলেন অপ্সরা ঘৃতাচীকে (পাঠক ! আবার সেই অপ্সরা, স্বর্গবেশ্যা !)। ঘৃতাচীও তখনই নদী থেকে সদ্য স্নান করেই উঠেছিল এবং কাপড় বদলাচ্ছিল। স্বর্গবেশ্যা অপ্সরা ইন্দ্রলোকের প্রখ্যাতা নর্তকী রমণীর একজন, তার চলনে নটন, বলনে গান, কাজেই দেখামাত্রই ভরদ্বাজের মনে হয়েছে ঘৃতাচী বুঝি আপ্লুতাঙ্গী। আসলে স্বর্গবেশ্যার ভাবগতিকেই যে আপ্লুতি থাকে, তা মহর্ষি ভরদ্বাজ বোঝেননি। রূপযৌবনে রমণী আপনিই 'মদালসা', 'মদদৃপ্তা' হয়, তাও ভরদ্বাজ

বোঝেননি। কিন্তু এত দেখেও ভরদ্বাজের ধৈর্য থাকত—আমরা জানি, থাকত। কিন্তু অপূর্ব যৌবনবতী যখন ভরদ্বাজের অজান্তেই তার নটনের ভঙ্গিতে রিক্ত নদীতীরে কাপড় বদলাতে শুরু করল এবং তার ওপরে জুটল এলোমেলা হাওয়ার অভিসন্ধি, তখনই স্বর্গসুন্দরীর দেহ ক্বচিদ্ উন্মোচিত ক্বচিদ্ অমোচিত এক বিধ্বংসী ব্যঞ্জনা নিয়ে ধরা দিল ভরদ্বাজের সামনে। মুনি আর থাকতে পারলেন না—ব্যাপকৃষ্টাম্বরাং দৃষ্ট্বা—তাঁর তেজ স্খলিত হল। তেজ স্খলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুনি সেটি আর মাটিতে পড়তে দিলেন না, ধরে ফেললেন চাল মাপার কৌটোর মত একটা পাত্রে—ততো'স্য রেতঃ চস্কন্দ তদ্ ঋষি দ্রোণ আদধে। ওই রকম একটা পাত্রের নাম দ্রোণ বলেই সেই পাত্রসম্ভব পুত্রের নাম—দ্রোণ। মনে রাখবেন অপ্সরা দেখার ফলেই হোক, আর যে ভাবেই হোক, দ্রোণ কিন্তু ভরদ্বাজ গোত্রের ব্রাহ্মণ, এবং ভরদ্বাজদের সঙ্গে কুরুদের পূর্বসম্বন্ধ আছে। এই ভরদ্বাজ অবশ্য বন্ধু হিসাবে পেয়েছিলেন দ্রুপদের বাবা পাঞ্চাল রাজ পৃষতকে এবং পাঞ্চাল রাজ্যেই ছিল তাঁর আশ্রম।

পৃষত উত্তর পাঞ্চালের রাজা, তাঁর রাজধানী ছিল অহিচ্ছত্র বা ছত্রবতী, এখনকার বেরিলিতে আয়োঁলার কাছে রামনগর অঞ্চল। দক্ষিণ পাঞ্চালে উত্তর পাঞ্চালদেরই এক শাখাবংশ নীপদের রাজত্ব ছিল কিন্তু তাঁরা তত উল্লেখযোগ্য ছিলেন না, এঁদের রাজধানী ছিল কাম্পিল্য(কম্পিল্য),উত্তর প্রদেশে বদাউঁ ও ফরাক্কাবাদের মধ্যে একটা জায়গা। দ্রুপদ কিংবা দ্রুপদপিতা উত্তর পাঞ্চালের শাসক হলেও, দক্ষিণের ওপরেও হয়তো তাঁদের যথেষ্ট অধিকার ছিল, কেননা বৌদ্ধ গ্রন্থগুলিতে দেখা যায় যে উত্তর পাঞ্চালের রাজারা কখনও রাজসভা বসাচ্ছেন দক্ষিণ পাঞ্চালে আবার কখনও বা দক্ষিণ পাঞ্চালের রাজসভা বসছে উত্তর পাঞ্চালে। যাই হোক, মূলত এই উত্তর পাঞ্চালের অধিপতি পৃষতের ছেলে দ্রুপদ কিন্তু প্রায়ই যেতেন তাঁর পিতৃবন্ধু ভরদ্বাজের আশ্রমে এবং সেখানে তিনি বন্ধু পেয়ে গেলেন দ্রোণকে। বেশ কিছুদিন পরে রাজা পৃষত মারা গেলেন, দ্রুপদ রাজা হলেন উত্তর পাঞ্চালে। অন্যদিকে ভরদ্বাজও মারা গেলেন এবং দ্রোণের বাসনা হল বিয়ে করার ; তিনি কৃপাচার্যের ভগিনী কৃপীকে বিয়ে করলেন। কুরুবংশীয় শান্তনুর পালিতা কন্যা কৃপীকে বিয়ে করার ফলে দ্রোণ কিন্তু কুরুবংশীয়দের আরও কাছাকাছি এলেন, কারণ তাঁর শালা কৃপ তো বহুকালই হস্তিনাপুরবাসী।

অনেকে ধারণা করেন যে, বাল্যকালে বন্ধু থাকার সময় দ্রুপদ বুঝি দ্রোণকে কথা দিয়েছিলেন—ভবিষ্যতে রাজ্যের অর্ধাংশ দেবেন বলে। এমন কোন প্রতিশ্রুতির কথা মহাভারতে নেই। বরঞ্চ উল্টে বলব—দ্রোণাচার্য বিয়ে করার পর থেকে পুত্র-পরিবারের জন্য অকারণে অর্থলোলুপ হয়ে উঠলেন, টাকাপয়সাই হল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। আমাদের ধারণা, তিনি যে ব্রাহ্মণ হয়েও ব্রাহ্মণের বৃত্তি গ্রহণ না করে, প্রখর চাতুর্যের সঙ্গে অস্ত্রবিদ্যা শিখেছিলেন সেটাও টাকা-পয়সা, সম্পদের লোভেই। দ্রোণাচার্যের এই লোভ, অর্থগৃধ্নুতা অপরের কাছে অপ্রকাশিত থাকেনি। ভাবতে পারেন, ক্ষত্রিয়ান্তক পরশুরাম যখন সব ছেড়ে-ছুড়ে বনে চলে যাচ্ছেন, সেই সময় তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হন দ্রোণ। দ্রোণ টাকা-পয়সার লোভেই পরশুরামের কাছে গিয়েছিলেন, অস্ত্র-জিজ্ঞাসু হয়ে

নয়। তিনি শুনেছিলেন—পরশুরাম তাঁর জমানো টাকা পয়সা সবাইকে দিয়ে চলে যাচ্ছেন—দ্রোণো'পি রামং শুশ্রাব দিৎসন্তং বসু সর্বশঃ। দানের খবর শুনেই দ্রোণ সেখানে ছুটেছেন ধনের লোভে। নিজের আঙ্গিরস কুল, ভরদ্বাজ-গোত্র নিবেদন করার পর পরশুরাম যখন তাঁকে 'দ্বিজশ্রেষ্ঠ' বলে স্বাগত জানাচ্ছেন, সেই সময়ে দ্রোণাচার্য কিন্তু আর 'যদৃচ্ছালাভ সন্তুষ্ট' ব্রাহ্মণ নন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! কি চাই—এইরকম একটা পরশুরামী জিজ্ঞাসায় দ্রোণাচার্য বললেন—আমি টাকা চাই, প্রচুর টাকা চাই—অহং ধনম্ অনন্তং হি প্রার্থয়ে বিপুল ব্রত।[৫৪] পরশুরাম লজ্জিত হয়ে বললেন—আমার যা ছিল টাকা-পয়সা সব তো আমি ব্রাহ্মণদের দিয়ে দিয়েছি, বিভিন্ন ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করে যা রাজ্যপাট পেয়েছিলাম, তাও দিয়ে দিয়েছি। এখন থাকার মধ্যে আছে আমার এই দেহ আর আছে কিছু মোক্ষম অস্ত্র—তা তুমি কোনটা চাও বল। দ্রোণ বললেন—আমি অস্ত্র চাই। সত্যিই তো পরশুরামের জীর্ণ দেহখানি দিয়ে কি করবেন দ্রোণ ! বরঞ্চ পরশুরামের সংগ্রহে যে বিশাল অস্ত্র-রাজি আছে, তাই পেলেই দ্রোণের লাভ। পরশুরাম তাঁর সমস্ত মহার্ঘ অস্ত্র এবং তার প্রযুক্তি-কৌশল—সব দ্রোণকে দিলেন এবং শিখিয়ে দিলেন। পরশুরাম ছিলেন সেকালের অস্ত্রগুরুদের শ্রেষ্ঠ। তাঁরই সমস্ত অস্ত্র এবং তাঁর কাছেই সে সবের অন্ধিসন্ধি জেনে দ্রোণ উপস্থিত হলেন দ্রুপদের কাছে।

উদ্দেশ্যটা বেশ বোঝা যায়। কারণ দ্রুপদ ঘাসে মুখ দিয়ে চলেন না, তিনি রাজা। মহাভারতকার ব্রাহ্মণ হিসেবে দ্রোণকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন দ্রুপদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে। দ্রোণ নাকি দ্রুপদের সভায় উপস্থিত হয়েই 'বন্ধু' সম্বোধন করেছিলেন এবং ঐশ্বর্যমদমত্ততার কারণেই নাকি দ্রুপদ তাঁকে হঠাৎই অপমান করেন। কিন্তু আমরা জানি, দ্রুপদের এই ক্রোধ কোন আপাতিক ঘটনা নয়। তিনি দ্রোণের উদ্দেশ্য জানতেন, বিশেষত পরশুরামের কাছে দ্রোণের প্রার্থনা এবং শেষমেশ তাঁর কাছ থেকে বিশাল অস্ত্রসম্ভার নিয়ে ফিরে আসাটাও দ্রুপদ আমাদের মতই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করেছেন। দ্রুপদ দ্রোণাচার্যের সখা-সম্বোধন শোনামাত্রই বন্ধুত্ব প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন—তোমার মত লোকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব কিসের ? বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে। ধনীর সঙ্গে দরিদ্রের, বীরের সঙ্গে হিজড়ের বন্ধুত্ব হয় নাকি ? তোমার এত বন্ধু-বন্ধু করার কিচ্ছু নেই—সখিপূর্বং কিমিষ্যতে। এরকম ভেদে বন্ধুত্ব হয় না। দ্রুপদের এই কথা শোনার পর নিরপেক্ষ বক্তা বৈশম্পায়ন দ্রোণের বিশেষণ দিয়েছেন 'ভরদ্বাজ' বলে। কথাটা অর্থবহ। দ্রুপদের কথা শুনে মুহূর্তমাত্র চিন্তা করে ভরদ্বাজ দ্রোণ পাঞ্চাল দ্রুপদের ওপর প্রতিহিংসা নেওয়ার জন্যই উপস্থিত হলেন কুরুমুখ্যদের নগরী 'নাগসহায়' অর্থাৎ হস্তিনাপুরে—স বিনিশ্চিত্য মনসা পাঞ্চাল্যং প্রতিবুদ্ধিমান্।[৫৫] হস্তিনাপুর ভরদ্বাজদের পুরোনো জায়গা।

মহামতি অনন্তলাল ঠাকুরের সঙ্গে আলোচনা কালে একবার তাঁকে বলতে শুনেছিলাম যে, এই দ্রোণাচার্য একেবারে ব্রাহ্মণবেশী চণ্ডাল এবং কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের জন্য তিনিই মূলত দায়ী। কথাটা একেবারে হাল্কা চালে বলা হয়েছিল বলেই হয়তো সাধারণ মৌখিকতার দায় আসবে এই ভাষায়, কিন্তু কথাটা মোটেই মিথ্যে নয়। দ্রোণাচার্য তাঁর অস্ত্রবিদ্যার ইন্দ্রজালে কুরুকুমারদের মুগ্ধ করে কুরু রাজসভায় ঢুকে পড়লে এবং ছেলেদের অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষিত করে শোধ নিতে

পাঠালেন দ্রুপদের ওপর। এটাই নাকি হবে গুরুদক্ষিণা। কৌরব-পাণ্ডবেরা একসঙ্গে উত্তর পাঞ্চালে চললেন দ্রুপদকে মজা দেখাতে এবং এই বাহিনীতে কর্ণও ছিলেন, তিনি তখন অঙ্গ দেশের রাজা হয়ে গেছেন। দুর্ভাগ্যবশত মূল কুরুকুমারেরা দ্রুপদকে কিছুই করতে পারলেন না, কারণ অর্জুনের অস্ত্রশিক্ষার চরম বিন্দুটি এই যুদ্ধের মধ্যেই নিহিত ছিল। অর্জুন দ্রুপদকে নাকাল করে জীবিত ধরে ফেললেন।

পরাজিতের ওপর বিজয়ীর পরাক্রম বেড়ে যায়, এই নীতিতেই মহাবলী ভীমসেন দ্রুপদের পুত্র-মিত্র এবং পাঞ্চাল বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করার জন্য এগোচ্ছিলেন। কুরুক্ষেত্রের ভাবী নায়ক অর্জুন কিন্তু এই মুহূর্তে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে থামিয়ে দিলেন ভীমকে। অর্জুন তাঁর বিখ্যাত পূর্বজদের স্মরণ করে বললেন—দাদা ! মহারাজ দ্রুপদ মহান কুরুবীরেদের সঙ্গে কৌলিক সম্বন্ধে সম্পর্কিত, তাঁর সেনাবাহিনীকে পর্যুদস্ত করার কোন প্রয়োজন নেই আমাদের, তুমি শুধু গুরুদক্ষিণার কথা চিন্তা কর এবং সে কাজ মহারাজা দ্রুপদকে ধরার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়েছে। ভীম বিরত হলেন এবং দ্রুপদকে নিয়ে আসা হল দ্রোণাচার্যের কাছে। দ্রোণ দ্রুপদের পুরনো পরিহাস ফিরিয়ে দিয়ে বললেন—তোমার রাজ্য এখন বিমর্দিত, তুমিও জীবন্তই তোমার শত্রুর বশ, এখন কি বন্ধু বলে মানবে আমাকে—সখিপূর্বং কিমিয্যতে ? দ্রোণাচার্য হঠাৎ বন্দনীয় ব্রাহ্মণ্য সংস্কার স্মরণ করে বামনাই করে বললেন—আমরা বামুন মানুষ, ক্ষমাই আমাদের সব। তবে কিনা রাজার সঙ্গে সমানে সমানে রাজা না হলে তো বন্ধুত্ব হয় না, তাই তোমার অর্ধেক রাজ্য আমার,অন্য অর্ধেক তোমার। তবে তুমি রাজা হবে দক্ষিণ পাঞ্চালে, ভাগীরথীর দক্ষিণ পারে আর আমি রাজা হব উত্তর পাঞ্চালে।

দ্রুপদ মুখে আপাতবন্ধুত্বের প্রলেপ মাখিয়ে দ্রোণের প্রস্তাব মেনে নিলেন। দ্রুপদ তাঁর কথামত এতকালের পিতৃ-পিতামহের রাজ্য উত্তর পাঞ্চাল ছেড়ে দিয়ে, এতকালের সাধের রাজধানী অহিচ্ছত্র ত্যাগ করে গঙ্গার দক্ষিণ ধারে 'মাকন্দী' বলে একটি জায়গায় বসতি গড়লেন। রাজধানী হিসেবে দক্ষিণ পাঞ্চালের কাম্পিল্য নামে নগরীটি দ্রুপদের অধিকারে এল ; তাঁর রাজ্যের দক্ষিণ সীমা দাঁড়াল চর্মন্বতী নদী অর্থাৎ চম্বল পর্যন্ত। দ্রোণ অধিকার করে নিলেন এতকালের সমৃদ্ধ উত্তর পাঞ্চাল, আর এতকালের প্রতিষ্ঠিত রাজধানী অহিচ্ছত্র। অহিচ্ছত্রের ওপর দ্রোণের লোভ ছিল, গুরুদক্ষিণার 'বেতন' হিসেবে দ্রুপদের রাজধানী শুদ্ধু রাজ্যটিই তিনি চেয়েছিলেন। অন্যদিকে দ্রুপদ কাম্পিল্যে যা পেলেন, পেলেন। কিন্তু 'মাকন্দী' জায়গাটা ছিল একটি গ্রামমাত্র, বৌদ্ধগ্রন্থ মজ্‌ঝিম নিকায়ে ওই 'মাগন্দী' গ্রামে বুদ্ধকে অনেকবার দেখা গেছে এবং সেটা শুধু একটা গ্রামই। দ্রুপদের রাজ্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্যের বিপুল লক্ষ্মীলাভ ঘটল, যথেচ্ছ ধনসম্পত্তিও তিনি পেলেন, তেমনি অন্যদিকে দ্রুপদ প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলতে জ্বলতে— 'দীনমনা'—কেবলই বলবান পুত্রজন্মের অপেক্ষা করতে লাগলেন। যজ্ঞের আগুন, না প্রতিহিংসার আগুন ভগবান জানেন, কিন্তু আগুন থেকেই জন্মালেন অগ্নিবৎ ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং আগুনপানা দ্রৌপদী। তবে রাজনীতির চালে শুধু বলবান পুত্রজন্ম হলে কাজ

ফুরিয়ে যায় না, সুযোগ সন্ধানেরও প্রয়োজন, সৈন্য সংগ্রহেরও প্রয়োজন। দ্রুপদ তাই করছিলেন এবং অতি ক্ষিপ্র করছিলেন। ইতিমধ্যে পাণ্ডব-কৌরবের কোন্দল বেড়ে গেছে। ধনুর্বিদ্যায় অর্জুনের যেরকম অধিকার দেখা গিয়েছিল এবং মহাবলী ভীমসেন যেমন দুর্ধর্ষ হয়ে উঠছিলেন, তাতে ধৃতরাষ্ট্রের মনে শান্তি ছিল না। দুর্যোধন, কর্ণ এবং শকুনির মন্ত্রণায় ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের বারণাবতের জতুগৃহে পুড়িয়ে মারতে চাইলেন।

পাণ্ডবদের এই জতুগৃহের ছাই উড়িয়েই কিন্তু দুটি সুযোগসন্ধানী মানুষ অমূল্য রতনের সন্ধান পেলেন। একজন কৃষ্ণ, যিনি জরাসন্ধের ভয়ে পূর্বাহ্ণেই দ্বারকায় প্রস্থিত, অন্যজন দ্রুপদ, যিনি প্রতিহিংসায় জ্বলছেন এবং দ্রোণের অত্যাচারে দক্ষিণে প্রস্থিত। ব্যাপারটা একটু গুছিয়ে বলি। জতুগৃহে আগুন ধরানোর পরে এক মুহূর্তে খবর রটে গেল যে, পাণ্ডবেরা পুড়ে মরেছেন। সমস্ত রাজপুরুষের মধ্যে একমাত্র প্রখরবুদ্ধি মানুষ, যিনি এই খবরটা বিশ্বাস করেননি, তিনি কৃষ্ণ। আমাদের এই কথাটা ফাঁকা কোন বুলি নয়, হরিবংশের প্রমাণ দিয়ে পরিষ্কার জানাচ্ছি যে, কৃষ্ণ জতুগৃহে দাহ ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছিলেন বারণাবতে। যাদবদের মধ্যে তখন স্যমন্তক মণি এবং সুন্দরী সত্যভামার অধিকার নিয়ে বেশ গণ্ডগোল চলছিল। এই বিরাট ঝামেলার মধ্যেও কৃষ্ণ বারণাবতে এসেছিলেন এবং একটা লোকদেখানো শ্রাদ্ধক্রিয়াও করেছিলেন মৃত বলে শ্রুত পাণ্ডবদের উদ্দেশে। কিন্তু তিনি যে এই মৃত্যু ঘটনা বিশ্বাস করেননি তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল যে, শ্রাদ্ধ-তর্পণ সমাধা করেও কৃষ্ণ যদুবীর সাত্যকিকে লাগিয়ে গেলেন পাণ্ডবদের অস্থি সঞ্চয় করতে—কুল্যার্থে চাপি পাণ্ডূনাং ন্যযোজয়ৎ স সাত্যকিম্। কৃষ্ণ পাণ্ডবদের পেলেন না বটে, কিন্তু দুই সুযোগ-সন্ধানী একই জায়গায় ধরে ফেললেন পাণ্ডবদের এবং সেদিনটা ছিল দ্রৌপদীর স্বয়ংবর।

কৃষ্ণ যে এতদিন জরাসন্ধকে এবং তাঁর সম্মিলিত বাহিনীকে বিভিন্ন উপায়ে ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছেন, এতেই তাঁর প্রতিষ্ঠা তুঙ্গে উঠেছে। দ্রুপদের সভাতেও তিনি এখন মান্যগণ্য লোক। অন্যদিকে দ্রুপদের কথা বলি। অর্জুন ছেলেটাকে তাঁর পূর্বেই পছন্দ হয়েছিল। সে তাঁকে বন্দী করেছিল বটে, কিন্তু তাঁর ব্যবহার এবং একটিমাত্র স্পষ্ট বাক্য তাঁর মনে আছে।

তাঁর মনে আছে যে, যুদ্ধজয়ের মুহূর্তেও সমস্ত কুরুকুলের মুখ-উজ্জ্বল-করা এই অর্জুন ছেলেটি তাঁকে কোন অপমান করেনি। অল্পবয়সী ছেলে যুদ্ধে নিষ্ণাত ব্যক্তিকে পরাজিত করলে যেরকম প্রগল্‌ভ হয়ে ওঠে, অর্জুন তো তা হয়ইনি, উপরন্তু যুদ্ধজয়ের মুহূর্তেও সে তার আগুয়ান ভ্রাতাকে নিষেধ করেছে যাতে সে দ্রুপদকে অপমান না করে। সেই মুহূর্তেও অর্জুনের মনে আছে যে, কৌলিক সম্বন্ধ বিচারে দ্রুপদ কুরুবীরদের সম্মানার্হ—সম্বন্ধী কুরুবীরাণাং দ্রুপদো রাজসত্তমঃ।[৫৬] সেই থেকেই দ্রুপদ অর্জুনকে খুঁজছেন—এই ছেলেটিকে তাঁর চাই। মহাভারতকার স্পষ্ট বলেছেন—দ্রুপদ অর্জুনকে খুঁজছিলেন—সোঽন্বেষয়ানঃ কৌন্তেয়ম্ পাঞ্চাল্যো জনমেজয়। শুধু তাই নয় দ্রৌপদীর বিয়ের জন্য যে লক্ষ্যভেদের যন্ত্রখানি তিনি বানিয়েছিলেন—সেটাও অর্জুনের কথা মনে রেখেই। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল দ্রৌপদীর সঙ্গে অর্জুনের

বিয়ে দেওয়া—যজ্ঞসেনস্য কামস্তু পাণ্ডবায় কিরীটিনে। কৃষ্ণাং দদ্যামিতি—কিন্তু কোথাও তিনি এ কথা প্রকাশ করেননি, ন চৈতদ্ বিবৃণোতি সঃ।[৫৭] কেন প্রকাশ করেননি, তা আমরা জানি। ওইখানেই রাজনীতি। প্রথমত মনের এই ইচ্ছা প্রকাশ করলে স্বয়ংবরসভার রীতি ব্যাহত হত, দ্বিতীয়ত এই মন্ত্রগুপ্তির মধ্যেই দ্রোণ তথা তাঁর আশ্রয়দাতা কুরুদের প্রতি তাঁর প্রতিহিংসার বাসনা নিহিত রয়েছে।

অর্জুন ধরা পড়লেন। প্রথমে কৃষ্ণের কাছে ধরা পড়লেন। পাণ্ডবদের কথা শুনে শুনেই তাঁদের দেহাকৃতি মুখস্থ হয়ে গেছে কৃষ্ণের। দ্রুপদের রাজসভায় সমবেত রাজবৃন্দের মধ্যে তিনি দাদা বলরামকে পরিষ্কার চিনিয়ে দিলেন—ইনি ভীম, ইনি যুধিষ্ঠির, ইনি অর্জুন ইত্যাদি। সেকালের দিনের রাজারা নিজেরা পরস্পরবিরোধী হলেও স্বয়ংবর সভায় দেখা হওয়া মাত্রেই মারামারি করতেন না। জরাসন্ধ, শিশুপাল, দন্তবক্র সবাই এই রাজসভায় এসেছিলেন, কিন্তু কেউই কৃষ্ণের সঙ্গে মারামারি করেননি। জরাসন্ধ তখন বৃদ্ধ এবং লক্ষ্যভেদ করতে পারেননি বলে আগেই লজ্জায় স্বয়ংবর সভা ত্যাগ করেছেন। অন্যেরাও কেউ কিছু করতে পারলেন না। ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণের বেশে-থাকা অর্জুন জিতে নিলেন দ্রৌপদীকে। এবার সবার সঙ্গে যুদ্ধ লাগল এবং এবারও অর্জুন জিতলেন। কুন্তীপুত্রেরা যখন দ্রৌপদীকে নিয়ে সেই কুমোরের বাড়িতে উপস্থিত হলেন, তখন তাঁদের পেছন পেছন যিনি প্রথম সেই কুমোরপাড়ায় পৌঁছোলেন, তিনি কৃষ্ণ। এই তিনি প্রথম তাঁর আপন পিসি কুন্তীর ছেলেদের সঙ্গে মিলিত হলেন। বৈশম্পায়ন লিখেছেন—কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের পায়ে হাত দিয়ে বললেন—আমি কৃষ্ণ। কিরকম যুধিষ্ঠির, না, অজমীঢ় বংশের উত্তরপুরুষ যুধিষ্ঠির। ঠিক এই মুহূর্তে পুরাতন কুরুরাজ অজমীঢ়ের কথা স্মরণ করাটা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ অজমীঢ়ের থেকেই পাঞ্চাল বংশের শাখাটি বেরিয়েছে। কৃষ্ণ বললেন—ভাগ্যিস তোমরা জতুগৃহের আগুন থেকে বেঁচেছ, ভাগ্যিস ধৃতরাষ্ট্রের বদমায়েশ ছেলেগুলোর কূটকৌশল সফল হয়নি। কৃষ্ণ দুই পংক্তি কথা বলেছেন মাত্র, কিন্তু তার মধ্যেও তিনি ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের সম্বন্ধে উসকে দিয়েছেন পাণ্ডবদের, কারণ পাণ্ডবদের তাঁর দরকার।

কৃষ্ণের পর আরও একটি মানুষ পাণ্ডবদের খোঁজ করতে যান, তিনি দ্রুপদের ছেলে ধৃষ্টদ্যুম্ন। সারারাত ধরে কুমোরবাড়ির বেড়ার ধারে অন্ধকারে 'নিলীন' হয়ে রইলেন ধৃষ্টদ্যুম্ন; সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত ব্রাহ্মণবেশীদের খাওয়া-দাওয়া, ক্রিয়াকলাপ কথাবার্তা সব শুনে এসে জানালেন দ্রুপদকে। এক নিঃশ্বাসে দশটা প্রশ্ন করেও দ্রুপদ শেষ কথায় নির্জের বিশ্বাস ব্যক্ত করলেন—পাণ্ডুর ছেলেগুলি নিশ্চয় জতুগৃহের আগুন থেকে বেঁচে গেছে। ওদেরই মধ্যে ছোটটা, মানে অর্জুনই লক্ষ্যভেদ করে কৃষ্ণাকে জিতে নেয়নি তো? ধৃষ্টদ্যুম্ন পরিষ্কার জানালেন—আমারও মনে হয় তাই, বাবা। রাত্রিবেলা শুয়ে শুয়ে যে সব কথাবার্তা ওঁরা বলছিলেন তার কোনটাই—বৈশ্য, শূদ্র কিংবা ব্রাহ্মণের মত নয়। ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন—যা শুনেছি, ঠিকই, ওঁরা আগুন থেকে বেঁচে গেছেন মনে হয়।

কিন্তু মনে হলেই তো দ্রুপদের হবে না, তাঁর যে অর্জুনকেই চাই। অতএব পুরোহিতকে দিয়ে পাণ্ডবদের ঘরে খবর পাঠালেন দ্রুপদ, প্রায় নিশ্চিত ধারণায়

খবর পাঠালেন—রাজা পাণ্ডু ছিলেন আমার পরম প্রিয় সখা। আমার চিরকালের ইচ্ছে ছিল আমার মেয়েকে স্বয়ংবরে জিতে নিক অর্জুন—যদ্ অর্জুনো বৈ পৃথুদীর্ঘবাহু ধর্মেণ বিন্দেত সুতাং মমৈতাম্। কিন্তু যুধিষ্ঠির কিছুই ভাঙলেন না। পুরোহিতের কথা এড়িয়ে গেলেন। ভাবলেন, যা বলার সামনাসামনি দ্রুপদকে জানাব, এখন নয়। দ্রুপদের লোকেরা অর্জুনের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিধিবৎ বিবাহের উদ্যোগ করে পাঁচ ভাই পাণ্ডবদের এবং তাঁদের জননীকে নিয়ে যেতে এল। সবাই গেলেন এবং যুধিষ্ঠির প্রথমেই দ্রুপদকে আশ্বস্ত করে বললেন—আমরা পাণ্ডব, আপনি ঠিকই ধরেছেন এবং আপনার ইচ্ছে পূর্ণ হয়েছে। নিজেদের পরিচয় দেবার সঙ্গে সঙ্গেই যুধিষ্ঠির তাঁর দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলেছেন—এখন আপনি আমাদের গুরু এবং প্রধান ভরসা—ভবান্ হি গুরুরস্মাকং পরমঞ্চ পরায়ণম্।[৫৮]

এই লাইনটা অত্যন্ত জরুরী। দেখুন, বৈবাহিক সম্বন্ধে শ্বশুর অবশ্যই গুরুবৎ পূজ্য; কিন্তু শ্বশুরই 'প্রধান ভরসা—পরমঞ্চ পরায়ণম্'—এ কথা (এখনকার পুরুষ মানুষ ছাড়া!) কবে কোন্ পুরুষ মানুষ বলেছে? কিন্তু পাণ্ডবদের মত বীর পুরুষেরাও যে এমন একটা কথা বলে ফেললেন, তাও ভাবী শ্বশুরের সামনাসামনি, তাতে বুঝি এই বৈবাহিক সম্বন্ধ পুষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিও পুষ্ট হচ্ছে। বিয়ের কথার আগে দ্রুপদ যুধিষ্ঠিরের কাছে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা শুনেছেন—বারণাবতে আসা থেকে কেমন করে তাঁরা পালিয়েছেন—সব। যুধিষ্ঠিরের সব কথা শুনে দ্রুপদ সেই মুহূর্তে শুধু কুরুকুলপতি ধৃতরাষ্ট্রের নিন্দাই করেননি, সঙ্গে সঙ্গে যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস দিয়েছেন এবং শেষে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তাঁদের হৃতরাজ্য পুনরায় ফিরিয়ে দেবেন—প্রতিজজ্ঞে চ রাজ্যায় দ্রুপদো বদতাং বরঃ।

একসঙ্গে পাঁচ ভাইয়ের বিয়ের ঘটায় জয়কারে, হুলুধ্বনিতে, উপহারে রাজনীতির এই সন্ধিপর্বটুকু, আত্মনিবেদন এবং প্রতিজ্ঞার এই পারস্পরিক মুহূর্তটুকু হয়তো হারিয়ে যায়, কিন্তু তা আবার পরিষ্কার হয়ে ওঠে বুদ্ধিমতী কুন্তীর আশীর্বাদে। নববধূকে—যেমনটি চাঁদের কাছে রোহিণী, যেমনটি নলের কাছে দময়ন্তী, স্বামীদের কাছে তুমিও তেমনটি হও—এই কোমল আশীর্বাদের থেকেও—তুমি তোমার স্বামীকে আবার কুরুজাঙ্গল প্রভৃতি রাজ্যখণ্ডে অভিষেক কর—এই আশীর্বাদের ব্যঞ্জনা অনেক বেশি। কারণ এ ব্যঞ্জনা শুধু নববধূকে নয়, তাঁর পিতাকেও অন্তর্ভূত করেছে। একসঙ্গে পঞ্চ পাণ্ডবের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিয়ে নিয়ে দ্রুপদের কিঞ্চিৎ মানসিক ক্লেশ গেল, কিন্তু এ বিয়ের মধ্যেও যে ব্যাপারটা জোরদার হল, সেটা হল পাঁচ বীরপুরুষ প্রত্যেকেই দ্রৌপদীর মধ্যে আপন মনের মানুষ পেয়ে আরও এককাট্টা হলেন। কুরুসভায় পাণ্ডবদের মৃত্যু নিশ্চিন্ত ধৃতরাষ্ট্রের কাছে চরেরা খবর পৌঁছোল এইভাবে—

পাণ্ডবদের সঙ্গে দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণার বিয়ে হয়ে গেল, মহারাজ! যিনি সেই মৎস্যচক্ষু লক্ষ্যভেদ করলেন, তিনি সর্ববিজয়ী অর্জুন। যিনি শল্য থেকে আরম্ভ করে অনেককেই ভূমিসাৎ করেছেন, সবার মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছেন, তিনি ভীম। সে যাকগে, যাক। সবাই এখন পাণ্ডব এবং কুন্তীকে দেখে এমন করছে, যেন তাঁদের নতুন জন্ম হয়েছে; আর সেখানে উপস্থিত রাজারা সব আপনাদের

কি নিন্দাই না করছে, ধিক্কার দিচ্ছে কুলপতি ভীষ্মকে, নিন্দা করছে স্বর্গত মহারাজ কুরুর নাম ধরে—ধিক্‌কুর্বন্ত স্তদা ভীষ্মং ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ কৌরবম্ ।[৫৯]

প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্রের মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। ধৃতরাষ্ট্রের উদ্যমী পুত্রেরা, যাঁরা এতদিন নানারকম প্যাঁচ কষছিলেন পাণ্ডবদের বিতাড়িত করার জন্য, তাঁরা কিন্তু এবার শঙ্কিত হলেন, তাঁদের সমস্ত পরিকল্পনাও ভেস্তে গেল—ত্রস্তা ভগ্নসংকল্পাঃ। এই শঙ্কা কিন্তু পাণ্ডবদের জন্য যতখানি, তার চেয়ে অনেক বেশি পাণ্ডব-পাঞ্চাল জোটের জন্য। তাঁরা বুঝলেন—দ্রুপদ পাঞ্চালের সঙ্গে জোট বেঁধে পাণ্ডবদের শক্তি অনেক বেড়ে গেল, একেবারে মুক্ত পাণ্ডবাগ্নির শিখার ওপরে পাঞ্চাল দ্রুপদের ঘি পড়ল—মুক্তান্ হব্যভুজশ্চৈব সংযুক্তান্ দ্রুপদেন চ।[৬০] বার বার কৌরবদের মাথার মধ্যে কুচকাওয়াজ করতে থাকল কতগুলি যুদ্ধদুর্মদ ব্যক্তি—পাঁচ ভাই পাণ্ডবেরা, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী এবং দ্রুপদ নিজে। এঁদের দোষ কি ? না এঁরা সবাই যুদ্ধবিশারদ, শুধু তাই নয় সমস্ত রকমের যুদ্ধ জানেন এঁরা—সর্বযুদ্ধবিশারদান্।

ধৃতরাষ্ট্রের মনে যাই থাকুক, তিনি ভাল অভিনয় করতে পারেন। কাজেই পাণ্ডবদের প্রকাশ এবং বিদুরের হর্ষিত পরামর্শের সঙ্গে সঙ্গেই তিনিও যথেষ্ট পুলক প্রকাশ করলেন। কিন্তু সেই সু-অভিনীত পুলকের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বিদুরকে বুঝিয়ে দিলেন, যে, পাণ্ডবদের অত খাতির করার প্রয়োজন কি ? ধৃতরাষ্ট্র বললেন—পাণ্ডুর ছেলেরা তো আমারই ছেলে, কিন্তু আমার আরও একটু বেশি বুদ্ধি কাজ করছে—যথা চাভ্যধিকা বুদ্ধিঃ, সেটা হল—পাণ্ডবেরা নিজেরা বীর এবং এখন তারা বন্ধু পেয়েছে ! দ্রুপদের সম্বন্ধে অনেক শক্তিমান মানুষেরাও এখন পাণ্ডবদের সঙ্গে একজোট হবেন। ধৃতরাষ্ট্র এবারে কায়দা করে হতশ্রী পাণ্ডবদের উদ্দেশ করেই যেন বিদুরকে বললেন—পৃথিবীতে কোন রাজার যদি রাজ্যসম্পত্তি, ধনজন নাও থাকে—হতশ্রীরপি পার্থিবঃ, সেও যদি সবান্ধবে দ্রুপদকে বন্ধুস্থানে পায়, তাহলেই সে কৃতকৃত্য হবে। বুদ্ধিমান বিদুর পাণ্ডবদের কথাটা ব্যঞ্জনায় রেখে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—এ কথাটা আপনি বুঝলেই হবে, অন্তত শত বছর আপনার এই বুদ্ধিটুকু থাকুক, এই চাই—নিত্যংভবতু তে বুদ্ধিরেষা রাজন্ শতং সমাঃ।

ধৃতরাষ্ট্র কেন, কৌরব দুর্যোধন থেকে আরম্ভ করে সবাই বুঝেছেন—ব্যাপারটা কি হল ! ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের সামনে যাই বলুন, তিনি দুর্যোধন, কর্ণ এবং শকুনি—প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে বললেন কূট পরামর্শ করতে। পাণ্ডবদের শক্তিবৃদ্ধির খবর শুনে দুর্যোধনের মাথাটাই খারাপ হয়ে গেল। সুন্দরী কৃষ্ণাকে লাভ করে পাণ্ডবেরা সুখী হয়েছেন—এর থেকেও যেটা দুর্যোধনকে বেশি খোঁচাতে লাগল, সেটা হল পাণ্ডব-পাঞ্চালদের জোট। তিনি ভাবতে থাকলেন, যেন তেন প্রকারেণ কিভাবে পাণ্ডব-পাঞ্চালদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করা যায় ! এই বুদ্ধি থেকে তিনি যতগুলি সূত্র দিয়েছেন—সবগুলি সূত্রেরই উদ্দেশ্য এক—হয় পাণ্ডবদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি কর, নয় পাঞ্চালদের মধ্যে বিভেদ তৈরি কর। দুর্যোধন বললেন—আজই কতগুলি বিচক্ষণ এবং বিশ্বস্ত বামুন পাঠাব পাঞ্চালে, যারা কুন্তীর ছেলে এবং মাদ্রীর ছেলেদের মধ্যে খটাখটি লাগিয়ে দেবে। অথবা এক কাজ করুন, মহারাজ ! প্রচুর টাকা-পয়সা

খাইয়ে—মহদ্ভির্ধনসঞ্চয়ৈঃ—দ্রুপদের ছেলে ধৃষ্টদ্যুম্নটাকে কিংবা দ্রুপদের মন্ত্রীগুলিকে ভাঙিয়ে আনতে হবে। আবার এমনও করা যায় যে, 'উপায় নিপুণ' চরেরা গিয়ে পাঁচ ভাই পাণ্ডবদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের ঝগড়া লাগিয়ে দিক। তা ছাড়া তারা মন ভেঙে দিতে পারে একা কৃষ্ণার ; এক রমণীর অতগুলি স্বামী বলে এটা করাই সোজা—বহুত্বাৎ সুকরং হি তৎ।

জোট-ভাঙার জন্য অনেকগুলি উপায় বাতলানোর পরেও দুর্যোধনের মনে তৃপ্তি হল না। পাঞ্চালদের কিংবা পাণ্ডবদের আলাদা আলাদাভাবে বাধা দেওয়া হয়তো তিনি সম্ভব মনে করেন, কিন্তু একসঙ্গে নয়। তার ওপর পাণ্ডবদের ওপর যেহেতু তাঁর রাগ বেশি, দুর্যোধন তাই বললেন—অনেকগুলি বুদ্ধিমান উপায়জ্ঞ গুপ্তঘাতক পাঞ্চালে পাঠান, যারা ঝোপ বুঝে কোপ মারবে ভীমের ওপর, ওটাকেই মারা দরকার, ওটাই পালের গোদা—স হি তেষাং বলাধিকঃ। পাণ্ডবদের মধ্যে ভীমই হল সব চাইতে সাংঘাতিক, যেমন ওর গায়ের জোর, তেমনি ক্রূর—আর ওই হল পাণ্ডবদের আসল ভরসা। সত্যি কথা বলতে কি, কোন যুদ্ধের সময় অর্জুনকে জেতাই যাবে না, যদি তার পেছনে থাকে বৃকোদর ভীম।

এই যুদ্ধের পরীক্ষা দ্রৌপদীর স্বয়ংবরেই একবার হয়ে গেছে, অতএব দুর্যোধনের ধারণা—যদি কোনও রকমে ভীমকে মেরে ফেলা যায়, তাহলেই পাণ্ডবদের মনোবল একেবারে ভেঙে যাবে, এবং তারা জীবনে আর রাজ্য চাইবে না কিংবা রাজ্যের জন্য চেষ্টাও করবে না। দুর্যোধন আরও মনে করেন—ভীমকে যদি মেরে ফেলা যায়, তাহলে ওই অর্জুনটা কুরুপক্ষীয় কর্ণের নখেরও যুগ্যি নয়—রাধেয়স্য ন পাদভাক্।

ভীমের ওপর দুর্যোধনের পুরানো রাগ আছে। কিন্তু এত বলেও দুর্যোধন ভাবলেন, যদি ভীমকে কিছু না করা যায়! তার চাইতে, দুর্যোধন পুনরায় প্রস্তাব দিলেন—তার চাইতে এক একটা সুন্দরী মেয়েছেলে পাঠান, পাঁচ ভাইয়ের জন্য পাঁচটা। তারপর ওদের দেখে প্রত্যেকটি ভাই যখন মজে যাবে, তখন ভাবগতিক দেখে পাঞ্চালী কৃষ্ণা আপনিই বিরক্ত হয়ে ভেগে যাবে—প্রমদাভির্বিলোভ্যতাম্....ততঃ কৃষ্ণা বিরজ্যতাম্।[৬১] দুর্যোধনের শেষ প্রস্তাব হল—পাঠানো হোক কর্ণকে। সে তাদের সমাদর করে নিয়ে আসার পথে গুপ্তঘাতক দিয়ে গুম-খুন করাবে পাণ্ডবদের।

এতগুলি প্রস্তাব দেওয়ার পরেও দুর্যোধন কিন্তু সারাৎসার জানেন। তা হল—যতদিন না নতুন বন্ধু দ্রুপদের ওপর পাণ্ডবদের বিশ্বাস গাঢ় হয়, ততদিনই পাণ্ডবদের যদি বা কিছু করা যায়, যাবে। কিন্তু একবার যদি দ্রুপদের ওপর তাদের বিশ্বাস সুবিন্যস্ত হয়, তাহলে আর কিছুই করা যাবে না—তাবদেব হি তে শক্যা ন শক্যাস্তু ততঃ পরম্।

মনে রাখতে হবে দুর্যোধনের সমগ্র প্রস্তাবগুচ্ছের মধ্যে দুবার কর্ণের নাম করা হয়েছে। অতএব তাঁরই এবার কথা বলার হক। সত্যি কথা বলতে কি, কর্ণ দুর্যোধনের প্রত্যেকটি প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন এবং পরিশেষে সমস্ত ভাবনা-বিকল্পের অবসান ঘটিয়ে রাজনীতির সব চাইতে সরেস উপদেশটি তিনিই দিয়েছেন। কর্ণ বললেন— আমরা ধৃতরাষ্ট্রের মত মনে করি না যে, পাণ্ডবদের

সঙ্গে পাঞ্চালেরা যুক্ত হলেন, আমরা বলি, পাঞ্চালদের সঙ্গে পাণ্ডবেরা জুটলেন। মহাভারতের প্লটে পঞ্চ-পাণ্ডবের কাহিনীতে উৎকর্ষ বেশি আসে বলেই তাঁরা সব সময় প্রধান ভূমিকায়, আসলে কিন্তু মনে রাখতে হবে কুরু-পাঞ্চালদের ঝগড়া রীতিমত পুরানো ব্যাপার, সেই ঝগড়াতেই একপক্ষে শামিল হয়েছেন পাণ্ডবেরা, যাতে তাঁদেরও লাভ হয়েছে। পাঞ্চালদের সঙ্গে পাণ্ডবদের জুটে যাওয়ার ফলে যে নতুন রাজনীতির সূচনা হল এবং এই জোটের ফল যে কত গভীর হতে পারে তা ধৃতরাষ্ট্র যেমন খানিকটা বুঝেছিলেন, তার চেয়েও বেশি বুঝেছেন অঙ্গরাজ কর্ণ। দুর্যোধনের এক রাশ ছেলেমানুষি প্রস্তাব এক ঝাঁকাড়ে উড়িয়ে দিয়েছেন কর্ণ। বলেছেন—এ সব কিছুই সম্ভব নয়, পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করাও নয়, দ্রুপদ কিংবা তাঁর ছেলেদের টাকা খাওয়ানোও নয়, ভীমকে মারাও নয়, কিছুই নয়। কর্ণ বললেন—আমাদের এই মুহূর্তে একটাই করণীয় আছে—যতক্ষণে পাণ্ডবদের শিকড় আরও না গেড়ে যায় পাঞ্চালের মাটিতে, যাবন্ন কৃতমূলাস্তে—তার আগেই প্রহার দিতে হবে তাদের। যতক্ষণ আমাদের পক্ষই বেশি বলবান আছে এবং পাঞ্চালেরা আছে দুর্বল, তার মধ্যেই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে পাঞ্চালদের ওপর। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ যাতে আমাদের আগেই উদ্যমী হয়ে ঝাঁপিয়ে না পড়েন আমাদের ওপর, সেটাই এখন বিচার্য বিষয়। এবারে কর্ণ রাজনীতির মোক্ষম পর্যায়টি আগাম অনুমান করে দুর্যোধনকে বললেন—বন্ধু! পাণ্ডবদের রাজ্যলাভের জন্য যতক্ষণে না বৃষ্ণিবংশের প্রধান পুরুষ কৃষ্ণ তাঁর যাদব বাহিনী নিয়ে পাঞ্চাল ছেয়ে ফেলেন—যাবন্নায়াতি বার্ষ্ণেয়ঃ কর্ষন্ যাদববাহিনীম্—তার আগেই আমাদের আক্রমণ করতে হবে পাঞ্চাল। কারণ পাণ্ডবদের জন্য, তাঁদের রাজ্যলাভের জন্য কৃষ্ণের কিন্তু কিছুই অদেয় থাকবে না—না টাকা-পয়সা, না ভোগসুখ, না তাঁর নিজের রাজ্য—সব তিনি দিতে পারেন পাণ্ডবদের জন্য।[৬২]

কর্ণের এই অনুমান এবং পরামর্শ নিতান্তই বাস্তবানুগ এবং ধৃতরাষ্ট্র তাঁর এই মত মেনে নিয়ে অন্য কথা বলেছেন—অভিপূজ্য ততঃ পশ্চাৎ। কিন্তু কুরুসভায় ধৃতরাষ্ট্র নিজের মতেই সব সময় চলতে পারেননি, কারণ, কুরুসভার প্রবীণ মন্ত্রীদের মধ্যে পাণ্ডবদের বহু সমর্থক ছিলেন এবং বারণাবতের কুচক্রের সন্ধান এতদিনে তাঁরা পেয়ে গেছেন। কাজেই আপাতত তাঁদের তুষ্ট করতে বধূ সমেত পাণ্ডবদের রীতিমত আরতি করে নিয়ে আসতে হল এবং শুধু তাই নয়, তাঁদের রাজ্যার্ধও দিতে হল। ধৃতরাষ্ট্র পাঞ্চালে পাণ্ডবদের আনতে পাঠাবার সময়—কুরু-পাঞ্চাল ভাই ভাই—রব তুললেন—বৃদ্ধিং চ পরমাং ব্রূয়াৎ ত্বৎসংযোগোদ্ভবাং তথা।

মনে রাখা দরকার, ধৃতরাষ্ট্র যে বড়ো নিজের ইচ্ছায় এই 'কুরু-পাঞ্চাল ভাই ভাই' রব তুললেন, তা মোটেই নয়। বলা উচিত, তিনি কুরুসভায় প্রবীণ এবং শক্তিমানদের কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়েছেন। নইলে ভাবুন, যে দ্রোণাচার্য পাঞ্চাল দ্রুপদকে তাঁর নিজের রাজ্য থেকে হটিয়ে কাম্পিল্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন, সেই দ্রোণ শুধু পাণ্ডবদের রাজ্য দেওয়ার প্রস্তাব অনুমোদন করলেন তাই নয়, দ্রুপদের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রকে রীতিমত সমঝে দিলেন। সেই রাজনৈতিক সম্পর্ক তৈরি করার প্রথম 'শ্লোগান'

হিসেবে দ্রোণই ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিলেন—কুরু-পাঞ্চাল ভাই-ভাই রব তোলার। দ্রোণ বললেন—এখনই দ্রুপদের উদ্দেশ্যে একজন দূত পাঠান, যে মিষ্টি করে কথা কইতে জানে। কৌরবদের তরফ থেকে বর-বধূর জন্য রত্ন, অলংকার নিয়ে দ্রুপদকে গিয়ে সে বলবে—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এবং যুবরাজ দুর্যোধন এ বিয়েতে দারুণ খুশি হয়েছেন। আপনার সঙ্গে এবার বৈবাহিক সম্পর্ক হল—আমাদের মর্যাদাও বাড়ল। দ্রোণ বললেন—সেই দূত দ্রুপদ এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের কাছে বারবার বলবে—এই বিবাহ কতটা উপযুক্ত এবং ভাল হয়েছে দুই রাজ-পরিবারের পক্ষে। আর কুরু পরিবার এই বিয়েতে কতটা প্রীতি-পুলকিত হয়েছে, সেটাও দূত জানাবে—উচিতত্বং প্রিয়ত্বঞ্চ যোগস্যাপি চ বর্ণয়েৎ।

যে কথাগুলো দূত বলবে, তা ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্যোধনের মনের মত না হলেও বলবে—অর্থাৎ বলতে হবে। কথাগুলির উদ্দেশ্য স্পষ্ট। সোজা কথায় পাণ্ডবদের এবং বিশেষত দ্রুপদ-ধৃষ্টদ্যুম্নকে একটু তেল দেওয়া। প্রয়োজনীয় এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কৌরবদের দিক থেকে মৌখিকতার এই খাতিরটুকু যে দ্রুপদকে একান্তই করা দরকার—এটাই দ্রোণাচার্যের মত দ্রুপদ-বিদ্বেষীও মনে করেন।

কিন্তু দ্রোণের এই কথাটা দুর্যোধন কেন, তাঁর প্রধান পারিষদ কর্ণই ভালভাবে নিলেন না। চিরকালের দ্রুপদ-বিদ্বেষী দ্রোণাচার্য আজকে হঠাৎ দ্রুপদের প্রতি সম্ভাবনায় কাতর হয়ে উঠলেন এবং এতটাই কাতর যে, দ্রুপদের বন্ধুত্বে কৌরবদেরও পরম পুলকিত বোধ করতে হবে—দ্রোণাচার্যের এই পরামর্শ কর্ণকে সংশয়িত করে তুলল। সে সন্দেহ তিনি ব্যক্তও করে ফেললেন। কর্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—সারাজীবন কুরুকুলের খেয়ে-পরে, তাঁদের টাকা-পয়সা আর সম্মান পাওয়া সত্ত্বেও এই ভীষ্ম-দ্রোণ কিন্তু আপনাকে ভাল কথা বললেন না, ভাল পরামর্শও দিলেন না। যাদের মনের মধ্যে 'কু', যারা মুখে এক মনে এক—তারাও যদি আবার হিতোপদেশ দেয়, তা কি কোন ভদ্রলোকের পছন্দ হবে—দুষ্টেন মনসা যোগৈঃ প্রচ্ছন্নেনান্তরাত্মনা....।

বলা বাহুল্য, এই সমস্ত কথাগুলিই এখানে দ্রোণাচার্যের উদ্দেশ্যে। কর্ণ কিছুতেই বুঝতে পারছেন না—যে লোক চিরকাল দ্রুপদের বিরোধী গোষ্ঠীর মানুষ, তিনি কেন দ্রুপদকে তুষ্ট করার জন্য এত ব্যস্ত! কর্ণ জানতেন না, অথবা বলা উচিত দ্রোণাচার্য এটা ভাল জানতেন যে, উত্তর পাঞ্চাল হারাবার পর থেকেই দ্রুপদ সময়ের অপেক্ষায় আছেন এবং সেই লক্ষ্যে ক্রমে ক্রমে শক্তিমানও হয়ে উঠেছেন। স্বাভাবিক কারণেই কর্ণের অযথা আচরণে তাঁর রাগ হল এবং হয়তো দ্রুপদের শক্তির কথা মনে রেখেই ভবিষ্যদ্‌বাণী করলেন যে, তাঁর হিতকথা না শুনলে কুরুকুল অচিরেই উচ্ছন্নে যাবে—কুরবো বৈ বিনঙ্‌ক্ষ্যন্তি ন চিরেণৈব মে মতিঃ।

দ্রোণের অনুমান ঠিক ছিল। কারণ দ্রোণের অব্যবহিত পরেই বলতে উঠলেন বিদুর। তিনি পাণ্ডবদের পৈতৃক রাজ্যে অধিকারের প্রসঙ্গটি একবার তুলেই তাঁদের শক্তিমত্তার বিচার আরম্ভ করেছেন। পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে কে কতটা শক্তি ধরে—সে কথাটা সাড়ম্বরে উল্লেখ করলেন বিদুর। কিন্তু এটা তাঁর বক্তব্যই

নয়। কারণ তাঁর মতে পাণ্ডবেরা এখন শুধুমাত্র একটি বিশেষ্য পদ নয়, তাঁদের অনেক বিশেষণ জুটেছে। কিরকম পাণ্ডব ? না, যে পাণ্ডবের পক্ষে রয়েছেন স্বয়ং বলরাম, কৃষ্ণ এবং অদ্বিতীয় বৃষ্ণিবীর সাত্যকি। আগেই বলেছি, কংসহন্তা বীর হিসেবে এবং জরাসন্ধ এবং তাঁর সম্মিলিত বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখার প্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণ-বলরামের ভাবমূর্তি তখন সর্বত্র উজ্জ্বল। কিন্তু বিদুর শুধু এটুকু বলেই ক্ষান্ত হলেন না। তিনি বললেন—কি রকম পাণ্ডব জান ? যাদের শ্বশুর হলেন দ্রুপদ, যাঁদের শালা হলেন ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি ভাইরা (মনে রাখবেন, দ্রুপদের একাধিক স্ত্রী ছিল এবং সব মিলে আঠেরটা ছেলে ছিল)। কাজেই যে পাণ্ডবদের সহায় হলেন বলরাম এবং কৃষ্ণ, দ্রুপদ এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, সেই পাণ্ডবদের সঙ্গে এঁটে ওঠার কল্পনাটা নিছক বাতুলতা বলেই—সো'শক্যতাঞ্চ বিজ্ঞায়—মনে করেন বিদুর। তা ছাড়া পদাঘাত প্রাপ্ত সর্প যেমন প্রতিহিংসায় ফুঁসতে থাকে, দ্রোণের দ্বারা আহত দ্রুপদও যে সেইভাবেই কাল কাটাচ্ছেন এবং দ্রোণের আশ্রয়দাতা কৌরবকুলও যে দ্রুপদের কাছে সমান দোষে দোষী, সে কথাটাও পরিষ্কার করে দিলেন বিদুর। তিনি দ্রোণের দেওয়া আঘাত কুরুকুলের ঘাড়ে নিয়েই বললেন—দ্রুপদ যথেষ্ট বড় রাজা—দ্রুপদো'পি মহান্ রাজা, এবং পূর্বে তাঁর সঙ্গে আমরা শত্রুতা করেছি—কৃতবৈরশ্চ নঃ পুরা। কাজেই এই মুহূর্তে আমাদের উচিত পাণ্ডবদের তুষিয়ে তাঁকে আমাদের দলে টানা। তাতে আমাদের শক্তি বাড়বে—তস্য সংগ্রহণং রাজন্ স্বপক্ষস্য বিবর্ধনম্।

বিদুরের বক্তৃতা সফল হয়েছিল। পাঞ্চাল দ্রুপদের ক্ষমতা এবং কংসহন্তা কৃষ্ণের যদুবাহিনীর ভয় তিনি সাময়িকভাবে ধৃতরাষ্ট্রের মনে সংক্রামিত করতে পেরেছিলেন। ফলে ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং বিদুরকেই পাঠালেন পাণ্ডব এবং পাঞ্চালদের নেমন্তন্ন করে আনতে। মহা সমারোহে পাণ্ডবেরা হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন এবং সোজা কথা হল—বৃহত্তর জন সমর্থন পাণ্ডবদের প্রতি থাকায় ধৃতরাষ্ট্রকে রাজ্য ভাগ করে দিতেই হল। পাণ্ডবদের তিনি বললেন—আমাদের যেন আর ঝগড়াঝাটি না হয়—মিথো ন বিগ্রহো মা ভূৎ—তোমরা চলে যাও খাণ্ডবপ্রস্থে, সেখানে বসতি বসিয়ে রাজ্য রক্ষা কর তোমরা। খাণ্ডবপ্রস্থ একেবারে বন্য জায়গা, শস্য হয় না মোটেই, ধৃতরাষ্ট্র এই রাজ্য পাণ্ডবদের দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মহাভারতের টীকাকার মনের দুঃখে মন্তব্য করেছেন—ধৃতরাষ্ট্র একটি ঘোর বন দিলেন পাণ্ডবদের—শস্য নেই, বসতি নেই, কিচ্ছু নেই—শস্যশূন্যে দেশঃ পাণ্ডবেভ্যো দত্তঃ ইতি।[৬৩]

কৌরবদের পূর্বপুরুষ মহারাজ হস্তী হস্তিনাপুর স্থাপন করেছিলেন, মহারাজ কুরু স্থাপন করেছিলেন কুরুক্ষেত্র, কুরুজাঙ্গল এবারে আধুনিক ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লির প্রতিষ্ঠা হল খাণ্ডবপ্রস্থে। খাণ্ডবপ্রস্থ ইন্দ্রপ্রস্থে পরিণত হল এখনকার পুরনো দিল্লির ফিরোজ-শা-কোটলা আর হুমায়ুনের সমাধির মাঝখানে। আমি আগেই বলেছি যে, পণ্ডিতেরা অনেকে পাণ্ডবদের কুরুবাড়ির নিজের লোক বলে মনে করেন না। তাঁরা মনে করেন, পাণ্ডবেরা কৌরবদের 'kindred race' এবং 'very akin' কিন্তু তাঁরা দ্বিতীয় আর্যদল। তাঁদের এই ধারণা আরও দৃঢ় হয়েছে ওই খাণ্ডবপ্রস্থ অঞ্চলে পাণ্ডবদের বন সাফ করে নতুন বসত বসাতে দেখে। খাণ্ডব-দহনের সময় তক্ষক নাগের বংশকে পণ্ডিতেরা

'aboriginal race' বলে মনে করেছেন, যে তক্ষক তক্কে তক্কে থেকে নয়া আর্যদের সর্বনাশ করেছিল পরীক্ষিৎকে মেরে। খাণ্ডববনের অন্যান্য পশুপক্ষীরাও যে অনার্যতার অক্ষরে চিহ্নিত হবেন পণ্ডিতদের লেখনীতে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার মধ্যে আবার আরেক বিপদ করেছেন দ্রৌপদী। পাঁচ ভাই তাঁকে একসঙ্গে বিয়ে করতে চাইলে, আর্যসন্তান দ্রুপদ রাজা যেহেতু ভীষণ চমকে উঠেছিলেন তাতে পণ্ডিতদের সন্দেহ আরও বেড়েছে। তাও যদি দ্রুপদের একটু চমকানিতেই শেষ হত! দ্রুপদ সবিস্ময়ে এই গণবিবাহের সম্ভাব্যতা উড়িয়ে দিলে স্বয়ং যুধিষ্ঠির, যিনি কুলবিধি, ধর্মবিধি সব জানেন, তিনি বললেন—এই আমাদের কুলাচার, আমাদের পূর্বপুরুষেরা যা করেছেন, আমরা সেই পথেই যাচ্ছি—পূর্বেষাম্ আনুপূর্ব্যেণ যাতং বর্ত্মানুযামহে—এতে ধর্মের কোন বিরোধ হচ্ছে বলে আমরা মনে করি না।[৬৪]

যুধিষ্ঠিরের এই কুলাচার-স্বীকারে পণ্ডিতেরা আরও সন্দেহ করেন যে, এই আর্য, সেই আর্য নয়। বিশেষত বিবাহবিধির এমন শৈথিল্য, সাধারণভাবে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে অর্থাৎ হিড়িম্বা, উলূপী এই সব স্ত্রীলোক সম্বন্ধেও বাছ-বিচার না থাকায়, পণ্ডিতেরা বড়ই চিন্তিত। এই সব শিথিলতা নাকি পুরুবংশীয়দের মধ্যে কম। শৈথিল্য যতখানি আছে এবং যা আছে, তা পাণ্ডবের মধ্যেই অথবা শৌরসেনী, মানে কৃষ্ণের পরিবারে যাদবদের মধ্যে, কুন্তিভোজ, দশার্ণ, মৎস্য এবং মগধে। এঁরা সবাই নাকি ভিন্ন ভিন্ন দলের আর্য। তার মধ্যে বন কেটে বসতি গেড়ে দিল্লি প্রতিষ্ঠা করায় পণ্ডিতেরা প্রায় নিঃসন্দেহ হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, মহাভারতের যুদ্ধকে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ বল না, বল কুরু-পাঞ্চালের যুদ্ধ—অর্থাৎ পুরাতন আর্যদের পুরাতন ঝগড়া। নতুন পাণ্ডবেরা নিজেদের সুবিধের জন্য পুরনো এক বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীতে শামিল হয়েছেন মাত্র।

কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। মহাসমারোহে ইন্দ্রপ্রস্থ মানে দিল্লির প্রতিষ্ঠা হল। কিন্তু তার পরেই যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দ্রৌপদীকে একান্তে প্রেম করতে দেখে ফেলায় অর্জুনকে চলে যেতে হল বনে। তাঁর নাকি ব্রহ্মচারী হয়ে বারো বছর বনে থাকার কথা। কিন্তু আমরা দেখি তিনি একটার পর একটা বিয়ে করে চলেছেন—আমরা সন্দেহ করি এই সব বিবাহে কিছু কিছু রাজনৈতিক লাভও ঘটেছে পাণ্ডবদের। বিশেষত যাদবী সুন্দরী সুভদ্রার সঙ্গে অর্জুনের বিবাহে। অর্জুনের সঙ্গে সুভদ্রার বিয়েতে কৃষ্ণের সেই সুবিধে হল, যে সুবিধে তিনি নিজেও পাননি বিদর্ভরাজা ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণীকে বিয়ে করে। ভীষ্মকের মেয়ে রুক্মিণীর সঙ্গে শিশুপালের বিয়ে ঠিক করেছিলেন জরাসন্ধ, কিন্তু কৃষ্ণ মাঝপথে রুক্মিণীকে হরণ করে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করলেন। কিন্তু এতে জরাসন্ধের বিরুদ্ধে যে রাজনৈতিক লাভের কথা কৃষ্ণ ভেবেছিলেন, তা মোটেই হয়নি, রুক্মিণীপিতা ভীষ্মক সেই জরাসন্ধের পক্ষেই রয়ে গেছেন। মহাভারতে রাজসূয় যজ্ঞের আগে জরাসন্ধবধের প্রস্তাবনায় কৃষ্ণ তাঁর এই মর্মান্তিক দুঃখটি যুধিষ্ঠিরকে জানিয়েছেন। যাই হোক সুভদ্রার সঙ্গে অর্জুনের বিয়েতে কিন্তু দুই পক্ষেরই বিরাট রাজনৈতিক লাভ হল। মহাভারতে দেখবেন এই বিয়ের পরে পাণ্ডবদের দিল্লিতে বৃষ্ণি-অন্ধক-যদুবীরদের সাংঘাতিক যাতায়াত শুরু হয়েছে।

এর পরেই জরাসন্ধবধের পালা। তিনটি স্নাতক ব্রাহ্মণের বেশে কৃষ্ণ, অর্জুন

আর ভীম গেলেন মগধপুরী গিরিব্রজে। তারপর **not a drum was heard, not a funeral note,** ভীমের সঙ্গে সাধারণ মল্লযুদ্ধে প্রাণ হারালেন জরাসন্ধ। কৃষ্ণের বুদ্ধির তারিফ আরম্ভ হল সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। পাণ্ডবেরা দিগ্‌বিজয়ে বেরোলেন। রাজসূয় যজ্ঞে নতুন যুগের নতুন নায়ক কৃষ্ণকে একেবারে পাদ্যঅর্ঘ দিয়ে বরণ করে নিলেন কুরুকুলপতি ভীষ্ম—কৌরবদের পুরাতন নায়ক। রাজসূয় যজ্ঞের, সভাভূমিতেই কৃষ্ণের হাতে মৃত্যুবরণ করলেন শিশুপাল। এককালে জরাসন্ধের ঘোর সমর্থক, তাঁর পুত্রকল্প রাজনৈতিক শিষ্য শিশুপাল কৃষ্ণের হাতেই মারা গেলেন। যজ্ঞশেষে মারা গেলেন পৌণ্ড্র বাসুদেব, জরাসন্ধের মিত্রগোষ্ঠীর আরও এক প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি এবং তাঁর সঙ্গেই পূর্বাঞ্চলীয় রাজশক্তির অবসান ঘটল। কৃষ্ণের আরও এক প্রতিদ্বন্দ্বী সৌভদেশের রাজা শাল্ব, যিনি এককালে জরাসন্ধের মিত্রবাহিনীতে ছিলেন, তিনিও কৃষ্ণের হাতে মারা পড়লেন ঠিক সেই সময়ে, যখন কুরুসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ চলছিল। কৃষ্ণ নিজেই এ কথা যুধিষ্ঠিরকে জানিয়েছেন বনপর্বে। আসলে পুরুষোত্তম কৃষ্ণ এখন নিজের রাজনৈতিক সত্তা সম্পূর্ণ নিরুদ্বিগ্ন করার জন্য ব্যস্ত ছিলেন বলেই পাণ্ডবদের দেখ-ভাল করার সুযোগ পাননি। অন্যদিকে পাণ্ডবেরা রাজসূয়ই করুন আর যাই করুন, রাজনৈতিকভাবে তাঁরা যেহেতু তখনও যথেষ্ট দুর্বল তাই সামান্য পাশা-খেলার অজুহাতেই তাঁদের রাজত্ব গেছে। আর পণ্ডিতদের মতে পুরাতন আর্যগোষ্ঠীর অভ্যাসই হল নতুনদের সাময়িকভাবে পুনর্বাসিত করেও তাঁদের রাজ্য কেড়ে নেওয়া। ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে এই পুরাতন আর্যগোষ্ঠীর অভ্যাসটি বজায় রয়েছে। পাণ্ডবদের তিনি বারবার স্থান দিয়েও মনে মনে কেবলই ফিকির করেছেন, কেমন করে তাঁদের তাড়ানো যায়। ফলে মিথ্যে মিথ্যি ছলচাতুরীর পাশা খেলিয়ে পাণ্ডবদের তিনি বনবাসে যেতে বাধ্য করলেন।

লক্ষ করবেন, পাঞ্চালেরা কিন্তু দ্রৌপদীর বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই কুরু-পাণ্ডবদের ঘরোয়া ব্যাপারে সোজাসুজি নাক গলাননি, ঠিক যেমন যাদবেরাও তা করেননি। তাঁরা সবাই রাজসূয় যজ্ঞে এসেছিলেন এবং সেখানে পাণ্ডবদের মোটামুটি প্রতিষ্ঠিতই দেখেছিলেন, কেননা রাজসূয় যজ্ঞ মানেই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার মূলে যে ছিলেন যদুবীর কৃষ্ণ—এ কথা দ্রুপদ পাঞ্চাল অতটা অনুধাবন করতে পারেননি। মহাভারতের আদিপর্বে, সেই যখন মহামতি বিদুর পাণ্ডবদের রাজ্য দেওয়ার জন্য ওকালতি করছেন, সেই তখনই বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন—যেখানে কৃষ্ণ সেখানেই জয়, এখন কৃষ্ণ যেদিকে যাবেন, সবাই সেদিকে যাবে। এ কথা যে বিদুর বড় ভক্তি থেকে বলছেন কিংবা গভীর ধর্মবোধ থেকে, তা মোটেই নয়। বিদুর বলছেন বাস্তব বুঝে, বাস্তব দেখে। কৃষ্ণের সম্বন্ধে কথা বলার আগেই বিদুর বলেছেন—দাশার্হ পুরুষেরা যেমনি ক্ষমতাসম্পন্ন, তেমনি সংখ্যাতেও তাঁরা অনেক—বলবন্তশ্চ দাশার্হা বহবশ্চ বিশাম্পতে। (দশার্হ কৃষ্ণের বংশে পূর্ববর্তী এক পুরুষের নাম।)

দেখা যাচ্ছে কর্ণ যে যাদববাহিনীর ভয় দেখিয়েছেন দুর্যোধনকে, বিদুরও আরেকভাবে সেই যাদব-বাহিনীরই ভয় দেখাচ্ছেন ধৃতরাষ্ট্রকে। কিন্তু পাণ্ডবরা ইন্দ্রপ্রস্থে স্থান পেয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও যে এমন বোকার মত রাজ্য হারিয়ে বসবেন—দ্রুপদ পাঞ্চাল তা কল্পনাও করতে পারেননি। কিন্তু কৃষ্ণও যে তা

কল্পনা করতে পারেননি, তা নয়। পাণ্ডবরা বনবাসে যাবার পরেই খবর চলে এসেছে পাঞ্চালে, মথুরায়, এমনকি কেকয় দেশেও। খবর পেয়ে কৃষ্ণ ভোজ, বৃষ্ণি এবং অন্ধক পুরুষদের বাহিনী নিয়ে পাণ্ডবদের খুঁজে বার করেছেন গভীর বনে—ভোজাঃ প্রব্রজিতান্ শ্রুত্বা বৃষ্ণয়শ্চান্ধকৈঃ সহ। পাঞ্চাল যুবরাজ ধৃষ্টদ্যুম্ন, কেকয় দেশের পাঁচ রাজপুত্র এবং চেদিদেশের নতুন প্রতিষ্ঠিত রাজা শিশুপালের ছেলে ধৃষ্টকেতু, যিনি শিশুপাল মারা যাবার পর অবশ্যই সেইদিকে যাচ্ছেন, যেখানে আছেন কৃষ্ণ—শিশুপালহন্তা। এঁরা যে সবাই পাণ্ডবদের সঙ্গে বনে দেখা করতে এসেছেন, তার কারণ শুধু সৌজন্য নয়, তাঁর কারণ পাণ্ডবদের অপমানে এঁরা প্রত্যেকেই অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে পড়েছেন—ক্রোধামর্ষসমন্বিতাঃ। এঁরা সবাই অবশ্য এসেছেন বাসুদেব কৃষ্ণকে সামনে রেখে, তাঁকে পুরোধা করে—বাসুদেবং পুরস্কৃত্য। তিক্ত-বিরক্ত কৃষ্ণ এসেই যুধিষ্ঠিরকে বললেন—এমনটি যদি চলতে থাকে, তাহলে দুর্যোধন-দুঃশাসন আর কর্ণ-শকুনির রক্ত পান করবে এই বসুন্ধরা। কৌরবসভায় ওই যতগুলি লোক জুটেছে সবগুলিকে মেরে আমরা সবাই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে স্থাপন করব।

বস্তুত মহাভারতের যুদ্ধটা এই সময়েই লেগে যেতে পারত, এবং ওই যে পাঞ্চাল-কেকয় সবাই এসে ওই সময়ে জুটেছিলেন কৃষ্ণের পাশে—সে বোধহয় কৃষ্ণেরই ইশারায়। যাই হোক, সেই সময়ে অর্জুন নানা কথায়, নানা স্তুতিতে কৃষ্ণকে কোনমতে থামালেন। কিন্তু থামলেন না পাঞ্চালী কৃষ্ণা, কারণ অসহ্য এবং অসভ্য ব্যবহার প্রধানত সহ্য করতে হয়েছে তাঁকেই। তিনি কুরুসভার সমস্ত অপমান কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন—হায় হায়, পাণ্ডবরা বেঁচে থাকতে, পাঞ্চালেরা বেঁচে থাকতে এবং বৃষ্ণিবংশীয়েরা বেঁচে থাকতেও ওরা আমাকে বেশ্যার মত ভোগ করতে চাইল—জীবৎসু পাণ্ডুপুত্রেষু পাঞ্চালেষু চ বৃষ্ণিষু।

কৃষ্ণ কথা দিলেন, অর্জুন কথা দিলেন এবং পাঞ্চাল যুবরাজ ধৃষ্টদ্যুম্নও কথা দিলেন যে, তাঁরা সবাই একযোগে এই অপমানের প্রতিকার করবেন। কিন্তু সব কিছুর পরে কৃষ্ণ জানালেন যে তিনি যদি কোনক্রমে দ্বারকায় থাকতেন তাহলেই এই পাশাখেলার অনর্থটুকু হত না—যদ্যহং দ্বারকায়াং স্যাং রাজন্ সন্নিহিতঃ পুরা। কিন্তু কৃষ্ণ দ্বারকায় ছিলেন না। তিনি গিয়েছিলেন সৌভ দেশে শাল্বকে শিক্ষা দেবার জন্য। আমরা এই কথাটাই বলতে চাইছিলাম যে, দ্বারকায় বসেও কৃষ্ণ কিন্তু দ্রুপদের মত নিশ্চিন্ত ছিলেন না। পূর্বে যেমন তিনি মৃত বলে রটে-যাওয়া পাণ্ডবদের খুঁজে বার করবার কাজে লাগিয়েছিলেন সাত্যকিকে, তেমনি এখানেও দেখছি সাত্যকিই প্রথমে কৃষ্ণকে পাণ্ডবদের রাজ্যপাট হারানোর খবর দিচ্ছেন। কৃষ্ণ খবর পাওয়া মাত্র সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে একেবারে বনে চলে এসেছেন পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করতে। পাঞ্চাল কেকয়দের সংবাদ দিয়ে নিয়ে আসা—এও বোধহয় তাঁরই কাজ।

. রাজসূয় যজ্ঞের পর থেকে একটা জিনিস খুব পরিষ্কার হয়ে গেছে। সেটা হল, পাণ্ডব বলুন, পাঞ্চাল বলুন—প্রত্যেকেই কিন্তু এখন যে কোন ব্যাপারে কৃষ্ণ বাসুদেবকেই মুরুব্বি ধরছেন। পাণ্ডবেরা বলছেন—কৃষ্ণ যেমনটি বলছেন,

তেমনিই হবে—যথাহ মধুসূদনঃ। ধৃষ্টদ্যুম্ন বলছেন—বলরাম-কৃষ্ণকে আশ্রয় করে যুদ্ধ করব আমরা, জয় আমাদের হবেই—রামকৃষ্ণৌ ব্যপাশ্রিত্য অজেয়াঃ স্ম রণে স্বসঃ। আবার একটা কথা প্রায়ই শোনা যাচ্ছে—বাসুদেবেন রক্ষিতঃ—অর্থাৎ আমরা যুদ্ধ করব বাসুদেব কৃষ্ণের দ্বারা রক্ষিত হয়ে অর্থাৎ তাঁরই ছত্রচ্ছায়ায়। বলা বাহুল্য বাসুদেবের এই সুরক্ষা-ছত্রের তলায় আছেন—পাঞ্চালেরা, কেকয়েরা এবং আরও অন্যেরা, যাঁরা নিজেরাও ব্যক্তিগতভাবে এক একটি বড় শক্তি। কথাটা বোঝা যাবে ঠিক পাণ্ডব-নির্বাসনের পর দ্রোণাচার্যের বক্তব্যে। পাণ্ডবরা একে একে বনবাসে বেরিয়ে গেলে মহর্ষি নারদ ভীষণ রেগে বললেন—আজ থেকে ঠিক চোদ্দ বছরের মুখে কৌরবেরা ধ্বংস হবে। কথাটা এমন অভিশাপের মত শোনাল যে, কুরুসভার যুবগোষ্ঠী—দুর্যোধন, কর্ণ এবং শকুনিরাও ভয় পেলেন এবং সাময়িকভাবে দ্রোণাচার্যের সুরক্ষায় বাঁচতে চাইলেন। এমনকি গোটা কুরু রাজ্যের পরিচালনার ভারও তাঁরা সঁপে দিলেন দ্রোণকে—দ্রোণং দ্বীপম্ অমন্যন্ত রাজ্যং চাস্মৈ ন্যবেদয়ন্।

সেই দ্রোণাচার্য, যাঁর টাকা-পয়সার লোভ ছিল। সেই দ্রোণাচার্য যিনি ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও মনে মনে বড় আশা করতেন যে, একদিন তিনি এক বিরাট রাজ্যের রাজা হবেন। তা রাজা তো তিনি আগেই হয়েছেন, দ্রুপদকে দক্ষিণ পাঞ্চালে বিতাড়িত করে তিনি তো বহু আগেই উত্তর পাঞ্চালের বামুন-রাজা। কিন্তু আজকে যখন কুরু সভায় কুরু রাজ্যের পরিচালনা-ভার পেলেন দ্রোণাচার্য, তখন তাঁর মন কিন্তু লোভ এবং ভয়ের দ্বন্দ্বে আকীর্ণ। রাজ্যলোভ, বৃহত্তর সম্মান তাঁকে বলতে বাধ্য করল—তোমরা যখন আমার শরণ নিয়েছে, তখন আমি যথাশক্তি রাজ্য পরিচালনা করব। সর্বাত্মক ভক্তিতে আমার কাছে আত্মনিবেদনকারী কৌরবদের আমি যে ত্যাগ করতে পারি না, সে আমার কপাল—নোৎসহে'য়ং পরিত্যক্তুং দৈবং হি বলবত্তরম্। কিন্তু এই সব আবেগ-তাড়িত মুহূর্তের পরেই দ্রোণের অন্তরে কাজ করতে থাকে গভীর এক বাস্তববোধ, যে বোধ তাঁর লোভ, সম্মান এবং আবেগকে মুহূর্তে ভেঙে দিয়ে সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে বাধ্য করে। দ্রোণ তখন কৌরবদের পরিষ্কার জানান—পাণ্ডবরা বারো বছর বনে থাকবে বটে—কিন্তু তাদের মনে থাকবে ক্রোধ এবং অপমানের জ্বালা, এর শোধ তারা তুলবেই। অন্য দিকে বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া করে মহারাজ দ্রুপদকে আমি রাজ্য থেকে তাড়িয়েছি—ময়া চ ভ্রংশিতো রাজ্যাৎ দ্রুপদঃ সখিবিগ্রহে। সে আমারই মৃত্যুর জন্য পুত্রলাভ করেছে। সেই পুত্র হল ধৃষ্টদ্যুম্ন, এবং সে পাণ্ডবদের শালা।

রাজনীতির বুদ্ধিতে দ্রোণ বেশ বুঝতে পারছেন যে, প্রতিষ্ঠিত রাজ্য হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা পাণ্ডব-পাঞ্চাল—এই দুই পক্ষের ক্ষেত্রেই এককারণতা নিয়ে এসেছে এবং এইটাই তাঁদের একতারও সূত্র। দ্রোণ বলছেন—আজ তাই পাঞ্চাল ধৃষ্টদ্যুম্ন শালা-সম্বন্ধে এবং রাজ্যভ্রষ্টতার সাধারণ কারণে পাণ্ডবদের অনেক প্রিয়তর; ঠিক এই ব্যাপারটাই আমার ভয়ে করছে—পাণ্ডবানাং প্রিয়তরস্তস্মান্মাং ভয়মাবিশৎ। দ্রোণের ধারণা, যিনি তাঁর মৃত্যুর কারণ হিসেবে চিহ্নিত, সেই মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবপক্ষে চলে যাওয়ায় দুর্যোধনে বিপদ ঘটবে ভবিষ্যতে। তাছাড়া কুরুসভায় দ্রৌপদীর যে অবমাননা

হয়েছে, সে অবমাননা পাণ্ডবেরা যেমন সইবে না, তেমনি সইবে না পাঞ্চালেরা কিংবা বৃষ্ণিরা

একথা ঠিক যে, পৃথিবীতে যতগুলি বড় বড় যুদ্ধ হয়েছে, তার পেছনে যেমন অনেক রাজনৈতিক সামাজিক এবং দ্বিপাক্ষিক কারণ থাকে, তেমনি যুদ্ধ লাগার জন্য একটা তাৎক্ষণিক কারণও থাকে। ভারত যুদ্ধের ক্ষেত্রে এই কারণ হলেন দ্রৌপদী। তাঁর অপমানে পাণ্ডবেরা যেমন স্বামী হিসেবে অপমানিত, পাঞ্চালেরা তেমনি ভাই এবং পিতার সম্বন্ধ-গৌরবে অপমানিত। আর বৃষ্ণিরা, বিশেষত বৃষ্ণিকুলের নায়ক কৃষ্ণ ক্ষুব্ধ হয়েছেন দ্রৌপদীর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের সূত্র থাকায়। কৃষ্ণা যেমন কৃষ্ণের কাছে এ বিষয়ে ন্যায়বিচার চেয়েছেন তেমনি কৃষ্ণও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষে মন্তব্য করেছেন যে, তিনি দ্রৌপদীর ঋণ শোধ করেছেন। কাজেই দ্রোণের অনুমান মিথ্যে নয়। তাঁর ধারণা, পাণ্ডবদের বনপর্ব শেষ হলেই অর্জুন আসবেন বাসুদেবের রক্ষাকবচ গায়ে এঁটে—বাসুদেবেন রক্ষিতঃ, অর্জুন আসবেন পাঞ্চালদের বর্ম পরে—পাঞ্চালেরভিসংবৃতঃ। কাজেই চোদ্দ বছরের মুখে দুর্যোধনের বিপদ আছে। দ্রোণাচার্যের এই ভয়ের কথা সম্পূর্ণ সমর্থিত হচ্ছে স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্রের মুখে। তিনি মহামতি বিদুরের বক্তব্য উদ্ধার করে সঞ্জয়কে ঠিক একই কথা বলেছেন। অর্থাৎ কৃষ্ণার অপমানে পাণ্ডব, পাঞ্চাল এবং বৃষ্ণিরা এককাট্টা হবে, তারা কেউ এই অবমাননা সহ্য করবে না—বৃষ্ণয়ো বা মহেষ্বাসাঃ পাঞ্চালা বা মহারথাঃ। তারা সবাই আসবে বাসুদেব কৃষ্ণের তত্ত্বাবধানে—বাসুদেবেন রক্ষিতাঃ।

পাণ্ডবেরা বনবাসে যাবার মুহূর্তে যে সমস্ত রাজনৈতিক সূত্রগুলি কাজ করছিল, তার একটা বিবরণ আমরা দিয়েছি। যে কারণে ভারতযুদ্ধ ত্বরান্বিত এবং অনিবার্য হয়ে উঠল, সেই দ্রৌপদীর কথাও আমরা বলেছি। যাই হোক, বনবাস পর্বেও ভারতযুদ্ধের প্রস্তুতি কিভাবে চলছিল, তারও দু-একটা সূত্র আমাদের দিতে হবে।

পাণ্ডবেরা বনে গেলেন। অনেক বনই ইন্দ্রপ্রস্থ-দিল্লীর কাছে। তবে বনবাসের অনুষঙ্গে পাণ্ডবেরা যে হাজারো তীর্থ ঘুরেছেন, সেটা একেবারে রাজনৈতিক তাৎপর্যহীন বলে মনে হয় না। কারণ দেখুন, তীর্থ করতে করতে পাণ্ডবেরা যখন প্রভাস তীর্থে এসে পৌঁছোলেন তখন মহাভারতের শ্রোতা জনমেজয় কথক-ঠাকুর বৈশম্পায়নকে জিজ্ঞাসা করলেন—বৃষ্ণিরা আর পাণ্ডবেরা তো পরস্পর পরস্পরের বন্ধু—সুহৃদশ্চ পরস্পরম্। তা তাঁদের মধ্যে কি কথাবার্তা হল, বৃষ্ণিরাই বা কি বললেন ?

বাস্তবিকপক্ষে রাজনৈতিক সংবাদদাতা হিসেবে এ প্রশ্নটা আমাদের তরফ থেকেও আসে। বৈশম্পায়ন বললেন—বৃষ্ণিবীরেরা সবাই পাণ্ডবদের ঘিরে বসলেন কৌতূহলে—পরিবার্যোপতস্থিরে। বৃষ্ণিদের প্রধান নায়ক বলরাম প্রথম থেকেই একেবারে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সমস্ত কৌরব প্রধানদের নিন্দা করতে থাকলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ এবং ধৃতরাষ্ট্র কাউকেই তিনি গালাগালি দিতে বাকী রাখলেন না। বিশেষত দুর্যোধনকে নানাভাবে এর ফল ভুগতে হবে, সে কথাও বলতে দ্বিধা করলেন না। কিন্তু তাঁর সমস্ত বক্তৃতাটার মধ্যে কাজের কথার থেকে ভাবের প্রাধান্য ছিল বেশি। ভাবটা ছিল এইরকম—যেখানে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির

সভ্রাতৃক সানুচরে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সেখানে দুর্যোধনের বাড়বৃদ্ধি ঘটছে—তবুও পৃথিবী, পাহাড়-পর্বত কেন কেঁপে উঠছে না—কথং ন সীদত্যবনিঃ সশৈলাঃ।

আগেই বলেছি বলরামের মা কিন্তু পুরুবংশের মেয়ে রোহিণী, যিনি বাসুদেবের প্রথমা স্ত্রী। এক্ষেত্রে পুরুবংশের লোকেরা যেসব কাণ্ড-কারখানা করে ফেলেছেন, তাতে বলরাম সোজাসুজি তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও ঘোষণা করতে পারছেন না, আবার তাঁদের আচার-আচরণ সইতেও পারছেন না। এ অবস্থায় তাই তাঁর পক্ষে ভাবালুতা প্রকাশ করা ছাড়া কোন গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু এই ভাবালুতায় অন্য বৃষ্ণিবীরদের মন ভিজবে কেন, তাঁদের কারও মা তো আর পৌরবী অর্থাৎ পুরুবংশের মেয়ে নন। স্বাভাবিকভাবে বলরামের কথা শেষ হতে না হতেই তাঁর ভাবালুতায় ঘা দিলেন সাত্যকি— আমাদের এখন অনুশোচনার সময় নেই। এটা মনে রাখা দরকার, যুধিষ্ঠির কিছু বলুন চাই না বলুন, আমাদের যা করণীয় তা আমাদের করা উচিত। আসলে জগতে যাঁরা সহায়-সম্পন্ন তাঁরা নিজে নিজে কিছু করেন না। যুধিষ্ঠির মহারাজের পক্ষে আমাদের মত সহায় থাকতেও, বলরাম-কৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন-শাম্ব এবং আমরা থাকতেও যে তাঁকে অনাথের মত রাজ্য হারিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে—এটা হবে কেন?

সাত্যকি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তিনি যদু-বৃষ্ণিদের অন্যতম নেতাই শুধু নন, তার থেকেও তাঁর বড় পরিচয়, তিনি ধনুর্বেদে অর্জুনের প্রিয়তম শিষ্য। ভারতযুদ্ধের ব্যাপারে তিনি কারও সাহায্য চাননি। তিনি চান—এই মুহূর্তে যাদব-বৃষ্ণিরা ঝাঁপিয়ে পড়ুক দুর্যোধনের ওপর—নির্যাতু সাধবদ্য দশার্হসেনা। সাত্যকি বললেন—ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা সমবেত যাদব-সেনার চাপে গুঁড়িয়ে যাবে—সবান্ধবো বৃষ্ণিবলাভিভূতঃ। এই যুদ্ধে সাত্যকি আপাতত অর্জুনকে জড়াতে চান না। তার কারণ কৃষ্ণ-বাসুদেবের মতই অর্জুন তাঁর ভাই বন্ধু এবং গুরু—ভ্রাতা চ মে যঃ স সখা গুরুশ্চ। প্রথমত সাত্যকির ধারণা—তিনি নিজেই ওই কৌরববাহিনী ধ্বংস করতে সক্ষম, কিন্তু প্রথিতযশা বৃষ্ণিবীরদের সম্মানে তিনি একে একে প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, গদ, সারণ, চারুদেষ্ণ, অনিরুদ্ধ—ইত্যাদি বহুতর বীরদের নাম করলেন যাঁদের সামনে 'কৃপ-দ্রোণ-বিকর্ণ-কর্ণাঃ' দাঁড়াতেই পারবে না। সাত্যকি চান এখনই বৃষ্ণি, ভোজ, অন্ধকবংশীয়দের মুখ্য যোদ্ধারা যুদ্ধে যান এবং পৃথিবীকে নির্ধার্তরাষ্ট্র অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রহীন করে তুলুন। বলরামের চিন্তাকুল মুখের ওপর এইটাই সাত্যকির উচিত জবাব।

কৃষ্ণ সব শুনলেন। কিন্তু তিনি বলরামও নন, সাত্যকিও নন। অতএব এই মুহূর্তে যুদ্ধযাত্রা করার অযৌক্তিকতাটা কাটিয়ে দিলেন সুচতুর কৌশলে। কৃষ্ণ বললেন—সাত্যকি! তুমি যা বলেছ, সব সত্য। কিন্তু আসল কথাটা কি জান, এই ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব—এঁরা প্রত্যেকেই বীর। মহারাজ যুধিষ্ঠির কুরুকুলের প্রধান। এঁরা নিজের বাহুবলে যে ভূমি জয় করতে পারছেন না কিংবা যে যুদ্ধে এই বীরদের কোন হাতের ছোঁয়া থাকবে না, সে ভূমি এঁরা গ্রহণ করবেন কেন—স্বাভ্যাং ভুজাভ্যাম্ অজিতাস্তু ভূমিং/নেচ্ছেৎ কুরূণাম্ ঋষভঃ কথঞ্চিৎ। এই কথাটা বলেই কৃষ্ণ আসল কথাটা পাড়লেন। আসলে কৃষ্ণ কোন তাৎক্ষণিকতায় বিশ্বাস করেন না। তিনি চান সম্পূর্ণ রাজনৈতিকভাবে ধীরে ধীরে

এগোতে। ভারতযুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে এমন একটা রাজনৈতিক পরিস্থিতি তিনি তৈরী করতে চান, যাতে দেখা যাবে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সমস্ত শক্তিগুলি দুর্যোধন-ধৃতরাষ্ট্রের বিপক্ষে চলে গেছে। কৌরবদের বিরুদ্ধে সমস্ত বিরোধী রাজগোষ্ঠীগুলিকে জড়িয়ে নেবার জন্য তিনি সাত্যকিকে বললেন—যখন পাঞ্চাল রাজ্যের রাজা দ্রুপদ, কেকয় দেশের রাজা, চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু এবং অবশ্যই আমরা সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ব দুর্যোধনের ওপর, তখন আমাদের শত্রু বলে কেউ থাকবে না।

সত্যি কথা বলতে কি, কৃষ্ণের এই 'স্ট্র্যাটিজি' চরমুখে ধৃতরাষ্ট্রের কানে এসে পৌঁছেছিল। তীর্থ পর্যটন করে জনমত অনুকূলে নেওয়ার থেকেও, আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল পাণ্ডবদের বনবাস-পর্বে। এই ঘটনাটি হল, অর্জুনের মারণাস্ত্র সংগ্রহ। অর্জুন শিবের কাছ থেকে পাশুপত অস্ত্র লাভ করছেন, ইন্দ্রের বাসভূমি স্বর্গ থেকে লাভ করেছেন অনেক অস্ত্র-শস্ত্রের শিক্ষা। ঋষি দ্বৈপায়ন ব্যাসের মুখে এসব খবর শুনে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে পুনরায় জিজ্ঞাসা করেছেন, যদি তিনি কিছু বিস্তারিত খবর দিতে পারেন। বস্তুত পাশাখেলার অন্যায় এবং কুলবধূ দ্রৌপদীর অপমান ধৃতরাষ্ট্রের অন্তরে ভয়ঙ্কর আশঙ্কা জাগিয়ে তুলেছিল। দিনে-রাত তাঁর ঘুম হচ্ছিল না। পাঁচ ভাইয়ের একতা এবং ক্ষমতা, বৃষ্ণি-পাঞ্চালদের সহায়তা এবং সর্বশেষে বাসুদেব কৃষ্ণের সর্বাত্মক সুরক্ষা—এগুলি সবসময় ধৃতরাষ্ট্রকে মথিত করছে। পাণ্ডবদের বনবাসের এই মুহূর্তে তিনি হয়তো জানেন না যে, বৃষ্ণিবীর বলরাম ভবিষ্যতের ভারতযুদ্ধে যোগ দেবেন না। কিন্তু জানেন না বলেই তাঁর কেবলই মনে হচ্ছে যে, বলরাম এবং কৃষ্ণের দ্বারা চালিত বৃষ্ণি-বাহিনীর আক্রমণ-বেগ ধারণ করার ক্ষমতা দুর্যোধন-দুঃশাসনদের হবে না—ন শক্যঃ সহিতুং বেগঃ সর্বৈস্তৈরপি সংযুগে। তার ওপরে চরমুখে সঞ্জয় যেসব কথা শুনেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে—সেই যে বনবাসের অব্যবহিত পরে বৃষ্ণি, পাঞ্চাল, কেকয়, বিরাট এবং চেদিদেশের লোকেরা সব যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে বনে দেখা করলেন, সেসব খবর ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পৌঁছেছে। সঞ্জয় খবর দিয়ে বলছেন যে, কৃষ্ণ নাকি সেখানে প্রতিজ্ঞা করে যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন—তোমার রাজসূয় যজ্ঞে ইন্দ্রপ্রস্থে যে সমৃদ্ধি দেখেছি, সেই সমৃদ্ধি যারা ছিনিয়ে নিয়েছে তাদের জীবন শেষ করে আমি সেই সমৃদ্ধি আদায় করে ছাড়ব—আদায় জীবিতং তেষাম্ আহরিষ্যামি তামহম্।

সর্বসমক্ষে কৃষ্ণের এই প্রতিজ্ঞা প্রসঙ্গে এখানে কতগুলি দেশের নাম আছে। দেশগুলির মধ্যে যেমন অঙ্গ, বঙ্গ কলিঙ্গ ইত্যাদি আছে, তেমনি আছে চোল, পহ্লব, যবন, কিরাত, সিংহলীরাও। এঁদের সবাইকে নাকি রাজসূয় যজ্ঞে পাণ্ডবেরা ক্ষমতার জোরে পরিবেশকের কাজ করিয়েছিলেন। কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা হল—ওই সমস্ত রাজাদের পরাভূত করে যে সমৃদ্ধি পাণ্ডবরা পেয়েছিলেন সেই সমৃদ্ধি এখন কৌরবেরা ছিনিয়ে নিয়েছে। কৃষ্ণ এই সমৃদ্ধি পুনরায় পাণ্ডবদের জন্য আহরণ করতে চান। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমাদের কথা হল—যাঁরা পাণ্ডবদের দ্বারা পরাভূত হয়েছিলন, এবং যাঁদের দিয়ে রাজসূয় যজ্ঞে পরিবেশকের কাজ করানো হয়েছিল, তাঁরা পাণ্ডবদের ওপর ক্রুদ্ধ ছিলেন। ফলত তাঁরা যে অনেকেই ভারতযুদ্ধে কৌরব দুর্যোধনের পক্ষে যোগ দেবেন, এই রাজনীতিটা কিন্তু বোঝা

দরকার। এসব কথাও পরে আবার আসবে, আপাতত আমরা ধৃতরাষ্ট্রের ভীতি-প্রসঙ্গে ফিরে যাই। সঞ্জয় যেমন ধৃতরাষ্ট্রকে কাম্যক বনে কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা শুনিয়েছেন, তেমনি যুদ্ধের ব্যাপারে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চালদের সাংঘাতিক দৃঢ়তার কথাও জানিয়েছেন। বনপর্বে কৃষ্ণের এই প্রতিজ্ঞা, সাত্যকির যুদ্ধাহ্বানবাণী, পাঞ্চালদের দৃঢ়মুষ্টি মানসিকতা—সবই এক নতুন পরিণতি লাভ করেছে পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের শেষে।

পাণ্ডবেরা বনবাসে হাজারো তীর্থ ঘুরেছেন এবং সেগুলির নাম কীর্তন করতে গেলে দেখা যাবে তাঁর গোটা ভারতবর্ষই ঘুরেছেন। বারো বছরের শেষে তাঁরা কিন্তু অজ্ঞাতবাসের জায়গা বেছে নিয়েছেন বিরাটনগরে অর্থাৎ আধুনিক জয়পুরে। দিল্লির কাছেই। যাবার আগে তাঁরা পুরোহতি ধৌম্যকে পাঠিয়ে দিয়েছেন পাঞ্চালে, দ্রুপদের কাছে, আর ইন্দ্রসেন ইত্যাদি যেসব চাকর-বাকর ছিল—তাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন দ্বারকায়, কৃষ্ণের কাছে। দুটিই বন্ধুরাষ্ট্র। অজ্ঞাতবাস শেষ হল নির্বিঘ্নে এবং অজ্ঞাতবাসের শেষ দিনে অর্জুন সমস্ত কুরুবীরদের যুদ্ধে অজ্ঞান করে দিয়ে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার একটা আভাস দিয়ে দিলেন মাত্র। এবার ভারতযুদ্ধের উদ্যোগ পর্ব। কিন্তু তারও আগে আর একটা বড় ঘটনা ঘটে গেল। সেটা হল বিরাট রাজার মেয়ের সঙ্গে অর্জুনপুত্র অভিমন্যুর বিবাহ। অভিমন্যুর পরিচয় শুধু অর্জুনের ছেলে বলে নয়, তার চেয়েও বড় সে কৃষ্ণের ভাগ্নে—স্বস্রীয়ো বাসুদেবস্য...পুত্রো মম বিশাম্পতে। এই বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে মৎস্য দেশের সঙ্গে যাদবদের এবং পাণ্ডবদের এক বিরাট মিত্রশক্তি তৈরি হয়ে গেল। ব্যাপারটা এই রকম—জরাসন্ধ-শিশুপাল মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-মধ্যভারতীয় রাজনৈতিক শক্তির অবসান ঘটল, তেমনই ভারতযুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে উত্তর পশ্চিম ভারতীয় রাজনৈতিক শক্তির এক বিরাট অভ্যুত্থান ঘটল, যার নেতৃভাগে আছেন যাদব কৃষ্ণ, পাঞ্চাল দ্রুপদ, এবং দিল্লির প্রাক্তন রাজা যুধিষ্ঠির। এইবার উদ্যোগপর্ব।

মহাভারতের উদ্যোগপর্ব হল সেকালের রাজনৈতিক ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। উত্তরা-অভিমন্যুর বিয়ের পরদিনই বিরাট রাজার সভাগৃহে একটা জরুরী 'মিটিং' বসল। এই সভার 'প্রেসিডেন্ট' ছিলেন অবশ্যই বিরাট, কারণ তাঁর সভাগৃহেই 'মিটিং'টি বসেছে। তবে এই সভার 'কনভেনর' ছিলেন অবশ্যই পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ। এঁরা দুজনেই প্রথম আসন গ্রহণ করলেন—অথাসনানি আবিশতাং পুরস্তাদ্ উভৌ বিরাট-দ্রুপদৌ নরেন্দ্রৌ। এই বিরাট মন্ত্রণাসভায় প্রথম বক্তব্য রাখলেন কৃষ্ণ। ভাবে কুশল, নিরপেক্ষ যেন। আপনারাই বলুন কি করা যায়, কিসে পাণ্ডবদেরও ভাল হয়, দুর্যোধনেরও ভাল হয়—এমনি ধারা কথা প্রথম প্রথম। তারপর কুট-কুট করে—পাণ্ডবদের আপন রাজ্য, বাবার রাজ্য, নিজেরাই বানিয়েছিল—সবই নিয়ে নিল—সবই আপনারা জানেন—ইত্যাদি তাৎপর্যপূর্ণ কথা। সিদ্ধান্তে কৃষ্ণ দূত পাঠাতে বললেন দুর্যোধনের কাছে, কারণ তাঁর মতটা না জানলে আলোচনার মানেই হয় না।

কৃষ্ণের কথা কেড়ে নিয়ে বলরাম—মনে রাখবেন, পৌরবী কন্যা, পুরুবংশের মেয়ে রোহিণীর ছেলে বলরাম—তিনি বললেন—হ্যাঁ সেই ভাল দূত পাঠাও। তবে দূত গিয়ে যেন বেশ প্রণিপাত করে কথা বলে, তাঁদের যেন রাগিয়ে না

দেয়—সর্বাস্ববস্থাসু চ তে ন কোপ্যাঃ। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে পায়ে ধরে দুর্যোধনকে মধুর ভাষায় বুঝিয়ে-সুজিয়ে যেন দূত তার কাজ আদায় করে নেয়। বলরামের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে 'চেয়ার' ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন সাত্যকি, শিনিগোষ্ঠীর নেতা। শিনি অন্ধক-বৃষ্ণিদের ছোট ভাই, তাঁর বংশের শ্রেষ্ঠ নেতা সাত্যকি। তিনি একেবারে ভীষণ রাগে লাফিয়ে উঠলেন—সহসোৎপপাত। বললেন—যেমন মানুষ তার তেমনি ভাষণ। একই বংশে বীরও জন্মায় (কথাটা কৃষ্ণের দিকে লক্ষ করে), হিজড়েও জন্মায় (বলরামের দিকে), ঠিক যেমনটি একই গাছের এক ডালে ফল ধরে আরেক ডালে ধরে না। না, না আমি বলরামকে কিছু বলছি না, কিন্তু এখানে যারা বসে আছে তারা শুনছে কি করে ? এত অন্যায়ের পর আবার অত প্রণাম-ট্রনাম কিসের—কথং প্রণিপতেতায়ম্। নিজের বাপের রাজ্য নিজেরা চাইবে—তাতে আবার অত কি ? বলুন তো বাণের ঘায়ে আমি সব কটাকে এনে ফেলব যুধিষ্ঠিরের পায়ের তলায়—পাদয়োঃ পাতয়িষ্যামি কৌন্তেয়স্য মহাত্মনঃ। সাত্যকির সিদ্ধান্ত—হয় তারা রাজ্য দিক, নয় মরুক।

এবারে সাত্যকির কথা সম্পূর্ণ সমর্থন করলেন দ্রুপদ। বললেন—তুমি যা বলেছ ঠিক তাই, ভাল কথা দিয়ে দুর্যোধনকে বাগ মানানো যায় না, ওর দরকার মার। দ্রুপদ বললেন—কথায় বলে গাধার ব্যাপারে নরম, আর গরুর ব্যাপারে গরম—গর্দভে মার্দবং কুর্যাদ্ গোষু তীক্ষ্ণং সমাচরেৎ।[৬৫] দুর্যোধনের সঙ্গে নরম করে কথা বললেই, সে তাকে দুর্বল ভাবে। অতএব দ্রুপদের সিদ্ধান্ত হল—যুদ্ধ হবেই, সেক্ষেত্রে আগেভাগে ভারতবর্ষের সমস্ত রাজাদের কাছে দূত পাঠানো হোক। যাতে দুর্যোধনের দূত পাণ্ডবদের দূতের আগে সে সব জায়গায় না পৌঁছোয়, সেই ব্যবস্থা করতে হবে নইলে রাজারা অন্যরকম বুঝবেন। কৃষ্ণ দ্রুপদের সব কথা মেনে নিলেন, কিন্তু কৌরবদের কাছে সুযোগ্য দূত পাঠানোর ব্যবস্থাটা দ্রুপদকেই করতে বললেন। শুধু তাই নয়, যুদ্ধের পূর্বকল্পে কৃষ্ণ দ্রুপদকে যে কথাগুলো বললেন, তাতে সন্দেহ থাকে না যে, ভারতযুদ্ধের প্রধান পুরুষের পদটি দেওয়া হয়েছে এই পাঞ্চাল নৃপতিকেই। কৃষ্ণ বললেন—বয়েসে এবং বুদ্ধিতে আপনিই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। আপনি যা বলবেন শিষ্যের মত মেনে নেব আমরা—শিষ্যবচ্চ বয়ং সর্বে ভবামেহ ন সংশয়ঃ।

হয়তো এই কথাটা কৃষ্ণের পক্ষে বেশি বিনয়। কারণ কৃষ্ণ নিজেও জানতেন যে, ভবিষ্যৎ ভারতযুদ্ধে তাঁর মর্যাদা কতখানি, কিংবা তাঁর বাহিনীর মর্যাদা কতখানি। অর্জুনের শক্তিমত্তার মত কৃষ্ণের বুদ্ধিমত্তা তখন এতই বিখ্যাত হয়ে গেছে যে, তাঁর শত্রুপক্ষীয়েরা অন্য কাউকে তত মর্যাদা না দিলেও কৃষ্ণের সম্বন্ধে ভাবত যে, তিনি একাই সব—সর্বলোকেষু বরেণ্য একঃ। আর মিত্রপক্ষীয়েরা ভাবত যে, কৃষ্ণের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা জেনেও কে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করবে—বুদ্ধিমত্ত্বঞ্চ কৃষ্ণস্য বুধ্বা যুধ্যেত কো নরঃ। কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধের কথা থাক, এই মুহূর্তে দ্রুপদের সামনে কৃষ্ণের যে বিনয়-নম্র ভাবটুকু দেখলাম—এটাও তাঁর কূটবুদ্ধি। এই বুদ্ধির ফলেই দ্রুপদের দূত যখন কৌরব-সভায় গিয়ে ভাল-মন্দ পাঁচটা কথা বলে পাণ্ডবদের রাজ্য চাইল, তখন কর্ণ-দুর্যোধনের মত লোকেরা কৃষ্ণের কথা মাথাতেও আনলেন না। তাঁরা ভাবলেন—পাণ্ডবরা বুঝি শুধু পাঞ্চাল আর

মৎস্যরাজ বিরাটের ভরসায় পৈত্রিক রাজ্য ফিরে চান—বলমাশ্রিত্য মৎস্যানাং পাঞ্চালানাঞ্চ পার্থিবঃ। কিন্তু কুরুসভার বৃদ্ধেরা এটা বুঝতেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ এমনকি ধৃতরাষ্ট্রও যথেষ্ট বুঝতেন। সেকথা আগেও বলেছি, পরেও আবার আসবে, এই উদ্যোগপর্বেই আসবে। আপাতত দ্রুপদ কৃষ্ণের কথা শুনে কুরুসভায় দূত পাঠাবেন বলে কথা দিলেন। অন্যদিকে বিরাট রাজা ভারতবর্ষের অন্য রাজাদের উদ্দেশ্যে দূত পাঠাতে থাকলেন, পূর্বাহ্ণেই পাণ্ডব-সমর্থক জোগাড় করার জন্য। চরের মুখে সেটা শুনে দুর্যোধনও দূত পাঠাতে আরম্ভ করলেন, আর নিরপেক্ষ বক্তার মত বৈশম্পায়ন মন্তব্য করলন—সমস্ত ভারতবর্ষ তখন কুরু-পাণ্ডবের জন্য আকুল হয়ে উঠল—সমাকুলা মহী রাজন্ কুরুপাণ্ডবকারণাৎ।

দ্রুপদের দূত কৌরবসভায় এল বটে, তবে সে বেশি কিছু করতে পারল না। কিন্তু একটা ব্যাপারে সে কিঞ্চিৎ সফল হল। কুরুবৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মনে সে পাণ্ডব-পাঞ্চাল-যাদবদের জোট সম্বন্ধে একটা ভীতি তৈরি করে দিতে পারল। সঞ্জয়কে পাণ্ডসভায় দূত করে পাঠানোর সময় ধৃতরাষ্ট্রের মুখে আমরা এখন পাঁচ ভাই পাণ্ডবদের সঙ্গে দ্রুপদ নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, বৃষ্ণিসিংহ কৃষ্ণ, সাত্যকি এবং অন্যান্যদের সম্বন্ধে প্রশংসাবাণী শুনতে পাচ্ছি।

অবশ্য ধৃতরাষ্ট্রের মুখে আমরা যে এই প্রশংসা-বাণী শুনতে পাচ্ছি, তার কারণও আছে। কারণ ততদিনে ভারতবর্ষের রাজারা কে কোন পক্ষে যাচ্ছেন, তার একটা হিসেব পাওয়া গেছে। আমরা সেই হিসেবের মধ্যে এখন যাব, কারণ ধৃতরাষ্ট্রের কাছেও আমরা সেই হিসেব একভাবে পাব। দ্রুপদের পুরোহিত ফিরে যাবার পর ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে দূত করে যুধিষ্ঠির-বিরাট-দ্রুপদের কাছে পাঠালেন। কিন্তু সঞ্জয়কে পাঠানোর আগেই দেখা যাচ্ছে—ধৃতরাষ্ট্র ভয় পাচ্ছেন। ভীম-অর্জুনের স্মরণ মাত্রেই তাঁদের পূর্ব-বীরত্ব কাহিনী ধৃতরাষ্ট্রের মনে পড়ছে। সেই সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্র বলছেন—আমি শুনেছি যে, সোমকবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ দ্রুপদ পাত্রমিত্র, পুত্র-পরিজনসহ যোগ দিয়েছেন পাণ্ডবপক্ষে।

দ্রুপদের খবর আমরা আগেই পেয়েছি। তিনি নানা দেশ থেকে সংগ্রহ করা—নানাদেশ সমাগতৈঃ—এক বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে পাণ্ডবের পক্ষে যোগ দিয়েছেন। মৎস্যদেশের রাজা বিরাটের বাহিনীতে যে ধরনের সৈন্যই থাকুক, তিনি কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলের কতকগুলি রাজাকে পাণ্ডবদের পক্ষে নিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছিলেন—পার্বতীয়ৈ মহীপালৈঃ সহিতঃ পাণ্ডবান্ ইয়াৎ।[৬৬] ধৃতরাষ্ট্র লক্ষ করেছেন যে, সাত্যকিও পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়েছেন। কি রকম সাত্যকি ? না, যিনি দ্রোণ, অর্জুন, কৃষ্ণ, কৃপ এমনকি ভীষ্মের কাছেও অস্ত্রবিদ্যা অধিগত করেছেন। পূর্বে আমরা খবর পেয়েছি যে, সাত্যকিও যে সেনা-সংগ্রহ করেছিলেন তার মধ্যে ছিল বহু দেশের সেনা। মহাভারতকার সানুবন্ধে সাত্যকির মিশ্রসেনার বহুতর অস্ত্রশস্ত্রের বর্ণনা পর্যন্ত দিয়েছেন, আর একটি উপমা দিয়ে বলেছেন যে, সাত্যকির সৈন্যদল যুধিষ্ঠিরের সেনাবাহিনীতে মিশে গেল, ঠিক যেমন ছোট নদী সাগরে মিশে নিজের অস্তিত্ব বিলীন করে দেয়, সেইরকম—সাগরং কুনদী যথা। ধৃতরাষ্ট্র কিন্তু এই সাত্যকি, দ্রুপদ কিংবা বিরাটের থেকেও বেশী ভয় পান কৃষ্ণকে, কারণ পাণ্ডব-প্রধান যুধিষ্ঠিরেরও

সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি—যেষাং স স্যাদ্ অগ্রণী বৃষ্ণিসিংহঃ।[৬৭]

কৃষ্ণকে এইরকম ভয় পাবার একটা বাস্তব কারণ আছে ধৃতরাষ্ট্রের মনে। সেটা হল, কৃষ্ণের শিশুপাল-হত্যার প্রতিক্রিয়া। ধৃতরাষ্ট্র জানেন যে, কৃষ্ণ যে শিশুপালকে পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞে মেরে ফেলেছিলেন, সে তাঁর নিজের জন্য যতখানি, তার চেয়ে অনেক বেশি পাণ্ডবদের সুবিধের জন্য, পাণ্ডবদের যশ-মান বৃদ্ধির জন্য—যশোমানং বর্ধয়ন্ পাণ্ডবানাং পুরাভিনচ্ছিশুপালং সমীক্ষ্য। আগে যে শিশুপালকে করূষ প্রভৃতি দেশের রাজারা উৎসাহ যোগাচ্ছিল, সেই তারাই কৃষ্ণকে শিশুপালের বিরুদ্ধে এগোতে দেখে সিংহ-দেখা হরিণের মত পালিয়ে গেল আর কৃষ্ণও শিশুপালকে মেরে ফেললেন। সেই শিশুপালহন্তার নানা ক্রিয়াকর্ম স্মরণ করে ধৃতরাষ্ট্রের মনে কোন শান্তি নেই—নাধিগচ্ছামি শান্তিম্। দুটি কালো মানুষ—কৃষ্ণ আর অর্জুনকে একই রথে দেখে ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয় কাঁপছে—প্রবেপতে মে হৃদয়ং ভয়েন।

কৃষ্ণ আর অর্জুন একই রথে থাকা মানে অবশ্যই বুদ্ধি আর বল এক জায়গায় হওয়া। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মত বিরাট যুদ্ধ শুধু কৃষ্ণার্জুনের ক্ষমতায় সম্পন্ন হয়েছিল, একথা বোধ হয় স্বয়ং কৃষ্ণার্জুনই স্বীকার করবেন না। কাজেই সাত্যকি, বিরাট, দ্রুপদ ছাড়াও আর কারা পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়েছেন সেটাও আমাদের জানতে হবে। আমরা আগেও একটু টের পেয়েছি যে, বিয়াস-শতদ্রুর মধ্যবর্তী কেকয় দেশের রাজাদের সঙ্গে পাণ্ডবদের যোগাযোগ ছিল। বনবাসের সময় তাঁরা কৃষ্ণ-ধৃষ্টদ্যুম্নের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে কথা করতেও এসেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের সময় এই কেকস দেশের ব্যাপারটা একটু অন্যভাবে লক্ষ করতে হবে। মহাভারতে যেখানে রাজারা পাণ্ডব-কৌরবের পক্ষ অবলম্বন করছেন, সেখানে দেখা যাচ্ছে কেকয় দেশের পাঁচ রাজপুত্র বা রাজা কৌরবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন এবং এতে কৌরবদের খুব আনন্দও হয়েছে—সংহর্ষয়ন্তঃ কৌরব্যম্ অক্ষৌহিণ্যা সমাদ্রবন্।[৬৮] কিন্তু একটু পরেই দেখছি ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বলছেন—কেকয় দেশের পাঁচ ভাই পাঁচ রাজপুত্র, যাঁরা নাকি যথেষ্ট শক্তিমান বলে পরিচিত, তাঁরা কেকয় দেশের উত্তরাধিকার চান বলে, মূল রাজ্য থেকেই নির্বাসিত হয়েছেন এবং রাজ্যের অভিলাষে তাঁরা পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়েছেন—অবরুদ্ধা বলিনঃ কেকয়েভ্যো/মহেষ্বাসা ভ্রাতরঃ পঞ্চ সন্তি। কৈকয়েভ্যো রাজ্যম্ আকাঙ্ক্ষমাণা/যুদ্ধার্থিনশ্চানুবসন্তি পার্থান্ ॥[৬৯]

ব্যাপারটা একটু বোঝা দরকার। আমরা এই উদ্যোগপর্বের আগে বহু জায়গায় কেকয়দের নাম পেয়েছি পাণ্ডবদের মিত্রশক্তির মধ্যে। সেখানে হঠাৎ এই কেকয়েরা এক অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে দুর্যোধনের পক্ষে যোগ দিলেন—এই কথাটা বিভ্রান্তিকর। আবার বিভ্রান্তিকর নয় এইজন্য যে, ধৃতরাষ্ট্র বলছেন—কেকয়দের পাঁচ রাজপুত্র কেকয় রাজ্য চান বলে কেকয় থেকে নির্বাসিত হয়েছেন—অবরুদ্ধা বলিনঃ কেকয়েভ্যঃ। তথা চ রাজ্য প্রাপ্তির আশাতেই তাঁরা পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়েছেন। বোঝা যাচ্ছে—এই পাঁচ ভাই হলেন 'ডিফেক্টর'। কিন্তু কথা হল, এঁরা কবে থেকে 'ডিফেক্টর'? মনে রাখতে হবে, এঁদের আমরা পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করতে দেখেছি বনবাস

কালে—কেকয়াশ্চ মহাবীর্যা ভ্রাত্যরা লোকবিশ্রুতাঃ। আবার একটু আগেই দেখেছি তাঁরা, মানে সেই পাঁচ কেকয় রাজপুত্রই—সোদর্য্যাঃ পঞ্চ পার্থিবাঃ—এক অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে কৌরবপক্ষে যোগ দিয়েছেন। তারপর এখন ধৃতরাষ্ট্রের মুখে শেষ সংবাদ পাচ্ছি যে, তারা রাজ্যের লোভে শেষ পর্যন্ত পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়েছেন—কেকয়েভ্যো রাজ্যম্ আকাঙ্ক্ষমাণাঃ। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে—কোন্ পক্ষে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করবেন, এই ভাবনা নিয়ে ওই পাঁচ ভাই শেষ পর্যন্তও একটু ভাসমান অবস্থায় ছিলেন। হয়তো প্রথমে এঁরা কৌরবপক্ষেই যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু তারপর দুই পক্ষের চরম বলাবল নির্ণয় করে পাণ্ডবদেরই বেশি বলবান মনে করেছেন, এবং সেই পক্ষেই যোগ দিয়েছেন। ধৃতরাষ্ট্রের ভাষায় তাই এক ধরনের খেদ ধ্বনিত হয়েছে, যেটা টীকাকার নীলকণ্ঠ ঠিক ধরেছেন। অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্র বলছেন—কেকয়দেশের ওই বলবান পাঁচ রাজপুত্র আগে আমাদের দলেই ছিল, কিন্তু আপন রাজ্য প্রাপ্তির ব্যাপারে তাঁরা পাণ্ডব পক্ষকেই বেশি নির্ভরযোগ্য মনে করে শেষ পর্যন্ত সেই পক্ষেই যোগ দিয়েছেন—কেকয়েভ্যঃ রাজ্যং প্রাপ্তুম ইচ্ছন্তঃ পূর্বম্ অস্মদীয়াঃ অপি সম্প্রতি পাণ্ডবান্ অনুবসন্তি অনুসরন্তি। তেন চ স্বপক্ষহানিঃ পরপক্ষপুষ্টিশ্চ দর্শিতা।[৭০]

সত্যি কথা বলতে কি, কেকয় রাজপুত্রেরা যে কৌরবপক্ষকে শেষ পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য মনে করলেন না, তার কারণও আছে। পাণ্ডব এবং কৌরব—এই দুই রাজবংশের সঙ্গেই যাঁদের যোগাযোগ ছিল এবং যাঁরা রাজনীতি বুঝতেন, তাঁরা সবাই জানতেন যে, ভীষ্ম এবং দ্রোণ—এই দুই মহাবীর। যাঁদের ওপর দুর্যোধন সবিশেষ নির্ভর করতেন—সেই দুই মহাবীরই পাণ্ডবদের কাউকে মারবেন না। কথাটা যুদ্ধের আগে ওই উদ্যোগ পর্বেই ভীষ্ম যেমন প্রকাশ করেছেন, দ্রোণও তেমনি প্রকাশ করেছেন। ভীষ্ম বলেছিলেন—আমি আর সব করতে পারি, কিন্তু পাণ্ডবদের কাউকে মেরে ফেলছি—সেটি আমার দ্বারা হবে না বাপু—ন ত্বেবোৎসাদনীয়া পাণ্ডোঃ পুত্রা নরাধিপ। একইভাবে দ্রোণাচার্যও জানিয়েছেন যে, পাণ্ডবরা দ্রোণের সঙ্গে যুদ্ধ করে সুখ পাবে না মোটেই ; কিন্তু দ্রোণ একবারও কথা দেননি যে তিনি পাণ্ডবদের কাউকে মারবেন। বরঞ্চ কথাটা একেবারে উহ্য রেখে দুর্যোধনকে তিনি বুঝিয়েছেন—দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে তিনি বধ করতে পারবেন না—পার্যতস্তু রণে রাজন্ ন হনিষ্যে কথঞ্চন।

এই সমস্ত কথাই সর্বসমক্ষে পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন রাজমাতা গান্ধারী। দুর্যোধনকে যুদ্ধ থেকে বিরত করবার জন্য তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন—তুমি যে ভাবছ বাছা, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ—এঁরা সব সর্বশক্তি নিয়ে তোমার জন্য যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বেন, তা কিন্তু আমি মনে করি না—যোৎস্যন্তে সর্বশক্ত্যেতি নৈতদ্ অদ্যোপপদ্যতে। গান্ধারী বলেছেন—পাণ্ডব এবং কৌরব—এই দুই পক্ষই ভীষ্ম-দ্রোণের কাছে সমান, উপরন্তু তাঁদের বাড়তি নির্ভর হল ধর্মবোধ—পাণ্ডবেষু অথ যুস্মাসু ধর্মস্তু অধিকস্ততঃ। কাজেই পাণ্ডবদের কাউকে তাঁরা মারবেন না। গান্ধারী যেমন বললেন, তেমনি ভীষ্ম-দ্রোণের এই ভাবনা তখনকার সমস্ত রাজনৈতিক মহলেও বহুল প্রচারিত ছিল। বিশেষত সবাই এটা জানতেন যে, কৌরবদের রাজসভায় বসেও ওই ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপেরা

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পাণ্ডবদের পক্ষ হয়ে কথা বলেছেন। এমন অবস্থায় সমস্ত মানসিক পক্ষপাত নিয়েও ভীষ্ম-দ্রোণেরা পাণ্ডবদের মারবেন না—এটা গান্ধারীর মত অনেকেরই জানা ছিল। তাহলে ভীষ্ম-দ্রোণের মত প্রথিতযশা যোদ্ধারাই যদি কৌরবদের হয়ে সর্বশক্তি নিয়ে যুদ্ধ না করেন, তাহলে তাঁদের মৃত্যুর পর কিই বা সুবিধে হবে কৌরবদের। এই বাস্তব কথাটা প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্রও জানেতন, এবং জানতেন বলেই ভীষ্ম-দ্রোণের পর দুর্যোধন, কর্ণ শকুনি আর দুঃশাসন ছাড়া কোন পঞ্চম ব্যক্তির পক্ষে যে পাণ্ডবদের একটুও রোখা সম্ভব নয়, সেটা বুঝে গিয়েছিলেন—দুঃশাসন-চতুর্থানাং নান্যং পশ্যামি পঞ্চমম্। কিন্তু আমাদের কথা হল—এই সত্যটা শুধু ধৃতরাষ্ট্র কেন, যাঁরা রাজনীতিবিদ এবং সুযোগ সন্ধানী তাঁরা সবাই বুঝেছেন। কাজেই দুর্যোধনের পক্ষে এগার অক্ষৌহিণী সেনার বিরাট সংখ্যাটা যতই স্বস্তিবাচক হোক না কেন, বাস্তবে কিন্তু তৎকালীন ভারতবর্ষের নামজাদা রাজা-রাজপুত্রেরা সবাই ছিলেন পাণ্ডবদের পক্ষে।

ভাবনার কথা হল, এই সত্যটা ধৃতরাষ্ট্র পরে যেমন উপলব্ধি করেছিলেন, আগে তা করেননি। বিশেষত কেকয়, বিরাট কি অন্য কোন রাজার কথা ছেড়েই দিন, শুধুমাত্র বৃষ্ণিদের সঙ্গে পাণ্ডবদের কিংবা শুধুমাত্র পাণ্ডব-পাঞ্চাল জোটটাই যে কত সাংঘাতিক হতে পারে, এটা ধৃতরাষ্ট্র তেমন করে বোঝেননি। সঞ্জয় নিজেও বিরাটরাজার বাড়িতে পাণ্ডবসভা থেকে ফিরে এসে পাণ্ডব-পাঞ্চালদের ভয়ই দেখিয়েছেন। আরেকটু পরিষ্কার করে সঞ্জয় বলেছেন—মহারাজ! আজকাল মৎস্যদেশের লোকেরা আর আপনাকে পছন্দ করে না, পছন্দ করে না বিয়াস-শতদ্রুর মাঝখানে থাকা কেকয়দেশের লোকেরাও। পাঞ্চালেরা তো আপনাকে রীতিমত অবজ্ঞা করে—মৎস্যাস্ত্বামদ্য নার্চন্তি পাঞ্চালাশ্চ সকেকয়াঃ—শাল্বরাজার বাহিনী তো এখন কৃষ্ণের হাতে, অতএব শাল্ব এবং শৌরসেনী বৃষ্ণিরাও আপনাকে অবজ্ঞা করে—শাল্বেয়া শূরসেনাশ্চ সর্বে ত্বাম্ অবজানতে।[৭১]

ধৃতরাষ্ট্র কারও কথা শোনেননি, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, কারও কথা শোনেননি, কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁদের কথা বলে দুর্যোধনকে কিন্তু সাবধানও করছেন। যুদ্ধে কুরুবংশীয়দের জয়-পরাজয় নিয়ে তাঁর মনে দ্বিধা আছে এবং সেই জন্যই সঞ্জয়কে একসময় বলেছেন—বল তো সঞ্জয়! পাণ্ডবদের সমর্থনে তুমি কোন কোন রাজাকে এককাট্টা হতে দেখেছ? সঞ্জয় আবার পুরনো কথা ফেঁদেছেন এবং এই মুহূর্তে আমাদেরও সেই সম্মিলিত শক্তির একটা হিসেবনিকেশ প্রয়োজন। সঞ্জয় বলেছেন—যাঁদের দেখলাম সেখানে, তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন অন্ধক-বৃষ্ণিদের কুলতিলক কৃষ্ণ। অন্যান্য যাদববীরদের মধ্যে সাত্যকি আর চেকিতান তো আছেনই। এর পরেই সঞ্জয় নাম করেছেন পাঞ্চালদের ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডীসহ দ্রুপদ এবং তাঁর সেনাবাহিনীর। পাণ্ডবদের পক্ষে আরও যোগ দিয়েছেন বিরাট সপুত্র, সভ্রাতা। লক্ষণীয় বিষয় হল—মগধরাজ জরাসন্ধের ছেলে সহদেব, চেদিপতি শিশুপালের ছেলে ধৃষ্টকেতু—এঁরা সবাই পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়েছেন। বলতে পারেন, ভীমের ভয়ে, কি কৃষ্ণের ভয়েই এই দুইজন পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু আমরা জানি, শত্রু মেরে ফেলার পর তাঁর পুত্র-পৌত্রদের ওপর দয়া দেখিয়ে তাঁদের বংশবদ করে ফেলার ব্যাপারে কৃষ্ণ

ছিলেন ওস্তাদ। কাশ্মীরাধিপতি গোনন্দের বংশে একজন স্ত্রীলোককে পর্যন্ত এইভাবে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন কৃষ্ণ—সেকথা রাজতরঙ্গিণীকার বড় আড়ম্বর করে বলেছেন। আমরা রাজতরঙ্গিণীর প্রমাণে পূর্বে উল্লেখ করেছি কাশ্মীরাধিপতি গোনন্দ জরাসন্ধের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যাদবদের সঙ্গে যুদ্ধে করতে গিয়েছিলেন এবং তিনি বলরামের হাতে মারা পড়েন। এই গোনন্দের পর কাশ্মীরে রাজা হন তাঁর ছেলে দামোদর। সমৃদ্ধ কাশ্মীর রাজ্য লাভ করেও তিনি কিন্তু বলরামের হাতে পিতৃবধের কথা ভেবে ভেবে মনে একটু শান্তি পেলেন না। কল্হন লিখেছেন—এই রকম মানসিক অবস্থায় গোনন্দের ছেলে দামোদর একদিন শুনতে পেলেন যে, সিন্ধুনদীর তীরে গান্ধার রাজ্যে এক কন্যা-স্বয়ংবর উপলক্ষে বৃষ্ণিবংশীয়রা আমন্ত্রিত হয়েছেন। এ কথা শুনেই দামোদরের মেজাজ গরম হয়ে উঠল। তারপর যখন যাদবেরা প্রায় গান্ধার রাজ্যের কাছাকাছি এসে পড়েছে, তখন সৈন্যবাহিনীর ঘোড়ার খুরে ঘনিয়ে-ওঠা ধুলোয় আকাশ আচ্ছন্ন করে যুদ্ধযাত্রা করলেন দামোদর। বৃষ্ণিদের সঙ্গে দারুণ যুদ্ধ হল দামোদরের এবং কৃষ্ণ-নিক্ষিপ্ত সুদর্শন চক্রের আঘাতে স্বর্গত হলেন দামোদর। যদুকুলের প্রধান পুরুষ কৃষ্ণ তখন মৃত দামোদরের গর্ভবতী স্ত্রী যশোবতীকে ব্রাহ্মণদের দ্বারা কাশ্মীর রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। একজন স্ত্রীলোকের অভিষেকে কাশ্মীর রাজ্যের মন্ত্রীরাই ভীষণ অসূয়াপরায়ণ হয়ে উঠেছিলেন। কৃষ্ণ তখন এমন সুন্দর একটি বক্তৃতা দেন যে, সবাই যশোবতীকে দেবতার মত দেখতে থাকেন। শেষে সময় পূর্ণ হলে যশোবতীর একটি সুন্দর ছেলে হল—দগ্ধ বংশতরুর প্রথম অঙ্কুরের মত। এই পুত্রটিকে শিশুকালেই ব্রাহ্মণেরা রাজ্যে অভিষেক করলেন, এবং তাঁর পিতামহের নামেই তাঁর নাম হল গোনন্দ। অর্থাৎ ইনি দ্বিতীয় গোনন্দ।[৭২]

এত সব কথা বলে রাজতরঙ্গিণীকার মন্তব্য করেছেন যে, কাশ্মীরের রাজা গোনন্দ নিতান্ত শিশু অবস্থায় ছিলেন বলেই কুরু-পাণ্ডবেরা কেউই তাঁকে যুদ্ধে সহায়তার জন্য ডাকেননি। আমরা জানি, যদি ডাকা হত তাহলে তিনি অবশ্যই পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিতেন, কারণ দ্বিতীয় গোনন্দের জননী যশোবতী এবং কাশ্মীর রাজ্যের ব্রাহ্মণ-মন্ত্রীরা উৎখাত রাজকুল রক্ষার ব্যাপারে কৃষ্ণের কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করতেন। পররাষ্ট্রনীতিতে কৃষ্ণের এই কুশলতার জন্যই জরাসন্ধের ছেলে সহদেব এবং জয়ৎসেন—জারাসন্ধিঃ সহদেবো জয়ৎসেনশ্চ তাবুভৌ—পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়েছেন। আবার দেখুন—অন্য দিকে চেদিরাজ শিশুপালকে কৃষ্ণ নিজেই বধ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর রাজ্য অধিগ্রহণ করেননি। বরঞ্চ যে মুহূর্তে শিশুপাল কৃষ্ণের হাতে মারা পড়লেন এবং তাঁর মরদেহের সংস্কার যে মুহূর্তে শেষ হল, সেই মুহূর্তেই চেদিদেশের আধিপত্য দেওয়া হল শিশুপালের ছেলে ধৃষ্টকেতুকে—চেদীনাম্ আধিপত্যে চ পুত্রমস্য মহীপতেঃ। অভ্যষিঞ্চৎ তদা পার্থঃ সহ তৈর্বসুধাধিপৈঃ॥[৭৩]শুধু রাজ্য দেওয়াই নয়, পরবর্তী সময়ে চতুর্থ পাণ্ডব নকুলের সঙ্গে শিশুপালের মেয়ে অর্থাৎ ধৃষ্টকেতুর বোন করেণুমতীর[৭৪] বিয়ে হওয়ার ফলে পাণ্ডব-বৃষ্ণিদের সঙ্গে শিশুপালপুত্রের যোগাযোগ আরও বেড়েছে। কিন্তু এসব কিছুই যে ঘটেছে, তার পেছনে সেই বিরাট কূটনীতিবিদ কৃষ্ণের বুদ্ধি কাজ করেছে বলে আমাদের বিশ্বাস। একই

ঘটনা ঘটেছে জরাসন্ধ-বধের পরেও। জরাসন্ধের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে সহদেব একটু ভয়ে ভয়ে কৃষ্ণকে নানা উপঢৌকনে তুষ্ট করতে চাইলেন। কৃষ্ণ তাঁকে একটুও অপমান না করে সাদরে তাঁর উপায়ন-আপ্যায়ন গ্রহণ করে সেই মুহূর্তেই পাণ্ডবদের সঙ্গে একযোগে জরাসন্ধপুত্র সহদেবকে মগধের রাজত্বে অভিষেক করলেন—অভ্যষিঞ্চৎ তত্রৈব জরাসন্ধাত্মজং মুদা।[৭৫] একই সঙ্গে খেয়াল করা উচিত, জরাসন্ধের মেয়েকেও বধূ করে নিয়ে আসা হয়েছিল পাণ্ডবদের ঘরে। কনিষ্ঠ পাণ্ডব সহদেবের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। সম্পূর্ণ মহাভারতে এই উপেক্ষিতা রমণীর পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু সেই আশ্রমিকপর্বে যেখানে বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র বাণপ্রস্থে দিন কাটাচ্ছেন, সেইখানে আশ্রমবাসী ঋষিরা যখন আশ্রমে উপস্থিত যুধিষ্ঠির ইত্যাদির পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন, তখন একে একে বধূ-পরিচয়ের সূত্রে সহদেবের তৃতীয়া স্ত্রীর নামটি পাওয়া যাচ্ছে। সঞ্জয় পরিচয় দিয়ে বললেন—এই যে চাঁপা ফুলের মত গায়ের রঙ বউটিকে দেখছেন, ইনি মগধরাজ জরাসন্ধের মেয়ে—ইয়ং চ রাজ্ঞো মগধাধিপস্য সুতা জরাসন্ধ ইতি শ্রুতস্য। ইনি কনিষ্ঠ পাণ্ডব মাদ্রীপুত্র সহদেবের স্ত্রী—যবীয়সো মাদ্রবতীসুতস্য ভার্যা মতা চম্পকদামগৌরী[৭৬]

আমরা যে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধকথা থেকে বৈবাহিক রসে চলে এলাম, তা এমনি এমনি নয়। আমরা বলতে চাই পরাজিতের সঙ্গে সুমধুর ব্যবহার করে, তাকে রাজ্যদান করা যাঁর স্বাভাবিক চরিত্র এবং কূটনীতির মধ্যে পড়ে, এই বিবাহ-ঘটনাগুলিও তাঁরই ইচ্ছায় ঘটেছে বলে আমরা মনে করি। অসময়ে কৃষ্ণের এই সব বুদ্ধি-ঘটনার ফলেই, আজ উদ্যোগপর্বে এসে কৌরব ধৃতরাষ্ট্র ভয় পাচ্ছেন যে, চেদি-করূষ ইত্যাদি দেশের সমস্ত রাজারা মহা উদ্যোগে পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়েছেন—উপাশ্রিতাশ্চেদিকরূষকাশ্চ সর্বোদ্ যোগৈ র্ভূমিপালাঃ সমেতাঃ। আমরা এর আগেই মহাভারতের কথক ঠাকুর, বৈশম্পায়নের কাছে যে খবর পেয়েছি, তাতে ধৃতরাষ্ট্রের ভয়ের কারণও আছে। পাণ্ডবদের সাত অক্ষৌহিণী সেনার মধ্যে এক অক্ষৌহিণী জোগাড় করে নিয়ে এসেছিলেন শিশুপালের ছেলে ধৃষ্টকেতু, আরেক অক্ষৌহিণী এনেছিলেন জরাসন্ধের ছেলে সহদেব, জয়ৎসেন।[৭৭]

মনে রাখা দরকার—বৃষ্ণি, কেকয়, মগধ, চেদি, করূষ, মৎস্য—যে দেশ যত শক্তি নিয়েই পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিন না কেন, পাণ্ডবদের মূল নির্ভর ছিলেন কিন্তু পাঞ্চালরাই। যুদ্ধোদ্যোগ পর্বে কার সঙ্গে কারা যুদ্ধ করবেন—এই কথা যদি অতি সংক্ষেপে কোথাও বলতে হয়েছে, তাহলে পাণ্ডবদের সঙ্গে কিন্তু বেশির ভাগ সময় একটি দেশের বা একটি জাতির নামই এসেছে এবং তা হল পাণ্ডু-পাঞ্চাল বা পাণ্ডব-সৃঞ্জয় অথবা এইরকম একটা কিছু। এমন কি কৃষ্ণ যখন শেষবারের মত দূত হয়ে কৌরবসভায় যাবেন, সে সময় পাণ্ডব কুলবধূ দ্রৌপদী কৃষ্ণকে বলেছিলেন—খবরদার! কৃষ্ণ! সন্ধি কোর না, কেন না সৃঞ্জয়-পাঞ্চালেরা সঙ্গে থাকলে পাণ্ডবরা নিশ্চয়ই কৌরবদের সহজেই মোকাবিলা করতে পারবে—পাণ্ডবাঃ সৃঞ্জয়ৈঃ সহ। ধার্তরাষ্ট্রবলং ঘোরং ক্রুদ্ধং প্রতিসমাসিতুম্॥ দ্রৌপদী মনে করেন পাণ্ডব-পাঞ্চালদের সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণই কৌরবদের ওপর সেই মহাদণ্ড নিক্ষেপ করুন—ত্বয়া চৈব মহাবাহো পাণ্ডবৈঃ

সৃঞ্জয়ৈঃ সহ। আসলে দ্রৌপদী কৌরবসভায় যে ভাবে অপমানিত হয়েছিলেন, তাতে তাঁর পক্ষে সন্ধির প্রস্তাব একেবারে অসহ্য। তার মধ্যে আবার যখন তিনি দেখলেন যে, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন সবারই কেমন একটু গলা গলা ভাব, যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই—এমনধারা প্রস্তাব, তখন সুন্দরী কৃষ্ণা আর থাকতে পারলেন না। তিনি তাঁর পূর্ব অপমানগুলি পুনরায় সবিস্তারে কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন—যদি ভীম-অর্জুনের মত মানুষও সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হন এবং তাঁদের দয়া যদি অত উথলে ওঠে, তাহলে থাক, তাঁদের আর যুদ্ধ করতে হবে না। আমার অপমান মাথায় নিয়ে আমার বুড়ো বাবা, আমার ভাইয়েরা, আমার ছেলেরা যুদ্ধ করবে—পিতা মে যোৎস্যতে বৃদ্ধঃ সহ পুত্রৈ র্মহারথৈঃ।

এইটা একটা ব্যাপার। আমরা আগেই বলেছি যে, ভারতযুদ্ধের তাৎক্ষণিক কারণ ছিল দ্রৌপদীর অপমান এবং হয়তো সেই কারণেই পাঞ্চালদের গুরুত্ব এখানে সবচেয়ে বেশি। এ ছাড়া দ্রোণের সঙ্গে ব্যক্তিগত বিরোধ, বংশানুক্রমিক ঝগড়া—এই সবগুলি কারণই যুধিষ্ঠিরের সাত অক্ষৌহিণী বাহিনীর মধ্যে পাঞ্চালদের গুরুত্ব বাড়িয়েছে। বৈবাহিক সম্বন্ধে পাঞ্চালদের সম্বন্ধ-গৌরব তো আছেই। এই কারণে পাণ্ডবপক্ষের কৃষ্ণই হোন অথবা দ্রৌপদীই হোন কিংবা কৌরব পক্ষের ধৃতরাষ্ট্রই হোন অথবা কর্ণ-দ্রোণই হোন—সবাই পাণ্ডবদের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে পাঞ্চালদের নাম উল্লেখ করেন। মজা হল, পাণ্ডব পক্ষ যে সব সময় পাঞ্চালদের ঘাড়ে ভর করে আছেন, এবং এই বিরাট যুদ্ধে ক্ষতি যে শুধু পাঞ্চালদের আর কৌরবদের—এ কথাটা নেপোয় দই মারার মত পাণ্ডবেরাও জানতেন। কৌরবদের দূত হিসেবে আসা সঞ্জয়কে স্বয়ং অর্জুন গ্রহবিপ্র জ্যোতিষীদের দৈববাণী শুনিয়ে বলেছেন—এ যুদ্ধে ক্ষতি হবে শুধু কুরুদের আর সৃঞ্জয়-পাঞ্চালদের, মাঝখান জয়লাভ করবে পাণ্ডবরা—ক্ষয়ং মহান্তং কুরু-সৃঞ্জয়ানাং নিবেদয়ন্তে পাণ্ডবানাং জয়ঞ্চ।[৭৮]

এটা না হয় একটা কথার কথা বললাম। এ রকম হাজার বার পাণ্ডু-সৃঞ্জয়, পাণ্ডব-পাঞ্চালদের কথা শোনা যাবে। কর্ণ ঘটোৎকচকে একাঘ্নী বাণ দিয়ে মারলেন, আর ধৃতরাষ্ট্র বললেন—এ কি রকম হল! অর্জুনের জন্য রাখা বাণ দিয়ে কর্ণ ঘটোৎকচকে মারল? আহা অর্জুন যদি মরত, তাহলে পাণ্ডব-সৃঞ্জয়রা সকলেই মারা পড়ত। উত্তরে সঞ্জয় অনেক কথা বলে মন্তব্য করে বললেন—মহারাজ! দুর্যোধন, দুঃশাসন আর শকুনি প্রতিদিনই বড় আশা নিয়ে কর্ণকে বলে—সব সৈন্য বাদ দিয়ে কাল ওই অর্জুন বেটাকে মার তো, কর্ণ! তাহলে আমরা পাণ্ডব-আর সৃঞ্জয়দের চাকরের মত খাটাব—প্রেষ্যবৎ পাণ্ডু-পাঞ্চালান্ উপভোক্ষ্যামহে বয়ম্।[৭৯]

পাঠকেরা ভাবটা নিশ্চয়ই লক্ষ করছেন। জ্যোতিষীরা বলছে—মরবে কারা? না, কৌরবেরা আর পাঞ্চালেরা। কৌরবদের আবার কেকয়, মৎস্য, চেদি, করূষ—কাউকে চাকর হিসেবে পছন্দ নয়, চাকর হিসেবে তাঁদের পাণ্ডবদের সঙ্গে পাঞ্চালদের চাই। কর্ণপর্বে আবার দেখা যাচ্ছে—ভীষ্ম-দ্রোণ যত পাণ্ডব সৈন্য বধ করেছিলেন, তাতে সম্মানের খাতিরেও একবার পাণ্ডবদের নাম করা হচ্ছে না। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন—দশ দিন যুদ্ধের পর শান্তনুপুত্র ভীষ্ম অনেক সৃঞ্জয়-পাঞ্চালদের বধ করে শেষে শরশয্যা গ্রহণ করলেন—হত্বা সৃঞ্জয়-পাঞ্চালান্

ভীষ্মো'থ দশভির্দিনৈঃ।[৮০] আবার দ্রোণের ব্যাপারেও সঞ্জয় বলছেন—মহাবীর দ্রোণও হাজার হাজার পাঞ্চাল সৈন্য ধ্বংস করে শেষে মারা গেলেন—পাঞ্চালানাম্ অনীকিনীম্। নিহত্য যুধি দুর্ধর্ষঃ পশ্চাদ্ রুক্মরথো হতঃ ॥[৮১]

তাহলে দেখুন, কত রাজ্য থেকে কত রকমের সৈন্য এসে যোগ দিয়েছে পাণ্ডবদের দলে, কিন্তু শক্তি দেখানোর বেলাতেই হোক কিংবা মৃত্যুর গৌরবই হোক, নাম কিনেছে শুধু সৃঞ্জয়-পাঞ্চালেরা। স্বাভাবিক কারণেই আবার বলছি, কৌরবদের প্রতিপক্ষ হিসেবে পাঞ্চালদের কথাটা এক বিশেষ নিরিখে দেখতে হবে। উদ্যোগ পর্বে কৃষ্ণের দৌত্য যখন বিফল হল, তখন কৃষ্ণ কর্ণকে পাণ্ডবদের পক্ষে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। সকলেই জানেন—এতকাল দুর্যোধনের পক্ষে থেকে হঠাৎ করে যে কর্ণ পাণ্ডবপক্ষে চলে আসতে পারেন না, এটা কর্ণের স্বভাবগৌরব। একই সঙ্গে এটাও মানতে হবে যে, কৃষ্ণের সঙ্গে কথোপকথনের সময় কর্ণ কিন্তু ভারতযুদ্ধের বাস্তব সত্যটা উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি জানতেন—এ যুদ্ধে কুরুদের সর্বনাশ হবে। কিন্তু এই কথাটা ভারি সুন্দর করে বলতে গিয়ে সম্পূর্ণ ভারত-যুদ্ধকে এক বৈতানিক যজ্ঞের প্রতিরূপে উপস্থিত করেছেন কর্ণ। কর্ণ বলেছেন—মহারাজ দুর্যোধন এই যজ্ঞকর্মে দীক্ষা নিয়েছেন আর তাঁর মহতী সেনাই এখানে তাঁর পত্নী। কর্ণ এইভাবে যুদ্ধের নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্যকে যজ্ঞের উপমায় নিবদ্ধ করলেন এবং শেষে বললেন—দুর্যোধনের এই যজ্ঞে দক্ষিণা হলেন পাঞ্চাল যুবরাজ ধৃষ্টদ্যুম্ন—দক্ষিণা ত্বস্য যজ্ঞস্য ধৃষ্টদ্যুম্নঃ প্রতাপবান্।[৮২]

কথাটি অত্যন্ত মূল্যবান। বস্তুত অশ্বত্থামার হাতে ধৃষ্টদ্যুম্নের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের শেষ পরিণতি ঘটে। ভারতযুদ্ধের পনের দিনের মাথায় পাঞ্চাল দ্রুপদ দ্রোণের হাতে মারা পড়লেন। পাঁচ দিন যুদ্ধ করে দ্রোণ মারা পড়লেন ধৃষ্টদ্যুম্নের হাতে। আর স্বয়ং ধৃষ্টদ্যুম্ন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধশেষে ভীমের গদায় দুর্যোধনকে মৃত্যুমুখে পতিত দেখে নির্দ্বিধায় ঘুমোচ্ছিলেন ; অকস্মাৎ মহাকালের মত কোথা থেকে উদয় হলেন অশ্বত্থামা, স্তিমিতপ্রদীপ রজনীতে বেঘোরে প্রাণ দিয়ে দুর্যোধনের যজ্ঞদক্ষিণা হয়ে রইলেন ধৃষ্টদ্যুম্ন। অথচ এই মহাবীর ভারতযুদ্ধের প্রথম থেকে কিই না করেছেন পাণ্ডবদের জন্য। দ্রোণকে অন্যায়ভাবে মারার পর অর্জুন তাঁকে তিরস্কার করে যা নয় তাই বলেছিলেন। ক্ষুণ্ণ সেই মুহূর্তে ধৃষ্টদ্যুম্ন এতটাই রেগে গিয়েছিলেন যে, তিনি একার ক্ষমতাতেও যুদ্ধে নামতে রাজি ছিলেন। হয়তো এটা বাড়াবাড়ি কথা, হয়তো এটা একান্তই দম্ভোক্তি—কিন্তু তার কারণটাও পরিষ্কার। সেটা ধৃষ্টদ্যুম্ন নিজেই বলেছেন। বলেছেন—দ্রোণের সঙ্গে আমাদের শত্রুতা কুলক্রমাগত—কুলক্রমাগতং বৈরং মমাচার্যেণ বিশ্রুতম্।

আসলে এই শত্রুতাটা দ্রোণের সঙ্গে কোনমতেই কৌলিক নয়, মূল শত্রুতাটা পাঞ্চালদের সঙ্গে কৌরবদের। আপাতত সেটা দ্রোণের ঘাড়ে পড়েছে। ধৃষ্টদ্যুম্নের হাতে দ্রোণ বধের সূত্রে অর্জুন, সাত্যকি সবাই যখন শামিল হয়েছেন, তখন আসল কথাটা বেরিয়েছে সহদেবের মুখে। তিনি বলেছেন—অন্ধক-বৃষ্ণি আর পাঞ্চালরা বাদে আমাদের এত বড় বন্ধু আর কেউ নেই।[৮৩] আসলে এই প্রতিজ্ঞা, এই যৌথ প্রয়াসই ভারতযুদ্ধের উদ্যোগপর্বে সবাইকে একত্রিত করেছে

এবং সকলের অনুমতিক্রমে সুচিন্তিতভাবে সেনানায়ক নির্বাচিত হয়েছেন সেই পাঞ্চাল পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নই। সঞ্জয় যখন পাণ্ডবদের যুদ্ধের উন্মাদনা দেখে এসে কুরুসভায় ধৃতরাষ্ট্রের কাছে সমস্ত সংবাদ পেশ করছেন, তখন তিনি অনেকের কথা বললেন। সঞ্জয় কেকয় এবং আরও দু-একটি রাজার কথা বললেন বটে, কিন্তু সবার শেষে জানালেন দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন কিভাবে সবার মধ্যে যুদ্ধের উন্মাদনা ছড়িয়ে চলেছেন—ধৃষ্টদ্যুম্ন সদৈবৈতান্ সন্দীপয়তি ভারত।[৮৪] ধৃষ্টদ্যুম্ন নাকি সবাইকে বলছেন—যুদ্ধ করে যাও, ভরতবংশের ছেলেরা সব! যুদ্ধে নাম, কোন ভয় নেই। ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের সমর্থনে যত রাজাই আসুক, আমি একা তাদের আটকাব, একা দেখে নেব, ঠিক যেমন মহাসমুদ্রে তিমি মাছ অন্যান্য মাছেদের সর্বনাশ করে। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ যেই আসুক, আমি তাঁদের আটকাব—সমুদ্রের বেলাভূমি যেমন সমুদ্রকে আটকায়। ধৃষ্টদ্যুম্নের এই কথা শুনে নাকি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মত লোক পর্যন্ত বলেছেন—শালাবাবু! সবই তোমার পক্ষে সম্ভব, তোমার ক্ষমতা তোমার ধৈর্য আমার প্রাপ্তিযোগের মধ্যে পড়ে; জেনে রাখ পাণ্ডবেরা সবাই জোট বেঁধেছে পাঞ্চালদের সঙ্গে, সবাই এখন জ্বলছে, এখন এই যুদ্ধে তুমিই আমাদের ত্রাতা, উদ্ধারকর্তা হও—সংগ্রামান্নঃ সমুদ্ধর। যুধ্যমান কৌরবদের হঠানোর জন্য তুমি যা বিধান দেবে তাই আমরা করব—ভবতা যদ্‌বিধাতব্যং তন্নঃ শ্রেয়ঃ পরন্তপ, কারণ তাতেই আমাদের ভাল হবে। সম্ভ্রান্ত পাণ্ডববংশের গৌরবের প্রতীক স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের মুখে সবার হয়ে এই যে পাঞ্চালদের কাছে 'সারেন্ডার' এটা ভীষণই তাৎপর্যপূর্ণ।

কুরুক্ষেত্রের বিরাট যুদ্ধভূমিতে যখন কৌরব-পাণ্ডবের যুদ্ধ বাধল, তখন কিন্তু অর্জুনের মত বীর কিংবা মহাবল ভীমসেনকে সেনাপতি হতে দেখলাম না, দেখলাম দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকেই, যিনি পাণ্ডবপক্ষের প্রধান সেনাপতি।

যুধিষ্ঠির কিন্তু ভাইদের সবাইকেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কাকে সেনাপতি নিযুক্ত করা যায়, কেই বা যুদ্ধে কুরুকুলপতি ভীষ্মের মোকাবিলা করতে পারবে। তাতে ছোট ভাই সহদেব বিরাট রাজার নাম করেছিলেন। অজ্ঞাতবাস নির্বিঘ্নে কাটার কৃতজ্ঞতাতেই হোক, কিংবা উদ্যোগপর্বে তাঁর ওখান থেকেই পাণ্ডবদের সমস্ত রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ চলছিল বলেই হোক, সহদেব বিরাটের নাম করলেন। নকুল কিন্তু এ মত মানলেন না। তিনি পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের নাম প্রস্তাব করলেন। নকুল বললেন—দ্রুপদ ভরদ্বাজের কাছ থেকে অস্ত্রলাভ করেছেন, দ্রোণ এবং ভীষ্ম—দুজনেরই তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী বলে পরিচিত। অনেক পুত্র-পৌত্র, সাঙ্গোপাঙ্গে তিনি শত শাখা বৃক্ষের মতন। দ্রোণকে বিনাশের জন্য তিনি তপস্যাও করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা, নকুল বললেন, সমস্ত ব্যাপারে দ্রুপদ আমাদের পিতার মত—পিতেবাস্মান্ সমাধত্তে। অতএব সেই দিব্যাস্ত্রবিদ্ রাজা দ্রুপদ, যিনি আমারে শ্বশুর—তিনিই আমাদের সেনাপতি হোন—শ্বশুরো দ্রুপদোঽস্মাকং সেনাগ্রং সম্প্রকর্ষতু।[৮৫] নকুলের মত অর্জুন মানলেন না। তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নের অসংখ্য গুণের বর্ণনা দিয়ে, তাঁর অসাধারণ পরাক্রম এবং বলদর্পিতার খবর দিয়ে তাঁকেই সেনাপতি করার পক্ষপাত জানালেন। আসলে অর্জুন জানেন—ধৃষ্টদ্যুম্নকে সেনাপতি করলে দ্রুপদ, শিখণ্ডী কারোরই কিছু বলার থাকবে না। অন্যেরাও সন্তুষ্ট হবে একজন যুবক সেনাপতি লাভ করে। মধ্যম

পাণ্ডব সরল মানুষ। তিনি যেহেতু জানেন যে, শিখণ্ডীর বিরুদ্ধে ভীষ্ম অস্ত্রধারণ করবেন না এবং ভীষ্মই যেহেতু কৌরবদের সেনাপতি, অতএব তিনি বললেন—শিখণ্ডীকেই সেনাপতি করা হোক। যুধিষ্ঠির এবারে কৃষ্ণের মত জিজ্ঞাসা করলেন, কারণ সর্বশেষ তিনি যা বলবেন, তাই হবে। কৃষ্ণ কিন্তু নানা ভণিতা করে শেষ পর্যন্ত অর্জুনের মতে মত দিলেন। সেনাপতি হিসেবে সবারই যোগ্যতা নির্ধারণ করেও তিনি মন্তব্য করলেন—পাঞ্চাল যুবরাজ ধৃষ্টদ্যুম্নেরই আমার মতে সেনাপতি হওয়া উচিত—ধৃষ্টদ্যুম্নম্ অহং মন্যে সেনাপতিম্ অরিন্দম।[৮৬] মহাভারতের যুদ্ধযজ্ঞের দক্ষিণা অর্জুন-কৃষ্ণের মুখেই ঘোষিত হল।

মহাবলী অর্জুন যুদ্ধভূমিতে আত্মীয়স্বজন দেখে কৃপাবিষ্ট হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে একটা রিপোর্ট দিলেন। তাতে দেখা যাচ্ছে দুর্যোধন আচার্য দ্রোণকে গিয়ে বলছেন—আচার্য! দেখুন দ্রুপদের ছেলে ধৃষ্টদ্যুম্ন কেমন ব্যূহ রচনা করেছে। ঠিক এইখানে দ্রুপদ, বিরাট—এই সব সাধারণ নাম ছাড়াও আরও দু-একটি, বড় নাম করেছেন, যেগুলি জরুরী। দুর্যোধন, বলেছেন—ওদিকে আছেন—ধৃষ্টকেতু, চেকিতান এবং 'কাশীরাজশ্চ বীর্যবান্'। এই কাশীর রাজাই কিন্তু একমাত্র কারণ, যার জন্য কুরুকুলপতি ভীষ্ম পাণ্ডবপক্ষে যোগ দেননি। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে সেই কাশীরাজের মেয়ে অম্বা, অম্বিকা এবং অম্বালিকার কথা। এঁদের বিয়ে নিয়ে কাশীরাজের সভায় ভীষ্মকে প্রচণ্ড অপমানিত হতে হয়েছিল, প্রতি-অপমানিত হতে হয়েছিল কাশীরাজকেও। কাশীরাজ যেখানে পাণ্ডবপক্ষে আছেন, সেই পক্ষে ভীষ্মের যোগ দেওয়া সম্ভব ছিল না, যদিও তাঁর সমস্ত স্নেহ ছিল পাণ্ডবদের প্রতি। অনুরূপভাবে যে পক্ষে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ আছেন, সে পক্ষে দ্রোণ থাকতে পারেন না। ভীষ্ম-দ্রোণের সমস্ত পক্ষপাত পাণ্ডবদের প্রতি থাকা সত্ত্বেও যে তাঁরা সে পক্ষে যেতে পারেননি, তার কারণ কৌরবদের নুন খাওয়া-টাওয়া কিছু নয়, কারণটা পুরোপুরি রাজনৈতিক। এঁদের মধ্যে একমাত্র দলছুট লোক—যাঁর পাণ্ডবপক্ষে যোগ দেওয়া সবদিক দিয়ে উচিত ছিল, কিন্তু দিলেন না, ইনি হলেন শল্য—নকুল-সহদেবের আপন মামা শল্য। শল্য পাণ্ডবপক্ষেই যোগ দিতে আসছিলেন, কিন্তু পথের মধ্যে দুর্যোধন তাঁকে মদ্য-মাংস দিয়ে এমন আপ্যায়ন করলেন যে, তিনি দুর্যোধনকেই কথা দিয়ে বসলেন। শল্য দুর্যোধনের পক্ষেই যুদ্ধ করলেন বটে কিন্তু যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে তিনি কৌরবপক্ষে থেকেই তাঁদের ক্ষতি সাধন করেছেন। যুধিষ্ঠির বলেছিলেন—অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধের সময় মহাবীর কর্ণ অবশ্য আপনাকে সারথি হিসেবে গ্রহণ করবেন, কারণ সবাই জানে সারথি হিসেবে মদ্ররাজ শল্য কৃষ্ণের মতই দক্ষ। কিন্তু কর্ণ যখন যুদ্ধ করতে আসবেন, তখন আপনি এমন সব কথা বলবেন যাতে কর্ণের মনোবলই ভেঙে যায়। শল্য তাই করেছিলেন এবং ভগ্ন-সংকল্প কর্ণকে মারতে অর্জুনের সুবিধে হয়েছিল। শল্যের এই ধরনের সারথ্য প্রমাণ করে যে, তিনি আসলে পাণ্ডব পক্ষেই যোগ দিয়েছিলেন। 'শল্যসারথ্য' কথাটি সংস্কৃত পণ্ডিতমহলে খুবই বিখ্যাত। যখন কোন সংস্কৃত টীকাকার মূলের ওপরে টীকা রচনা করেন, তখন সকলেই মনে করে যে, মূল গ্রন্থের ওপরে টীকাকারের অগাধ শ্রদ্ধা আছে বলেই তিনি টীকা রচনা করছেন। এই সর্বসম্মত ধারণার পরেও দেখি, অনেক টীকাকার মূলের

ওপরে ধ্বংসাত্মক টীকা রচনা করেন, মূল গ্রন্থের বক্তব্য কেটে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে দেন। পণ্ডিতেরা এই ধরনের টীকাকে বলেন 'শল্যসারথ্য' অর্থাৎ বিশ্বস্তের ভাব দেখিয়ে অবিশ্বাসের কাজ করা।

যাই হোক, শল্যসারথ্যের কথা থাক, আপনারা আরও একটা জিনিস লক্ষ করবেন ভারতযুদ্ধের সময়। লক্ষ করবেন, কৌরব পক্ষের প্রথম এবং প্রধান বীর ভীষ্ম যে মারা গেলেন তা কিন্তু অর্জুনের হাতেও নয়, ভীমের হাতেও নয়, ভীষ্ম মারা গেলেন শিখণ্ডীর জন্য। তিনি কিন্তু পাঞ্চালের ছেলে, মহারাজ দ্রুপদের ছেলে বলেই তিনি পরিচিত। দ্বিতীয় সেনাপতি দ্রোণ মারা গেলেন পাঞ্চাল ধৃষ্টদ্যুম্নের হাতে, অর্থাৎ আবার দ্রুপদের কথা আসে। একমাত্র কর্ণ এবং শল্য ছাড়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রধান দুই নায়কই পাঞ্চালদের হাতে মারা গেলেন। রাজনৈতিক দিক থেকে এই তথ্যটা গুরুত্বপূর্ণ। কর্ণ এবং শল্যের একজন অর্জুনের হাতে, অন্যজন যুধিষ্ঠিরের হাতে মারা পড়লেও, শল্যের মারা যাওয়াটা ছিল পশ্চাত্তপ্ত মানুষের আত্মহত্যা। একমাত্র কর্ণ—দুর্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি এই দুষ্টচক্রের বাহুশক্তির প্রতীক—একমাত্র কর্ণই ছিলেন পাণ্ডবদের বলি। হ্যাঁ, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা—এই সমস্ত ছোট ছোট রাজার কথা ছেড়ে দিলে, কৌরবপক্ষে আর কেউই ছিলেন না, যিনি পাঞ্চাল-যাদব এবং পাণ্ডবদের সম্মিলিত বাহিনীর সামনে দাঁড়াতে পারেন।

আমরা একসময়ে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে জরাসন্ধের বাহিনীভুক্ত রাজাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়েছিলাম। জরাসন্ধের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-মধ্য ভারতীয় মিত্রশক্তির পতন ঘটেছিল ঠিকই ; কিন্তু তারাই আবার অন্য নামে ফিরে এল ভারতযুদ্ধের সময়। হ্যাঁ, জোটের মধ্যে পরিবর্তন অবশ্যই কিছু ঘটেছিল, যেমন চেদি, করূষ এবং মগধের শক্তি আগে পূর্বমধ্য ভারতীয় জোটের একাংশ ছিল, এখন তারা পাণ্ডব-পাঞ্চালদের পক্ষে যোগ দিয়েছে। কিন্তু অন্যদিকে দক্ষিণের সমস্ত শক্তিগুলি মাহিষ্মতী, অবন্তী-ইত্যাদি দেশের রাজারা এবং পূর্বদেশের অঙ্গরাজ কর্ণ থেকে আরম্ভ করে বঙ্গদেশের রাজা সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, পুণ্ড্রবর্ধন, প্রাগজ্যোতিষপুর এই সমস্ত দেশের রাজারা কিন্তু কৌরব পক্ষে যোগ দিয়েছেন। Pargiter লিখেছেন—They (Pandavas) were aided by the Matsyas, Cedis, Karusas, Kasis, South Panchalas, Western Matsyas, Cedis, Magadhas and the western Yadavas from Gujarat and Surastra, and on Duryodhana's side were all the Punjab nations and all other kingdoms of Northern India and the north of the Dekhan.

কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ সম্বন্ধে যে যাই বলুন, আমাদের মনে হয় কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ মোটেই কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ নয়। মূলত এই যুদ্ধ উত্তরের বিরুদ্ধে উত্তরের যুদ্ধ। কৌরবদের বিরুদ্ধে পাঞ্চালদের যুদ্ধ—হস্তিনাপুরের দখল নিয়ে একই বংশের লতায়-পাতায় যুদ্ধ। এই যুদ্ধে কোন বিশেষ পক্ষে অংশগ্রহণ কিংবা পক্ষপাত নিয়ে কারও ব্যক্তিগত ক্রোধ অথবা ব্যক্তিগত মমতা কাজ করেছে, কারও কৌলিক সম্বন্ধ, কারও কাজ করেছে পুরাতন ক্রোধ আবার কারও বা কাজ করেছে ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা।

এত সব ব্যক্তিগত টানা-পোড়েনের মধ্যেও সবার ওপরে কিন্তু আছে রাজনীতি এবং সে রাজনীতি মূলত পাঞ্চাল এবং কৌরবদের রাজনীতি। দ্রৌপদীর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর মহাভারতের বক্তা বৈশম্পায়ন মন্তব্য করেছিলেন—দ্রুপদ পাঞ্চালের সঙ্গে যেদিন পাণ্ডবদের যোগ হল, সেদিন থেকে কোন দেবতার ভয়ও পাণ্ডবদের ছিল না—পাণ্ডবৈঃ সহ সংযোগং গতস্য দ্রুপদস্য হ। ন বভূব ভয়ং কিঞ্চিৎ দেবেভ্যো' পি কথঞ্চন। স্বয়ং দুর্যোধন ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞ দেখে এসে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে দুঃখ করে বলেছিলেন– সবাই আজকে সম্রাট যুধিষ্ঠিরের তোষামুদি করছে এবং ভারতবর্ষের সমস্ত রাজারা রাজকর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন যুধিষ্ঠিরের দরজায়। শুধু দুটি রাজ্য এই কর দেওয়ার কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়েছে—এক পাঞ্চালেরা, তাঁরা পাণ্ডবদের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ থাকায় করমুক্ত, আর দ্বিতীয় হল যাদব রাজ্য যাঁরা পাণ্ডবদের সঙ্গে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ—বৈবাহিকেন পাঞ্চালাঃ সখ্যেনান্ধকবৃষ্ণয়ঃ। আমরা বলব—এই পাঞ্চাল-যাদবদের জন্যই পাণ্ডবেরা ধৃতরাষ্ট্রের কাছ থেকে ইন্দ্রপ্রস্থ লাভ করে প্রথম রাজত্বের স্বাদ পেয়েছিলেন এবং এই পাঞ্চাল-যাদবদের জন্যই শেষ পর্যন্ত পাণ্ডবেরা হস্তিনাপুরের দখল পেয়েছেন। এঁরা পাশে না থাকলে একবার তাঁদের বারণাবতে দগ্ধ হতে যেতে হয় অথবা জুয়ো খেলে বনে যেতে হয়। ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্য পাওয়ার পর যাদব-পাঞ্চালেরা পাণ্ডবদের ওপর বেশি আস্থা রেখে ফেলেছিলেন। তার ফল জুয়ো খেলে বনবাস। কিন্তু যেই পাণ্ডবেরা বনে গেছেন তখন হৈ-হৈ করে বনেই ছুটে এসেছেন—বৃষ্ণি-অন্ধক বীরেরা, পাঞ্চাল-কেকয়ের যোদ্ধারা। দ্রৌপদী সবার সামনে ঠোঁট ফুলিয়ে বলেছেন—পাণ্ডব-পাঞ্চাল-বৃষ্ণিরা বেঁচে থাকতেও—জীবৎসু পাণ্ডুপুত্রেষু, পাঞ্চালেষু চ বৃষ্ণিষু—আমাকে এমন হেনস্থা হতে হল। কৃষ্ণ সবার হয়ে জবাব দিলেন, কি আর করা যাবে—আমি ছিলাম না দ্বারকায়, আমি থাকলে এ জিনিস হত না—অসান্নিধ্যং তু কৌরব্য····যেনেদং ব্যসনং প্রাপ্তা। না, আর ভুল হয়নি—পাণ্ডবদের বনবাসের সময় পার হওয়ার মুহূর্ত থেকেই যুধিষ্ঠিরকে আর একা 'ডিসিসন' নিতে হয়নি। কুরুসভা থেকে সামান্য দূত এলেও এখন যুধিষ্ঠির বলেন—এখানে পাণ্ডবেরা আছেন, পাঞ্চালেরাও আছেন। আছেন বৃষ্ণিবীর সাত্যকি, যদুসিংহ কৃষ্ণ, আছেন বিরাট। ধৃতরাষ্ট্রের যা বলার আছে, এঁদের সামনেই বল—সমাগতাঃ পাণ্ডবাঃ সৃঞ্জয়াশ্চ জনার্দনো যুযুধানো বিরাটঃ।[৮৭] এই জোটই শেষ পর্যন্ত পাণ্ডবদের হস্তিনাপুরে প্রতিষ্ঠিত করল। মহাভারতকার দুর্যোধনের পাশে এগারো অক্ষৌহিণী সেনা দিয়ে, প্রতি তুলনায় তাঁকে বেশি শক্তিমান দেখিয়ে ধর্মযুদ্ধে পাণ্ডবদের যতই জেতান না কেন, আমরা জানি, এই যুদ্ধের প্রধান আকর্ষণ হল যাদব-পাঞ্চালের জোট, যার মূলে আছে পুরুষোত্তম কৃষ্ণের বুদ্ধি আর ক্ষুব্ধ দ্রুপদের শক্তি। আর অন্যদিকে আছে পুরাতন রাজবংশের অহংকার, অধিকার আঁকড়ে থাকার অপচেষ্টা, যার মূর্তিমান উদাহরণ কুরুকুলপতি ধৃতরাষ্ট্র, অভিমানী দুর্যোধন। এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে লাভ হয়েছে পাণ্ডবদের, যাঁরা রাজনৈতিক শক্তি বলে পরিচিত ছিলেন না, কিন্তু ইতরেতরের দ্বন্দ্বে মহান রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হলেন। কিন্তু ইতিহাস বড়ো দুর্বার। দৈবাৎ যদি বা কোনক্রমে উত্তর ভারত ভারতবর্ষের

শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হল, কিন্তু হাজার বছর পরেই রাজনৈতিক শক্তির মূল কেন্দ্র কিন্তু আবারও পরিবর্তিত হল পূর্ব ভারতের মগধে। জরাসন্ধের মগধে নয়, মহাপদ্ম নন্দের মগধে, বিম্বিসারের মগধে। কাজেই ভারতবর্ষের ইতিহাসে পূর্ব আর উত্তরের মধ্যেই আগে ক্ষমতার আবর্তন ঘটত—সে ইতিহাসে জলাঞ্জলি দিয়ে এখনকার ইতিহাস শুধু উত্তরের দিকেই চেয়ে থাকে, পাণ্ডবদের দিল্লি বা ইন্দ্রপ্রস্থের দিকেই করুণ চোখে চেয়ে থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী

১. ভগবদ্‌গীতা, নলিনীকান্ত ব্রহ্ম-সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৯৫, ১. ৪১।
২. ঐ ১. ৪২।
৩. মহাভারত, পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত, কলকাতা, ১৮৩০ (এর পর মহাভারতের কোন উদ্ধৃতি বা উল্লেখ মাত্রেই বুঝতে হবে তা এই বঙ্গবাসী সংস্করণ থেকে করা হচ্ছে),
আদিপর্ব ৭৮. ৮-১২।
৪. মহাভারত, আদিপর্ব ৭৮. ২০
৫. মহা, আদি ৭৮. ৩২
৬. মহা, আদি ৭৮. ৩৪
৭. মহা, আদি ৭৮. ৩৭
৮. মহা, আদি ৮০. ৫
৯. মহা, আদি ৮০. ৯
১০. মহা, আদি ৮০. ১২
১১. মহা, আদি ৮১. ৭
১২. মহা, আদি ৮১. ১০
১৩. মহা, আদি ৮১. ১৯
১৪. মহা, আদি ৮১. ৩৫
১৫. মহা, আদি ৮২. ১৬
১৬. স্ত্রীষ্বনৃতং ন হিনস্তি প্রত্যুত সত্যাদরেণ তত্ত্যাগ এব হিনস্তীতি। দ্রঃ নীলকণ্ঠের টীকা, মহা, আদি ৮২. ১৭
১৭. মহা, আদি ৮২. ১৯
১৮. মহা, আদি ৮৫. ২৯
১৯. গরুড় পুরাণে পাঠ আছে, "নদীনামগ্নিহোত্রাণাং ভারতস্য কুলস্য চ। মূলান্বেষো ন কর্ত্তব্যো মূলাদ্দোষেণ হীয়তে ॥" (বঙ্গবাসী সংস্করণ, পূর্ব খণ্ড ১১৫. ৫৭)
এই শ্লোকের অর্থ তর্করত্নমশাই করেছেন এইভাবে : নদী, অগ্নিহোত্র যজ্ঞ, ভারত ও কুল—ইহাদের মূল অনুসন্ধান করিবে না, যেহেতু মূল অন্বেষণ করিলে দোষ হইতে পারে।
আমাদের বক্তব্য : 'ভারতস্য কুলস্য চ' এই শব্দগুলির অর্থ যদি 'ভারত ও

কুলের’ হয়, তাহলে ভারতের মূল অনুসন্ধান বলতে কি বোঝায় ? আমাদের মতে এই শ্লোক লোকমুখে পরম্পরাক্রমে নেমে এসেছে এবং গরুড় পুরাণেও শ্লোকটি ধরা আছে নীতিশাস্ত্রবিষয়ক শ্লোকগুলির মধ্যে। অতএব শ্লোকের আমরা যে অর্থ করেছি সেই অর্থই যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

২০. মহাভারত, আদি ৮৫. ৩৪-৩৫

২১. কৌটিল্যীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্, রাধাগোবিন্দ বসাক সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৬৪, ১ম খণ্ড, ১ম অধিকরণ, ইন্দ্রিয় জয় প্রকরণ, পৃ. ৪

২২. মহা, শান্তিপর্ব ৮১. ২৫

২৩. আর. সি. মজুমদার, কর্পোরেট্ লাইফ ইন্ অ্যানসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া, ফার্মা কে. এল. এম : কলিকাতা, ১৯৬৯, পৃ. ১১৯

২৪. জয়চন্দ্র বিদ্যালংকার, ভারতীয় ইতিহাসকি রূপরেখা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৮-২৯

২৫. এফ. ই. পারজিটার, অ্যানসিয়েন্ট ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল ট্র্যাডিশন, মতিলাল বনার্সিদাস, দিল্লী, ১৯৬২, পৃ. ২৬২, ২৭২

২৬. হরিবংশ, আর্যশাস্ত্র সংস্করণ, ১. ৩১. ৮২, ৮৩

২৭. মহা, আদি ৬৮. ৩

২৮. মহা, বনপর্ব ৪৬. ৪০

২৯. মহা, বন ৪৬. ৪৩

৩০. মহা, আদি ৭৩. ৭৪, ৭৬

৩১. মহা, আদি ৭৩. ১৩১

৩২. মহা, আদি ৯৫. ৩৪

৩৩. বিষ্ণুপুরাণ, আর্যশাস্ত্র, কলিকাতা, ৪. ১৯. ৭. বায়ুপুরাণ, বঙ্গবাসী সংস্করণ ; ১৩১৭, ৯৯. ১৫০

৩৪. মৎস্য পুরাণ, নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ, ৪৯. ৩৩ ; বায়ুপুরাণ ভরদ্বাজকে বলেছে ‘দ্বিপিতরঃ’ অর্থাৎ দ্বিপিতৃক ; তাঁর দুজনকে বাবা বলার কথা (৯৯. ১৫৭)।

৩৫. মৎস্যপুরাণ ৪৪. ৩৫, হরিবংশ (আর্যশাস্ত্র সংস্করণ) বলেছে—যস্তে জনিষ্যতে পুত্র স্তস্য ভার্য্যোপদানবী—১. ৩৬. ১৯।

৩৬. জার্নাল অব দি অ্যামেরিকান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি, খণ্ড ১৯, পৃ. ১০০।

৩৭. এফ. ই. পারজিটার, অ্যানসিয়েন্ট ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল ট্র্যাডিশন, মতিলাল বনার্সিদাস, দিল্লী, ১৯৬২, পৃ. ১৫৮।

৩৮. হরিবংশ, ১. ৩১. ২৮

৩৯. বায়ু পুরাণ, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১৩১৭, ২০৮ ; একই মনুসংহিতার ৭. ৪১. শ্লোকে ‘সুদাঃ পৈজবনশ্চৈব’—এইখানে বিভিন্ন পাঠ দেখা যায়। কেউ ‘সুদাসো যবনশ্চৈব’, কেউ ‘সুদাপি যবনশ্চৈব’ আবার কেউ বা ‘সুদাঃ পৈজবনশ্চৈব’ পাঠ নিয়েছেন। ঋগ্‌বেদে যেখানে ‘রাজাপি চ্যবনঃ’ আছে, বিষ্ণুপুরাণ সেটিকে একেবারে চ্যবন বানিয়ে দিয়েছে।

৪০. জার্নাল অব দ্য রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯১০ পৃ. ৪৯-৫০
১৯১৬, পৃ.

৪১. মহাভারত, বনপর্ব, ১২৭ অধ্যায় সম্পূর্ণ দ্রষ্টব্য।
৪২. ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, সম্পাদক এ. কে. শাস্ত্রী, ত্রিবাঙ্কুর, ১৯৪২, ৮. ১৪.
৪৩. মহাভারত, সভাপর্ব ১৯. ১১-১৪।
৪৪. মহা, সভা ১৯. ২২।
৪৫. মহা, আদি ৬৩. ৩৫
৪৬. হরিবংশ, আর্যশাস্ত্র সংস্করণ, ২. ৩৪. ৭
৪৭. হরিবংশ, ১. ৩৫. ৪
৪৮. হরিবংশ, ২. ২৩. ৬৩
৪৯. হরিবংশ, ২. ৩৪. ২০
৫০. মহাভারত, শান্তিপর্ব ৫. ৬
৫১. কল্‌হন, রাজতরঙ্গিণী, সম্পাদক এম. এ. স্টাইন, মুনশীরাম মনোহরলাল, দিল্লী, ১৯৬০, ১ম খণ্ড ১. ৫৯।
৫২. মহাভারত, সভা ১৪. ৪৯।
৫৩. মহা, আদি ১২৬. ১২।
৫৪. মহা, আদি ১৩০. ৬০।
৫৫. মহা, আদি ১৬৬. ১৬।
৫৬. মহা, আদি ১৩৮. ৬১।
৫৭. মহা, আদি ১৮৪. ৮।
৫৮. মহা, আদি ১৯৫. ১২।
৫৯. মহা, আদি ২০০. ৭০।
৬০. মহা, আদি ২০০. ১৪।
৬১. মহা, আদি ২০১. ১৬।
৬২. নাত্যাজ্যমস্তি কৃষ্ণস্য পাণ্ডবার্থে কথঞ্চন।
মহা, আদি ২০২. ১৬।
৬৩. দ্রঃ নীলকণ্ঠের টীকা : মহা, আদি ২০৭. ২৭
৬৪. মহা, আদি ১৯৫. ২৯
৬৫. মহা, উদ্যোগ পর্ব ৪. ৫
৬৬. মহা, উদ্যোগ ১৯. ১২
৬৭. মহা, উদ্যোগ ২২. ১৮
৬৮. মহা, উদ্যোগ ১৯. ২৫
৬৯. মহা, উদ্যোগ ২২. ২০
৭০. দ্রঃ নীলকণ্ঠের টীকা : মহা, উদ্যোগ ২২. ২০
৭১. মহা, উদ্যোগ ৫৪. ১৭-১৮
৭২. কল্‌হন, রাজতরঙ্গিণী, ১. ৭০-৭৪
৭৩. মহা, সভা ৪৫. ৩৬
৭৪. মহা, আদি ৯৫. ৭৯
৭৫. মহা, সভা ২৪. ৪৩
৭৬. মহা, আশ্রমবাসিক পর্ব ২৫. ১৩
৭৭. মহা, উদ্যোগ ১৯. ৭, ৮

৭৮. মহা, উদ্যোগ ৪৮. ৯৯
৭৯. মহা, দ্রোণপর্ব ১৮০. ২১
৮০. মহা, কর্ণপর্ব ৫. ৪
৮১. মহা, কর্ণপর্ব ৫. ৫
৮২. মহা, উদ্যোগ পর্ব ১৪১. ৪৪
৮৩. মহা, দ্রোণপর্ব ১৯৭. ৫৪-৫৫
৮৪. মহা, উদ্যোগ ৫৭. ৪৭
৮৫. মহা, উদ্যোগ ১৫১. ১৬
৮৬. মহা, উদ্যোগ ১৫১. ৪৯
৮৭. মহা, উদ্যোগ ২৫. ১